বাঙলা সাহিত্যের পটভূমিরূপে কয়েকটি ধর্মসাধনা

*

বাঙলা-সাহিত্যে গুহ্যসাধনার ধারা

শ্রী শশিভূষণ দাশগুপ্ত
এম. এ, পি-এইচ. ডি

মর্মানুবাদক
গোপীমোহন সিংহরায়

ভারবি
১৩।১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট। কলকাতা-৭০০০৭৩

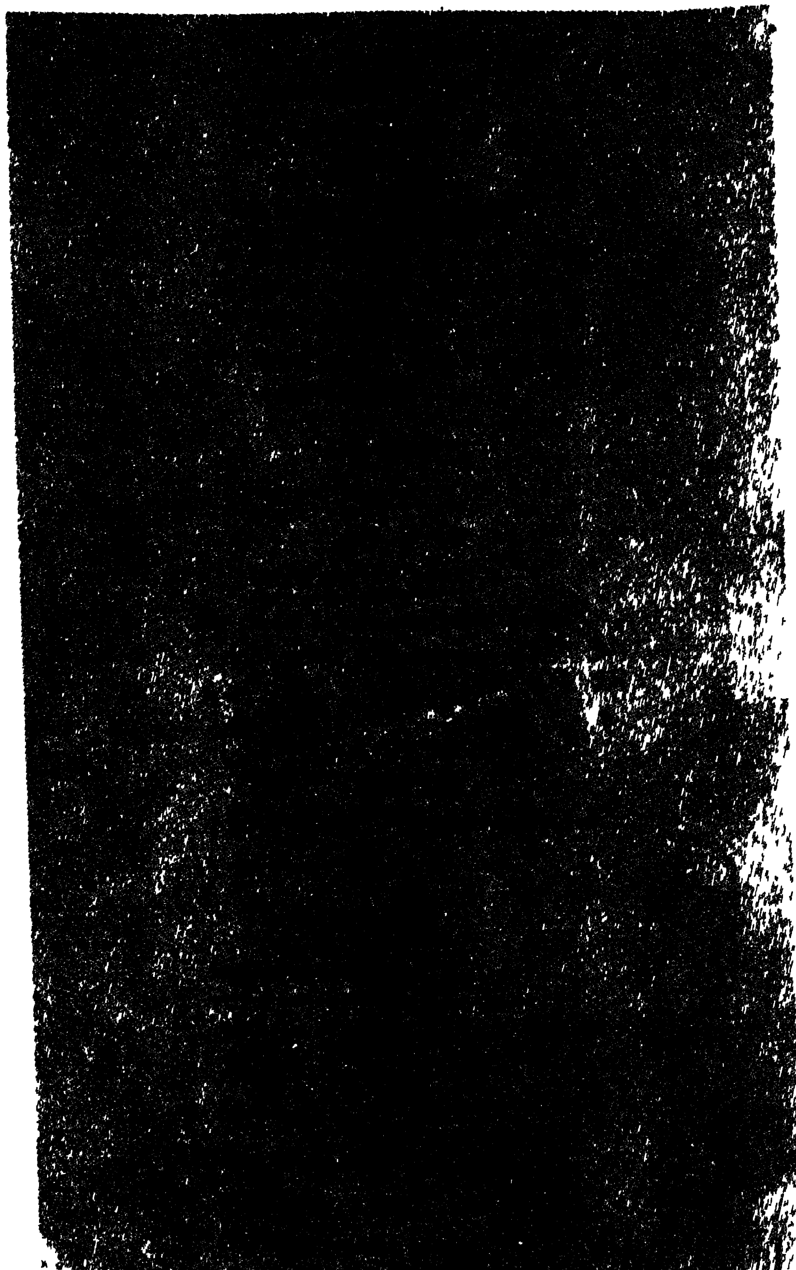
প্রথম প্রকাশ : মহালয়া ১৪০৩। অক্টোবর ১৯৯৬

প্রকাশক : গোপীমোহন সিংহরায়। ভারবি। কম্পিউটার-যন্ত্রে অক্ষর-গ্রন্থনা।
ভারবি। ১৩।১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট। কলকাতা-৭০০০৭৩। মুদ্রক :
দি ক্রিয়েশন। ২৪বি। ১বি ড° সুরেশ সরকার রোড। কলকাতা-৭০০০১৪

পরমারাধ্যা

শ্রীমতী শুভা দাশগুপ্ত

করকমলে



এই গ্রন্থের জন্য ড° শশিভূষণ দাশগুপ্ত-কর্তৃক প্রস্তুত
সূচিপত্রের এক পৃষ্ঠার চিত্র

ভূমিকা

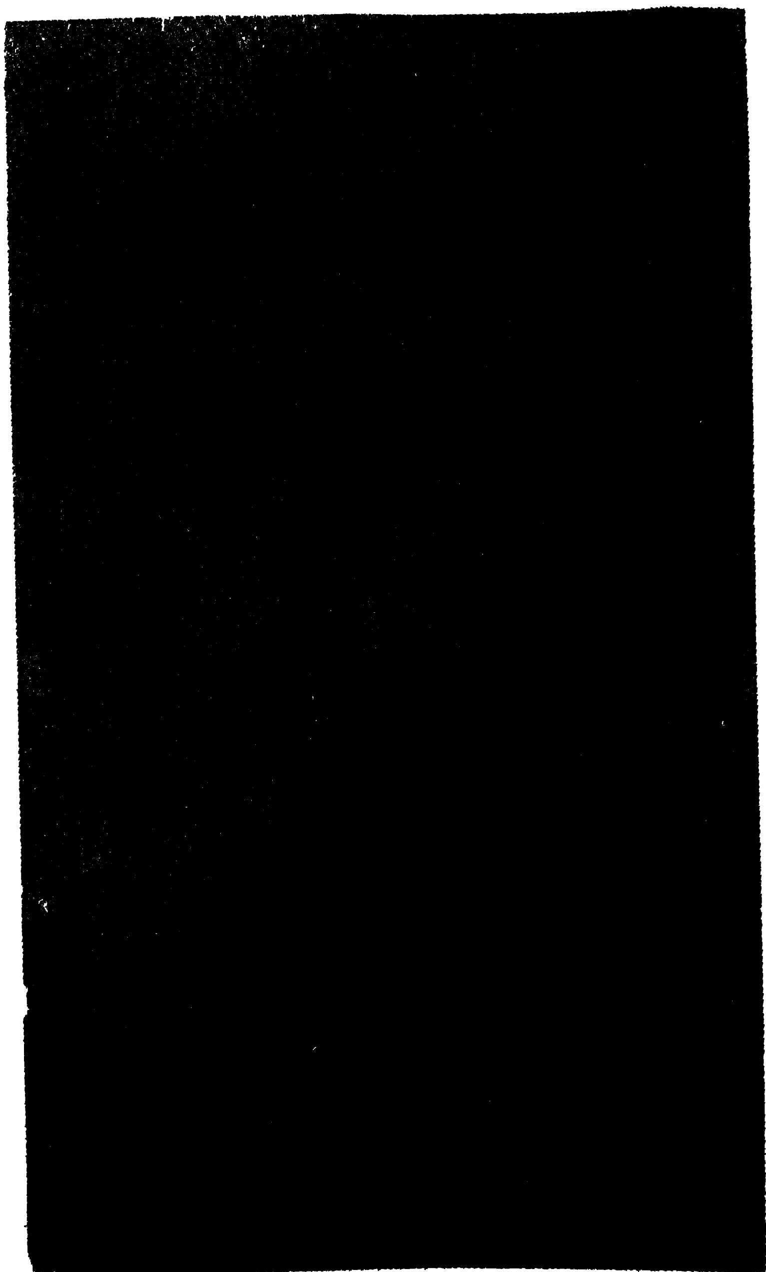
বর্তমান গ্রন্থখানি আমার ইংরেজী গ্রন্থ **Obscure Religious Cults As Background of Bengali Literature** বইখানিকে মুখ্যতঃ অবলম্বন করিয়া লিখিত। ইংরেজী বই বাহির হইবার পরেই এ-বিষয়ে সংক্ষেপে একখানি বাঙলা বই লিখিতে নানাভাবে অনুরুদ্ধ হইয়াছি; কিন্তু নিজে আর সে কাজে হাত দিতে পারি নাই। কয়েক বৎসর পূর্বে পরমপ্রীতিভাজন ছাত্র শ্রী গোপীমোহন সিংহরায় এম. এ. স্বতঃপ্রণোদিত হইয়াই গ্রন্থখানির একটি সংক্ষেপিত বাঙলা অনুবাদ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমিও সানন্দে সম্মতি জানাইয়াছিলাম। দেখিলাম, শ্রীযুক্ত সিংহরায় তাঁহার ইচ্ছাকে একেবারে কুঁড়িতেই বিনষ্ট হইতে দেন নাই, কিছুদিন পূর্বে তিনি গ্রন্থখানির একটি সংক্ষেপিত বাঙলা রূপের পাণ্ডুলিপি আনিয়া আমার হাতে অর্পণ করিলেন। মুখ্যতঃ সেই পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে এই গ্রন্থ। আমি সেই পাণ্ডুলিপিটি দেখিয়া স্থানে স্থানে পরিবর্তন এবং পরিবর্ধন করিয়া দিয়াছি। প্রীতিভাজন গোপীমোহনের আন্তরিকতা আমার হৃদয় স্পর্শ করিয়াছে, তাঁহার সম্বন্ধে ইহার অধিক আর কিছু বলিতে চাহি না।

অনুবাদকালে গ্রন্থখানিকে সংক্ষেপিত করিবার কথা আমিই বলিয়াছিলাম, কিন্তু সংক্ষেপিত হইবার পরে মনে হইয়াছে কতগুলি প্রসঙ্গ এত সংক্ষেপিত না হওয়াই ভাল ছিল। তথাপি সংক্ষেপিত রূপের মধ্যেই বক্তব্য বিষয়কে যথাসম্ভব পরিষ্কার করিয়া তুলিবার চেষ্টায় ত্রুটি হয় নাই। মূল গ্রন্থে কয়েকটি পরিশিষ্টাংশ দেওয়া হইয়াছিল, তাহা হইতে দুইটি অংশ মাত্র এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে; এই পরিশিষ্টাংশগুলির সংক্ষেপিত অনুবাদ আমি নিজেই করিয়াছি। ইহা ব্যতীত 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'য় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ ('চর্যাপদের প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ') এবং 'ক্রান্তি' পত্রিকায় প্রকাশিত আমার একটি প্রবন্ধ ('বাঙলার হিন্দু-মুসলিম ধর্ম ও সংস্কৃতির সমন্বয়') পরিশিষ্টাংশের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

পাঠক-সাধারণ যদি গ্রন্থখানি হইতে কোনও নূতন তথ্য এবং আনন্দ লাভ করেন, তবেই আমার আনন্দ পূর্ণতা লাভ করিবে। 'বুকল্যাণ্ড লিমিটেড'-এর পক্ষ হইতে শ্রী জানকীনাথ বসু, এম. এ মহাশয় সাগ্রহে গ্রন্থখানি প্রকাশের ভার গ্রহণ করিয়া এবং অতি সত্বর এবং সুষ্ঠুভাবে ইহা প্রকাশ করিয়া আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন। ইতি

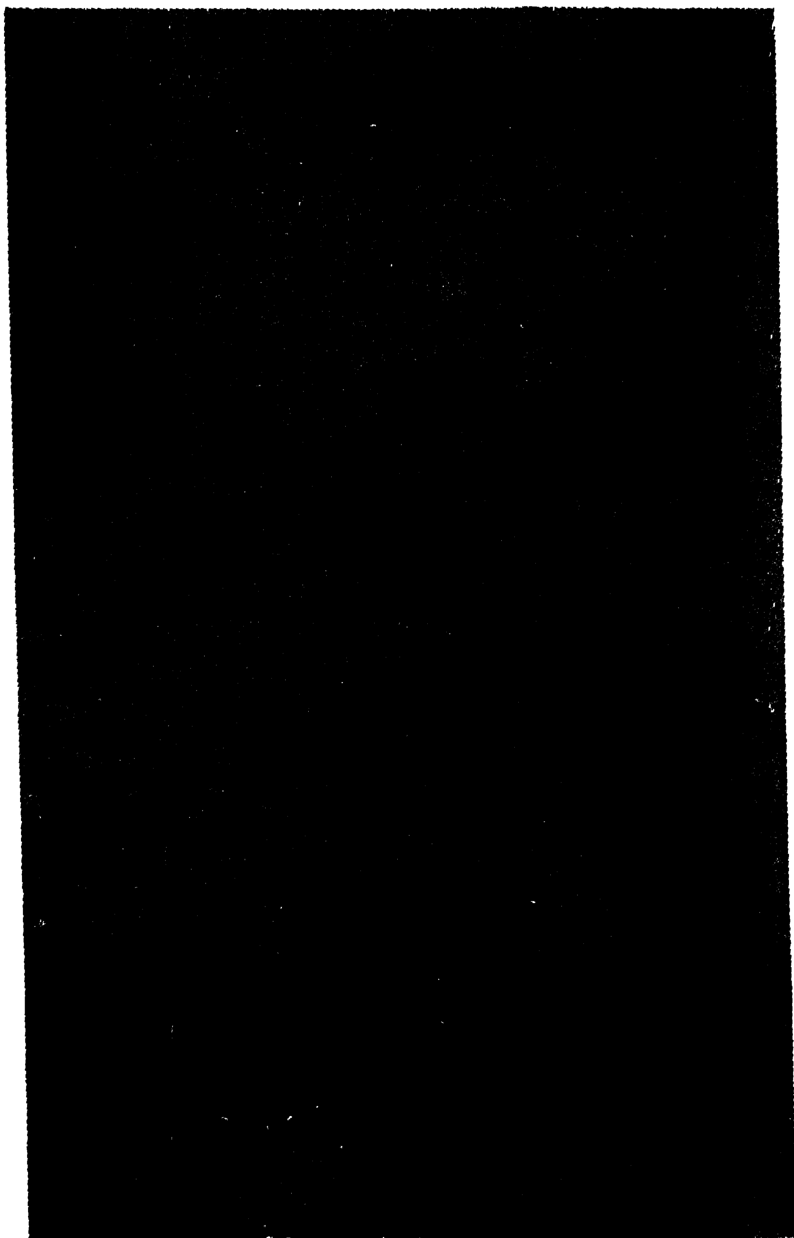
৯৮।৪ রসা রোড
কলিকাতা—২৬

বিনীত
শ্রী শশিভূষণ দাশগুপ্ত



এই গ্রন্থের জন্য ড' শশিভূষণ দাশগুপ্ত-কর্তৃক
সংশোধিত পাণ্ডুলিপির এক পৃষ্ঠার চিত্র

এই গ্রন্থের জন্য ড॰ শশিভূষণ দাশগুপ্ত-কর্তৃক প্রস্তুত
পাণ্ডুলিপির আখ্যাপত্রের চিত্র



এই গ্রন্থের জন্য ড০ শশিভূষণ দাশগুপ্ত-কর্তৃক প্রস্তুত
পাণ্ডুলিপির ভূমিকার চিত্র

নিবেদন

অর্ধশতাব্দীকাল আগে ১৯৪৮-৪৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর বাংলাবিভাগের ছাত্র হিসাবে আমি পূজনীয় অধ্যাপক ড° শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয়ের আন্তরিক স্নেহ পেয়েছিলুম। এই শতকে একাধারে এমন সর্বতোভদ্র শুচিস্নিগ্ধ জ্ঞানতপস্বী-কর্মযোগী এবং ছাত্রবৎসল পরিপূর্ণ মানুষ নিতান্তই দুর্লভ। তাঁর জ্ঞানগর্ভ আত্মসমাহিত আলোচনায় দীর্ঘদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজ অভিষিক্ত ও রোমাঞ্চিত হয়েছে।

কোন গুণপনা না থাকা সত্ত্বেও তাঁর স্বাভাবিক স্নেহের সুযোগে কত যে উপদ্রব করেছি— বিশ্ববিদ্যালয়ে, তাঁর তখনকার রসা রোডের বাসায় গিয়ে — সবই তিনি হাসিমুখে প্রশ্রয় দিয়েছেন। ১৯৪৯ সালে আমার পরীক্ষার পরেও অনুগ্রহ করে তিনি আমাদের মেমারির নিকটবর্তী বাড়িতে পদধূলি দিয়েছেন। তখন তাঁর Obscure Religious Cults As Background of Bengali Leterature-বইটির অপরিহার্যতা এবং তার একটি বাংলা মর্মানুবাদের আবশ্যকতার আলোচনা-প্রসঙ্গে আমি সেই কাজটি করতে চাইলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাতে সম্মতি দেন। অনতিকাল পরেই আমি পরিশিষ্ট-ব্যতীত মূল বইটির সম্পূর্ণ মর্মানুবাদ সম্পন্ন করি।

বলা বাহুল্য, খুশি হয়ে তখনই বইটি প্রকাশের জন্য তিনি পাণ্ডুলিপির আদ্যন্ত সংশোধন ও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সংযোজন আদি সম্পন্ন করে, ভূমিকা-সূচিপত্র ইত্যাদি অংশও সন্নিবেশিত করেন। কিন্তু প্রকাশের কি বাধা ঘটল জানি না — আমি আর এ বিষয়ে তাঁকে উত্যক্ত করি নি। অকস্মাৎ তাঁর মর্মান্তিক অকাল-প্রয়াণে তাঁর শোকাভিভূত পরিবারে এ-বিষয়ে অধিক অনুসন্ধানে বিরত হই। হয়তো তাঁর জীবদ্দশায় 'ভারবি'র প্রতিষ্ঠা সম্ভব হলে বইটির প্রকাশে এত বিলম্ব ঘটত না।

কিছুকাল পূর্বে তাঁর সুযোগ্যা সহধর্মিণী শ্রীমতী শুভা দাশগুপ্ত সেই লুপ্তপ্রায় পাণ্ডুলিপিটি তাঁর কাগজপত্রের মধ্যে সহসা আবিষ্কার করে অনেক আয়াসে আমার সন্ধান করে কোনো নিকটাত্মীয়ের সহায়তায় অনুগ্রহপূর্বক আমার কাছে প্রেরণ করেন।

পাণ্ডুলিপি পরীক্ষা করে দেখি : মূল গ্রন্থের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে 'চর্যাপদের সাধারণ দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি' অংশটুকুর আমার অনুবাদ বর্জন করে তিনি স্বরচিত অন্য-একটি প্রবন্ধ সেখানে যোগ করতে চেয়েছেন — 'চর্যাপদে বর্ণিত দার্শনিক তত্ত্ব'। কিন্তু পাণ্ডুলিপির সঙ্গে তা না-থাকায় ইতিমধ্যে অন্যত্র প্রকাশিত তাঁর এই নামের একটি প্রবন্ধ সন্নিবেশিত করেছি। সম্ভবত তিনি এখানে সন্নিবেশের জন্যই এই প্রবন্ধটি রচনা করেছিলেন—বইটি প্রকাশে বিলম্ব ঘটাতেই অন্যত্র প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির জন্য লিখিত ভূমিকা অনুসারে : পরিশিষ্ট-অংশে তিনি নতুন দুটি প্রবন্ধ যোগ করেছেন — বিশ্বভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত 'চর্যাপদের প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ' এবং 'ক্রান্তি' পত্রিকায় প্রকাশিত 'বাংলার হিন্দু-মুসলমান ধর্ম ও সংস্কৃতির সমন্বয়'। সেই দুটি প্রবন্ধ পাণ্ডুলিপির সঙ্গে থাকায় এখানে সন্নিবেশে কোনো

অসুবিধা ঘটে নি। পাণ্ডুলিপির ভূমিকা অনুসারে : মূল গ্রন্থের পরিশিষ্ট থেকে দুটি প্রবন্ধ মর্মানুবাদ করে তিনি এখানে সন্নিবিষ্ট করতে চেয়েছিলেন। তাঁর সূচিপত্র অনুসারে তার একটি 'সন্ধ্যাভাষা বা সন্ধাভাষা' পাণ্ডুলিপির সঙ্গে রক্ষিত ছিল। সূচিপত্র অনুসারে অন্য মর্মানুবাদ 'মধ্যযুগের অবাঙালি সহজিয়াগণ' পাণ্ডুলিপিতে না থাকায় আমি মূলগ্রন্থ থেকেই সেই অংশটি অনুবাদ করে দিয়েছি।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য, আমার রচিত মর্মানুবাদ ও তাঁর সন্নিবেশিত প্রবন্ধগুলির সমস্তই আগে সাধু বাংলায় রচিত ছিল। কিন্তু একালে তা একেবারে অপ্রচলিত হওয়াতে আদ্যন্ত আমি চলিত বাংলায় রূপান্তরিত করেছি। আশা করি, তিনি এখন বর্তমান থাকলে একালে এই পরিবর্তন অপরিহার্য বোধ করতেন। আরও বলা প্রয়োজন, এই গ্রন্থের প্রথম নামটি তাঁর দেওয়া ; দ্বিতীয় নামটি সংযোজন।

মূলগ্রন্থের নিতান্তই ছায়া এই গ্রন্থ — প্রায় চুম্বক মাত্র। শুধু তাই নয়, সেই মর্মানুবাদের সঙ্গে প্রায় সমপরিমাণ মৌলিক রচনা সন্নিবেশিত হওয়াতে এটি একটি পৃথক গ্রন্থ হিসাবেই গণনীয়। অনুবাদের সমস্ত অংশ পরীক্ষা করে তিনি সংশোধন, বর্জন ও পরিবর্ধন করে গিয়েছেন। এই কঠিন বিষয়টির মুদ্রণকালে তিনি না-থাকায় অনেক দোষ-ত্রুটি থাকাই সম্ভব। সেজন্য পাঠকের মার্জনা-ভিক্ষা ব্যতীত গত্যন্তর দেখি না।

মুদ্রণের জন্য সর্বতোভাবে প্রস্তুত গ্রন্থটির প্রকাশ তিনি দেখে যেতে পারলেন না— এই বেদনা চিরদিন আমাদের মর্মে বিদ্ধ থাকবে। তাঁর স্বামীগতপ্রাণা বিদুষী সহধর্মিণীর কাছে সমগ্র বাংলা সাহিত্যের পাঠককুল সকৃতজ্ঞ ও চিরঋণী থাকবেন : তিনি তাঁর যশস্বী স্বামীর এই সৃষ্টিকে অবলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করেছেন। বর্তমান অনুবাদক তথা প্রকাশকের ঋণ তাঁর কাছে আরও অপরিশোধ্য — তিনি শুধু তার শ্রমের সার্থকতাই সাধন করেন নি, গ্রন্থটি প্রকাশের জন্য নিঃশর্তভাবেই তাকে দান করেছেন। একালে এই মহানুভবতা নিতান্তই বিরল। এই বিবিধ কারণে আজ তাঁর স্বামীর সৃষ্টি প্রণতি-সহ তাঁকেই নিবেদন করতে পেরে নিজেকে ধন্য বোধ করছি।

আচার্যদেব তাঁর প্রস্তাবিত ভূমিকায় গ্রন্থটি প্রকাশের জন্য 'বুকল্যাণ্ড লিমিটেড'-এর বিদ্যোৎসাহী কর্ণধার-মহাশয়ের কাছে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিলেন—কিন্তু কোনো অজ্ঞাত কারণে গ্রন্থটি তখন প্রকাশিত হয় নি। ভারবি'র পক্ষ থেকেই গ্রন্থটি এই প্রথম প্রকাশিত হচ্ছে।

অনুজপ্রতিম অধ্যাপক শ্রী সুশান্তকুমার বসু অবশেষে তাঁর মূল্যবান সময় নষ্ট করে এই গ্রন্থটির একটি প্রুফ দেখে অনেকগুলি ভ্রম সংশোধনে আমাদের সহায়তা করেছেন। তবুও অনেক দোষত্রুটি রয়ে গেল। তা সত্ত্বেও যদি এই গ্রন্থ কোনো পাঠকের সামান্যও কাজে লাগে তবে আমরা কৃতার্থ বোধ করব।

গোপীমোহন সিংহরায়

সূচীপত্র

প্রথম পর্ব

বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্ম ও সাহিত্য

প্রথম পরিচ্ছেদ

বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্ম ও সাহিত্যের উৎপত্তি

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সহজিয়াদের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সহজিয়া সাধন-প্রণালী ও মহাসুখ

দ্বিতীয় পর্ব

মধ্যযুগের সহজিয়া সম্প্রদায়

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বৈষ্ণব সহজিয়া ধর্ম

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সহজিয়া তত্ত্বসমূহের নিরপেক্ষ আলোচনা

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বাঙলার বাউল সম্প্রদায়

তৃতীয় পর্ব

নাথ-সম্প্রদায়

অষ্টম পরিচ্ছেদ

নবম পরিচ্ছেদ

চতুর্থ পর্ব

ধর্ম-পূজা ও বাঙলা সাহিত্য

দশম পরিচ্ছেদ

একাদশ পরিচ্ছেদ

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

পরিশিষ্ট

প্রথম পর্ব

বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্ম ও সাহিত্য

প্রথম পরিচ্ছেদ

বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্ম ও সাহিত্যের উৎপত্তি

১. সংগৃহীত সাহিত্যের বিবরণ

বৌদ্ধ সহজিয়া সম্প্রদায়ের সিদ্ধাচার্যগণের রচিত পঞ্চাশটি সঙ্গীতই প্রাচীনতম বাঙ্‌লা সাহিত্যের নিদর্শন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপালের গ্রন্থাগার থেকে তার একটি পুঁথি আবিষ্কার করে তারই নামানুসারে নামকরণ করেন 'চর্যাচর্য বিনিশ্চয়'। কিন্তু তার প্রথম পদের মুনিদত্ত-রচিত টীকা থেকে মহামহোপাধ্যায় বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় নামকরণ করেন 'আশ্চর্যচর্যাচয়'। তৎপরে শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয় একে 'চর্যাচর্য-বিনিশ্চয়' নামে অভিহিত করেন।

প্রখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ্ ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় দেখিয়েছেন যে, চর্যাপদগুলির মধ্যে মৈথিলী ও উড়িয়ার প্রক্ষেপ ও শৌরসেনী অপভ্রংশের প্রভাব সত্ত্বেও, এর ভাষা মূলত বাঙ্‌লাই। গানগুলির সঙ্গে প্রকাশিত দোহাগুলির ভাষা পশ্চিমী অপভ্রংশ বলে গৃহীত হয়েছে। এই দোহা ও গানগুলির রচয়িতাগণের মধ্যে অনেক স্থলে একই নামের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। দোহা ও সঙ্গীত-রচয়িতার এই নামের একতা এবং ধর্মমত ও সাধনপ্রণালী, ভাবকল্পনা ও শব্দব্যবহার, রূপক-অলঙ্কারের ব্যবহারে আশ্চর্য মিল, তাঁদের অভিন্নতারই পরিচায়ক। চর্যাপদগুলির রচনাকালে রাজপুত-কীতিগাথার মাধ্যমে শৌরসেনী অপভ্রংশ সমগ্র উত্তর ভারতে বিস্তার লাভ করেছিল। সুতরাং বাঙালী চর্যাকারগণের পক্ষেও শৌরসেনী অপভ্রংশে দোহা রচনা অসম্ভব নয় ।জানা গেছে, চর্যাপদ ও দোহাগুলি এবং অনেক বৌদ্ধতান্ত্রিক গ্রন্থের রচয়িতা বাঙালী ছিলেন। বাঙ্‌লায় পালরাজত্বকালে — খ্রীঃ অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে তাঁরা বর্তমান ছিলেন। সিদ্ধাচার্যগণের প্রথম স্থানীয় লুই-পা দীপঙ্কর-শ্রীজ্ঞানের সহায়তায় 'অভিসময়-বিভঙ্গ' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। দীপঙ্কর ৯৮০ খ্রীঃ জন্মগ্রহণ করেন — লুই-পা তাঁর চেয়ে বড়ো ছিলেন। সুতরাং অনুমিত হয় যে, লুই-পা দশম শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। হেবজ্র-পঞ্জিকা নামে হেবজ্রতন্ত্রের টীকায় উল্লিখিত হয়েছে যে, টীকাটি খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে গোবিন্দপালের রাজত্বকালে পণ্ডিতাচার্য শ্রীকাহ্নপদ-কর্তৃক সমাপ্ত হয়েছিল। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ অনেকে এই শ্রীকাহ্নপাদ ও চর্যাকার কাহ্নপাদকে একই ব্যক্তি বলে নির্দেশ করেন। সুতরাং চর্যাপদ ও দোহাগুলির রচয়িতাগণ খ্রীঃ দশম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে বর্তমান ছিলেন।

২. বাঙলায় বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস

খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে অশোকের রাজত্বকালে বাঙলা তাঁর রাজ্যসীমার বহির্ভূত ছিল— কাজেই বাঙলা তখনও বৌদ্ধধর্মের অধিকারভুক্ত হয় নি ।খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে ভারতবর্ষের

থেরবাদী বৌদ্ধধর্মের বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে রাজা দুট্ঠগামণী-কর্তৃক রচিত মহাস্তূপের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে সিংহলে ভিক্ষু প্রেরিত হয়েছেন, কিন্তু তাঁদের মধ্যে বাঙালীর নাম পাওয়া যায় না। সুতরাং সে-সময়েও বাঙলায় বৌদ্ধধর্মের প্রবেশ ঘটে নি। গুপ্ত রাজত্বকালেই বাঙ্লায় প্রথম বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন বাঙ্লায় এসে তাম্রলিপ্তিতে দু-বৎসর সূত্রসমূহ নকল করতে এবং বৌদ্ধ মূর্তিসমূহ অঙ্কনের জন্য যাপন করেন। এই সময় তিনি সেখানে চব্বিশটি সঙঘারাম দেখেছিলেন। অপর চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন-সাঙ খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে ভারতে এসে (হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে) তাম্রলিপ্তিতেই দশটি মঠে সহস্রাধিক ধর্মযাজক, পুন্ড্রবর্ধনে কুড়িটি সঙঘারামে হীনযান ও মহাযান-মতাবলম্বী তিনসহস্র ধর্মযাজক, সমতটে প্রায় ত্রিশটি সংঘারামে দুই-সহস্র ধর্মযাজক এবং কর্ণসুবর্ণে হীনযান সম্প্রদায়ের দশটি সংঘারামে প্রায় দুই-সহস্র ধর্মযাজক দেখে যান— তিনি কর্ণসুবর্ণ ও পুন্ড্রবর্ধনে দুটি বৌদ্ধ মহাবিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথাও বলেছেন। ইৎ-সিঙ্ তাম্রলিপ্তিতে একটি বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের ও বৌদ্ধভিক্ষুদের প্রতি জনসাধারণের গভীর শ্রদ্ধার বিষয় উল্লেখ করেছেন। হিউয়েন-সাঙের গুরু নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শীলভদ্র ছিলেন সমতটের অধিবাসী। যোগাচার বৌদ্ধমতের বিখ্যাত ধর্মগুরু বুদ্ধভদ্র তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন। পালরাজত্বের পূর্বে বাঙলায় বৌদ্ধধর্মের প্রকৃতি সঠিকভাবে জানা যায় না — তবে অনুমিত হয় যে, মহাযান সম্প্রদায়ের উদার মতবাদই সাধারণ্যে আদৃত হত। এই সময়েই মহাযান মত বজ্রযানে রূপান্তরিত হয়। পালরাজত্বকালে বৌদ্ধমতাবলম্বী পালরাজগণ বাঙ্লায় অনেক বৌদ্ধ বিহারের প্রতিষ্ঠা এবং বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় নালন্দার শ্রীবৃদ্ধিসাধন করেন। গোপালের পুত্র ধর্মপাল (বিক্রমশীলদেব) বিক্রমশীল-বিহারের ও পুন্ড্রবর্ধনের সোমপুরের মহবিহারের প্রতিষ্ঠা করেন। বিক্রমপুরের বিহার ও সোমপুরের নিকটবর্তী তারাদেবীর মন্দির সম্ভবত ধর্মপালের পুত্র দেবপাল-কর্তৃক সুসম্পন্ন করা হয়। কুমারচন্দ্র বা আচার্য অবধূত বিক্রমপুরী বিহারে একটি তান্ত্রিক গ্রন্থের টীকা রচনা করেন। ধর্মপালের রাজত্বকালে আচার্য হরিভদ্র ত্রৈকূটক বিহারে 'অষ্টসাহস্রিকা-প্রজ্ঞাপারমিতা'র টীকা রচনা করেন। আচার্য প্রজ্ঞাবর্মন ও তাঁর গুরু বোধিবর্মনের বাসস্থানে একটি এবং উত্তরবঙ্গের দেবীকোটে সম্ভবত বৌদ্ধতান্ত্রিক অদ্বয়বজ্র ও মেখলার বাসস্থানে একটি বিহার ছিল। বৌদ্ধসন্ন্যাসী তৈলপাদ ও তৎশিষ্য নাড়পাদ ও তাঁর তিব্বতগামী এক শিষ্যের বাসস্থান চট্টগ্রামের পণ্ডিতবিহার তান্ত্রিক সাধনার কেন্দ্র ছিল। পট্টিকেরক নগরের অধিবাসী বিনয়শ্রীমিত্রের অনুরোধে কাশ্মীরের শাক্যভিক্ষু যশোভদ্র কর্তৃক 'বজ্রপাদ-সারসংগ্রহ' রচিত হয়। নাড়পাদ এই গ্রন্থের টীকা রচনা করেন। গোপীচাঁদ বা গোবিন্দচন্দ্ররাজার গানে এই স্থান পাটিকার রাজ্য বলে কথিত। ত্রিপুরার অন্তর্গত পাটিকার পরগনা এই স্থানের সঙ্গে অভিন্ন বলে প্রমাণিত হয়েছে। পালরাজত্বকালে বাঙ্লায় বৌদ্ধধর্মের আলোচনায় ভারত ও তিব্বতে ধর্মপ্রচারক বাঙ্লার অতীশ-দীপঙ্করের নামও উল্লেখযোগ্য।

সর্বশেষ পালরাজা রামপাল গঙ্গা ও করতোয়া-সঙ্গমে তাঁর রামাবতী নগরে জগদ্দল-বিহার প্রতিষ্ঠা করে মহাতারা ও অবলোকিতেশ্বরের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত বিহারে পণ্ডিত বিভূতিচন্দ্র ও দানশীল, ন্যায়-পণ্ডিত মোক্ষকর গুপ্ত, তান্ত্রিক গ্রন্থপ্রণেতা শুভকর গুপ্ত, ধর্মকর প্রভৃতি বাস করতেন — তিব্বত থেকেও অসংখ্য বৌদ্ধভিক্ষু সংস্কৃত-গ্রন্থ অনুবাদ করতে আসতেন। সুতরাং পালরাজত্বকালে বাঙ্লায় অসংখ্য বৌদ্ধতান্ত্রিক পণ্ডিত বর্তমান ছিলেন— চর্যাপদ ও দোহা রচয়িতাদের অনেকেই সম্ভবত এই সময়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

ওই সময়ের শিল্প ও ভাস্কর্য মহাযানমতের বজ্রযানমতে রূপান্তরের পরিচায়ক— সমসাময়িক বৌদ্ধ দেবদেবীর যুগলমূর্তি বা যুগনদ্ধের ভগ্নাবশেষ তৎকালীন বৌদ্ধধর্মে শক্তি-উপাসনার অনুপ্রবেশের সাক্ষ্য বহন করছে। চর্যাপদগুলির অন্তর্নিহিত বৌদ্ধ সহজিয়ামতে প্রবেশ করতে হলে তার মূল তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে পরিচিত হওয়া আবশ্যক।

৩. তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ

খ্রীষ্টীয় অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে মহাযান বৌদ্ধধর্মের পরিণতিকেই তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম বলা হয়। অসঙ্গের 'মহাযান-সূত্রালঙ্কার'-এ বলা হয়েছে — মুক্তিসাধনায় আদর্শ, সাধনপ্রণালী, প্রতিশ্রুত সময়ের স্বল্পতা ও ব্যক্তিমুখিনতায় হীনযান সঙ্কীর্ণ আদর্শের অনুসারী ; অন্যদিকে মহাযান-মতবাদ আদর্শের উদারতায় ও বিশ্বমানবের প্রতি অনুকম্পায় মহত্তর ।

বুদ্ধের তিরোভাবের পরে, তাঁর বাণীসমূহের প্রকৃত অর্থ ও বৌদ্ধধর্মের আদর্শ সম্বন্ধে বিতর্ক ওঠে — বৈশালীর দ্বিতীয় অধিবেশনে একদল ভিন্নমত হয়ে মহাসঙ্গ নামে অপর একটি সভা আহ্বান করেন এবং পরবর্তীকালে মহাসাঙ্গিক-নামে পরিচিত হন । ক্রমে এই প্রসারকামী মহাসাঙ্গিক ও রক্ষণশীল থেরবাদীদের মধ্যে প্রভূত মতবিরোধ দেখা দেয় এবং তাঁরা যথাক্রমে মহাযানী ও হীনযানী নামে পরিচিত হন ।

হীনযানীদের লক্ষ্য ধ্যানধারণা ও কঠিন নিয়মানুবর্তিতার মধ্য দিয়ে স্বীয় ভব-চক্র থেকে সাধকের মুক্তি বা অর্হত্ব লাভ ; কিন্তু মহাযানীদের লক্ষ্য করুণা ও শূন্যতার অবলম্বনে বোধিসত্ত্ব অবস্থার কয়েকটি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে বিশ্বমানবের কল্যাণের জন্য বুদ্ধত্বলাভ। মহাযান-মতে, প্রত্যেকের সম্যক বুদ্ধত্ব লাভ করবার সহজ শক্তি আছে — যেহেতু প্রত্যেকের মধ্যে বুদ্ধ রয়েছেন । এটি পূর্ণ প্রজ্ঞা ও সর্বভূতে মহাকরুণার দ্বারাই সম্ভব ; এই মহাকরুণা তাকে বিশ্বের কল্যাণ-কামনায় উদ্বুদ্ধ করে। বিশ্বের কল্যাণ তাঁদের কাছে ব্যক্তিগত নির্বাণের চেয়ে শ্রেয়। বোধিসত্ত্বত্ব লাভের অর্থ শূন্যতা ও করুণার অভিন্নরূপ বোধিচিত্ত লাভ। হীনযানীরা বুদ্ধকে একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তিরূপেই দেখেছেন। কিন্তু মহাযান মতে, তিনি সর্বভূত ও সর্বজীবের আদিভূত পরমতত্ত্বস্বরূপ। তাঁরা এই পরমতত্ত্বের তিনটি কায়ার কল্পনা করেছেন— (১) ধর্মকায় (সর্বভূতের কারণস্বরূপ 'তথতা'), (২) সম্ভোগকায় (বোধিসত্ত্বরূপ দিব্যশরীর), (৩) নির্মাণকায় (বুদ্ধের ঐতিহাসিক দেহ)। এই দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির বৈপরীত্য নিয়েই মহাযান মত হীনযানমতের পাশাপাশি দীর্ঘদিন চলে এসেছে। এখানে লক্ষণীয় এই যে, মহাযানমত সর্বভূতের কল্যাণ-কামনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বীয় ধর্মাদর্শকে প্রসারিত করে ক্রমে বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের আদর্শ ও আচার-অনুষ্ঠানকে নিজের মধ্যে গ্রহণ করেছে। সেজন্যই অসংখ্য বিসদৃশ ধর্মবিশ্বাস ও সাধনপ্রণালী এবং অসংখ্য দেবদেবী-মন্ত্রতন্ত্র-বিধিনিষেধ তার মধ্যে অল্পদিনেই স্থান লাভ করেছে। কালক্রমে মহাযান-সম্প্রদায়ের মধ্যেই দুটি সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়— পারমিতানয় ও মন্ত্রনয়। মন্ত্রনয় বা মন্ত্রযান সম্ভবত তান্ত্রিক-বৌদ্ধধর্মের বা বজ্রযান, কালচক্রযান, সহজযান-প্রভৃতি ধর্মমতের পূর্বরূপ।

কথিত আছে, যোগাচার-মতের প্রবর্তক অসঙ্গ বৌদ্ধধর্মে এই তান্ত্রিকতা-আনয়নের জন্য দায়ী — তিনি তুষিত-স্বর্গে মৈত্রেয়-কর্তৃক এই মতবাদে দীক্ষিত হন। মতান্তরে মাধ্যমিক মতবাদের প্রবর্তক নাগার্জুন এই তান্ত্রিকতা প্রবর্তনের জন্য দায়ী — তিনি এটি লাভ করেন দক্ষিণ ভারতের লৌহসৌধে বৈরোচনের নিকট থেকে। অসঙ্গের 'মহাযান-সূত্রালঙ্কার'-এ বলা

হয়েছে, 'মৈথুনস্য পরাবৃত্তৌ বিভুত্বং লভ্যতে পরম্'। অনেকে মনে করেন, উক্ত শ্লোকের 'মৈথুনস্য পরাবৃত্তি' নিঃসন্দেহে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মে মৈথুন প্রণালীর পরিচায়ক। এর থেকে চতুর্থ-পঞ্চম শতকে অসঙ্গের সময়ে তাঁর দ্বারা বৌদ্ধধর্মে যে তান্ত্রিকতা প্রবেশ করে — এই অনুমান কিয়ৎ পরিমাণে সমর্থিত হয়। অনেকের মতে, বুদ্ধ নিজেই তাঁর ধর্মকে সাধারণের উপযোগী করার জন্য তাঁর মধ্যে মন্ত্রতন্ত্র-মুদ্রামণ্ডল-ঝাড়ফুঁক-যাদুবিদ্যা প্রভৃতিকে স্থান দিয়েছিলেন। এই মতের সমর্থনে, বুদ্ধের চার 'ঋদ্ধি'তে (উচ্চ সাধকগণ-কর্তৃক লভ্য অলৌকিক শক্তি) বিশ্বাসের কথা উল্লিখিত হয় এবং 'তত্ত্বসংগ্রহ' ও তার টীকায় লিখিত তন্ত্রমন্ত্র-ব্যবহারে বুদ্ধের অনুমতির কথা উল্লিখিত হয়। কিন্তু শুদ্ধমাত্র ঋদ্ধিতে বিশ্বাস যেমন বুদ্ধের তান্ত্রিকতা-প্রবণতার প্রমাণ করে না — তেমনই তাঁর তিরোধানের প্রায় চৌদ্দ শত বৎসর পরে লিখিত 'তত্ত্ব-সংগ্রহ'-এর বিবরণও নির্ভরযোগ্য নয়। বুদ্ধের সময়েও তান্ত্রিক আচারের, এমনকি মৈথুন-সাধন প্রণালীর প্রচলন থাকলেও, যে-বুদ্ধ বৈদিক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন, তিনি যে শুধু নিজের ধর্মকে সহজসাধ্য করার জন্য তান্ত্রিকতার প্রবর্তন করেছিলেন, সে-কথা শ্রদ্ধেয় বলে মনে হয় না।

কেউ-কেউ হিন্দুতন্ত্র ও বৌদ্ধতন্ত্রের মধ্যে কোন্‌টি প্রাচীনতর তা নির্ণয় করবার চেষ্টা করেছেন। বলা বাহুল্য, তান্ত্রিকতার প্রধান লক্ষণগুলি হিন্দু অথবা বৌদ্ধধর্ম-সঞ্জাত নয়। এটি ভারতের একটি সুপ্রাচীন ধর্মমত বা সাধন-প্রণালী ; — হিন্দুদর্শন ও ধর্মের সংস্পর্শে তা কোথাও হিন্দুতন্ত্র এবং বৌদ্ধদর্শন ও ধর্মভাবের সংস্পর্শে কোথাও বৌদ্ধতন্ত্রে রূপ লাভ করেছে। বৌদ্ধধর্মে তান্ত্রিকতা-প্রবর্তনে অসঙ্গের প্রভাব থাকলেও, একথা নিশ্চিত যে, তাঁর আগেই আগম-শাস্ত্রের বহু-প্রচলন ছিল। যাবতীয় তান্ত্রিকগ্রন্থের মূলে রয়েছে এই আগমশাস্ত্র। সোমানন্দ ও উৎপলের সময়েও এক বিরাট তান্ত্রিক সাহিত্যের অস্তিত্ব ছিল এবং তাদের অধিকাংশ সে-সময়েরও প্রাচীন ছিল। দশম শতকে রচিত অভিনবগুপ্তের 'তন্ত্রালোক' অসংখ্য আগম-গ্রন্থের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। হিন্দুতন্ত্র ও বৌদ্ধতন্ত্রগ্রন্থ-সমূহের চিন্তাধারা ও সাধন প্রণালীর গভীর ঐক্য তাদের উৎসমূলে প্রাচীনতর কোন সাংস্কৃতিক পটভূমিকার পরিচয় দান করেছে। মহাযান বৌদ্ধধর্মে মন্ত্রের উপাদান বোধ হয় 'ধারণী'-গ্রহণের মধ্য দিয়েই প্রবেশ লাভ করে। বসুবন্ধুর 'বোধিসত্ত্বভূমি'তে পরমসত্যকে লাভ করার জন্য মন্ত্রের প্রয়োজন আলোচিত হয়েছে এবং বোধিসত্ত্বের চারপ্রকার ধারণীর কথা বলা হয়েছে। (১) ধর্ম ধারণীমন্ত্রে স্মৃতি-প্রজ্ঞা-বল লাভ হয়, (২) অর্থ ধারণীমন্ত্রে ধর্মসমূহের প্রকৃত অর্থের দিব্যজ্ঞান লাভ হয়, (৩) মন্ত্র ধারণী-মন্ত্রে পূর্ণতা লাভ হয়, (৪) তিতিক্ষা ধারণীমন্ত্রে বক্তার ধর্মের স্বরূপোলব্ধি ও তৎদ্বারা তিতিক্ষা লাভ হয়। এই প্রসঙ্গে বসুবন্ধু মন্ত্রসমূহের অর্থহীনতার কারণ ব্যাখ্যা করেছেন— মন্ত্রসমূহের অর্থহীনতা শ্রোতার মনে এই দিব্যজ্ঞানের উদ্বোধ করে যে, সকল ধর্মই অন্তঃসারশূন্য। কোন পদার্থের মূলেই সারবস্তু নেই (অর্থের পরিহার করেই তা এক অপরিবর্তনীয় অর্থের ইঙ্গিত করছে)।

মন্ত্রের সঙ্গে মুদ্রার ব্যবহারও বৌদ্ধধর্মে ব্যাপকভাবে প্রচলিত। মুদ্রার অর্থ হস্ত ও অঙ্গুলির বিবিধ সংস্থান। তান্ত্রিক যোগসাধনায় মন্ত্রের মধ্যে যেমন শব্দের অন্তর্নিহিত শক্তি— মুদ্রার মধ্যে তেমনই স্পর্শের গুহ্য শক্তি রয়েছে। তা ছাড়া মণ্ডলের ব্যবহারও বৌদ্ধধর্মে স্থান লাভ করেছে।

বিচিত্র ধর্মবিশ্বাসের বিভিন্নমুখী প্রবাহ, অসংখ্য দেবতা-উপদেবতা, যক্ষ-রক্ষ, ভূতপ্রেত,

হঠযোগ-রাজযোগ-লয়যোগ-মন্ত্রযোগ প্রভৃতি ধীরে ধীরে বৌদ্ধধর্মের উন্মুক্ত দ্বারপথে প্রবেশ করে এবং এইভাবেই বিনয়-ধ্যান-প্রধান ভিক্ষুধর্ম ক্রমে বিমিশ্র তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মে রূপান্তরিত হয়ে গেল।

তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের প্রথম পর্যায়ে মন্ত্র-মুদ্রা-মণ্ডল-অভিষেক এবং তারপরে গুহ্যযোগের ব্যবহার দেখা যায়। কালক্রমে এই গুহ্যযোগই মহাসুখ-লাভের প্রকৃষ্ট পন্থা ও অন্যান্য প্রণালী প্রাথমিক পন্থারূপে গণ্য হয়। গুহ্যযোগ প্রবেশ করার পর তান্ত্রিক সাধনা বজ্রযানে রূপান্তরিত হয়। বজ্রযানও চার ভাগে বিভক্ত — ক্রিয়াতন্ত্র, চর্যাতন্ত্র, যোগতন্ত্র, অনুত্তরতন্ত্র। প্রথম দুটি তন্ত্রে দেবদেবীর পূজাপদ্ধতি ও শেষ দুটিতে পরমতত্ত্ব লাভের জন্য যোগপদ্ধতি আলোচিত হয়েছে। শেষ দুটিকে শ্রেষ্ঠতর তন্ত্র বলা হয়েছে।

তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম অন্যরূপেও বিভক্ত হয় — বজ্রযান, কালচক্রযান ও সহজযান। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কালচক্রযান ও সহজযান বজ্রযানেরই অন্তর্ভুক্ত। কালচক্রযানের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট নয়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এ বিষয়ে বৈশিষ্ট্য-নির্দেশে বলেছেন, যে-যানের সাহায্যে কালচক্রের গতি রোধ করা যায়। কালচক্রযানকে অনেকে যে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মেরই একটা ভয়ঙ্কর রূপ বলে উল্লেখ করেছেন, 'শ্রীকালচক্রতন্ত্র' পাঠে তা মনে হয় না। তাতে বলা হয়েছে যে, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সর্বভূত ও সর্বজীবের সংস্থান নিয়ে আমাদের দেহের মধ্যেই অবস্থিত — কালের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ভাগ তার দিনরাত্রি-পক্ষমাস-বৎসর নিয়ে দেহের মধ্যে প্রাণবায়ুরূপে বর্তমান। এই গ্রন্থে সহজধর্ম আচরণের জন্য কায়সাধনার উৎকর্ষ আলোচিত হয়েছে। এখানে বা এর টীকা 'লঘুকালচক্রতন্ত্র রাজটীকা'তে বজ্রযান ও কালচক্রযানের মধ্যে কোনও মূলগত পার্থক্য দেখা যায় না। তবু কালচক্রযানে যেন যোগের উপর একটু বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। যোগের অর্থ প্রাণ ও অপাণ বায়ুর নিয়ন্ত্রণ। অভিনবগুপ্তের তন্ত্রালোকে কালচক্রযানে যোগের দ্বারা কালচক্রের প্রভাব থেকে নিষ্কৃতি লাভের উপায় বর্ণিত হয়েছে। দিবারাত্রি-পক্ষ-মাস-বৎসর দেহযন্ত্রে প্রাণবায়ুরূপে সঞ্চারিত — সুতরাং কালকে রোধ করার উপায় যোগের দ্বারা নাড়ীসমূহের মধ্যে প্রবাহিত প্রাণবায়ুর সংযম।

৪. মহাযান বৌদ্ধধর্মের প্রধান চিন্তাধারাগুলির তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মে রূপান্তর

তান্ত্রিকতার উদ্ভবের মূলে হিন্দুধর্মও নেই, বৌদ্ধধর্ম নেই — ভারতীয় ধর্মের ইতিহাসের সুদূর অন্ধকার যুগে এর সূচনা। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধর্মের ও দার্শনিক মতবাদের সংস্পর্শে এবং মহাযান বৌদ্ধধর্মের মূলভাব ও সাধন প্রণালীর সংযোগে যা তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মে পরিণত হয়।

মহাযান বৌদ্ধধর্মের শূন্যতার 'বজ্রে' পরিবর্তনই একটি প্রধান পরিবর্তন। 'অদ্বয়বজ্রসংগ্রহে' বলা হয়েছে যে, দৃঢ়ত্ব, সারত্ব, অসৌশীর্যত্ব (নিশ্ছিদ্রত্ব), অচ্ছেদ্যাভেদ্য-লক্ষণত্ব, অদাহিত্ব এবং অবিনাশিত্বের জন্য শূন্যতাকেই 'বজ্র' বলা হয়। বজ্রযানে সকল দেবদেবী ও উপচারকে বজ্রদ্বারা চিহ্নিত করে তাদের পূর্ব-ইতিহাসকে লুপ্ত করা হয়েছে। বজ্রযানের প্রধান দেবতা বজ্রসত্ত্ব —অন্যান্য দেবতা তাঁকে কেন্দ্র করেই জেগে উঠেছেন। এই বজ্রসত্ত্ব বৌদ্ধ তন্ত্রসমূহে উপনিষদের ব্রহ্মের আদর্শেই কল্পিত হয়েছেন — ইনিই জীবের পরম-প্রতিষ্ঠা, সর্বভূতের আদিভূত পরমতত্ত্ব এবং বোধিচিত্তরূপে ইনিই পরমসত্যস্বরূপ। মহাযানমতে শূন্যতা ও করুণার অভেদমিলনে বোধিচিত্তের উদ্ভব ; এই বোধিচিত্ত দশটি ভূমির মধ্য দিয়ে 'ধর্মমেঘ' অবস্থায় উপনীত হলে সম্যক সম্বোধি লাভ হয়। বজ্রযানে বিশেষত সহজযানে শূন্যতা ও করুণার

মিলনই নারী ও পুরুষ বা প্রজ্ঞা ও উপায়ের মিলন বলে কল্পিত হয়েছে এবং এই জাতীয় গুহ্যযোগের দ্বারা উৎপন্ন বোধিচিত্ত 'মহাসুখ' লাভের উপায় বলে বর্ণিত হয়েছে। যোগসাধনায় বিন্দুশোণিতের মিলিতাবস্থাকেও 'বোধিচিত্ত' বলা হয়। মহাযানমতে শূন্যতা বিশ্বজগৎ ও সকল ধর্ম সম্বন্ধেই শূন্যতাবোধ — এটিই প্রজ্ঞা ; সর্বভূতের সঙ্গে একত্ব-বোধ এবং তজ্জাত মহাকরুণাই হল বোধিচিত্ত লাভের 'উপায়'।

তথতাবাদী অশ্বঘোষ ও মাধ্যমিকবাদী নাগার্জুন উভয়েই এই প্রজ্ঞা ও উপায় শব্দ ব্যবহার করেছেন। প্রজ্ঞা সত্যের নিষ্ক্রিয় নির্গুণ নিবৃত্তির দিক এবং করুণা সক্রিয় সগুণ প্রবৃত্তির দিকরূপে কল্পিত। উপায় নির্গুণ-নিষ্ক্রিয় প্রজ্ঞায় সমস্ত সম্ভাবনাকে জাগ্রত করে বলে 'পুরুষ'রূপে, আর প্রজ্ঞা নারীরূপে কল্পিত। সাংখ্য ও হিন্দুতন্ত্রমতের তা বিপরীত। সেখানে অসঙ্গ নির্গুণ সত্যই পুরুষ — প্রকৃতি বা শক্তি ত্রিগুণাত্মিকা। এইরূপে শূন্যতা ও করুণার মিলনে বোধিচিত্ত-লাভের সাধনা প্রজ্ঞা-উপায়-যোগে মহাসুখ লাভের সাধনায় পরিবর্তিত হয়ে বৌদ্ধধর্মের সর্বাংশেই এক বিপুল পরিবর্তনের সূচনা করে।

বৌদ্ধতন্ত্রের প্রজ্ঞা-উপায়ের মিলিত সাধনা হিন্দুতন্ত্রের শিব-শক্তির মিলিত সাধনার একান্ত অনুরূপ। তন্ত্রানুযায়ী মানবের দেহেই ব্রহ্মাণ্ডের সকল সত্য নিহিত — এই তত্ত্ব তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মে গৃহীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রজ্ঞা ও উপায় মেরুদণ্ডের উভয়পার্শ্বে দুইটি প্রধান নাড়ীর সঙ্গে অভিন্ন বলে কল্পিত হয়। হিন্দুতন্ত্রে এই দুটি নাড়ী ইড়া-পিঙ্গলা নামে প্রসিদ্ধ ; বৌদ্ধতন্ত্রে এরা প্রজ্ঞা-উপায়, আলি-কালি, গঙ্গা-যমুনা, চন্দ্র-সূর্য, বাম-দক্ষিণ, স্বর-ব্যঞ্জন, এ-কার ও বং-কার, চমন-ধমন-প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ। হিন্দুতন্ত্রের সুষুম্না-নামক মধ্যবর্তী নাড়ী বৌদ্ধতন্ত্রে অবধূতিকা নামে অভিহিত। অবধূতিকার মধ্য দিয়ে বোধিচিত্ত নাভিপদ্মে অবস্থিত নির্মাণচক্র (নির্মাণকায়) থেকে হৃদয়স্থিত ধর্মচক্র (ধর্মকায়) এবং সেখান থেকে কণ্ঠস্থিত সম্ভোগচক্র (সম্ভোগকায়), তৎপরে মস্তকস্থিত উষ্ণীষ-কমল বা মহাসুখচক্রে গমন করে মহাসুখ দান করে।

এখানে 'অদ্বয়' ও 'যুগনদ্ধ' পরিকল্পনাও লক্ষ্য করতে হবে। যুগনদ্ধের অর্থ অদ্বয়সত্য। এটি গ্রাহ্য-গ্রাহক, ক্ষণিক-শাশ্বত, প্রজ্ঞা-উপায়, সংসার-নিবৃত্তি ও সাকার-নিরাকার — এই অদ্বয়-দ্বৈধতার সম্মিলিত রূপ। 'অদ্বয়বজ্রসংগ্রহে' বলা হয়েছে — শূন্যতা ও করুণা একত্র অবস্থান করে —শূন্যতার বিকাশই করুণা, আবার শূন্যতাই করুণার স্ত্রী। তাদের মধ্যে সহজ সম্বন্ধ দাম্পত্য প্রেম — করুণাহীন শূন্যতা প্রাণহীন এবং শূন্যতাহীন করুণা বন্ধনদশায় জর্জরিত। শূন্যতা ও করুণার সম্মিলিত অবস্থাই ন-পুংসক বা যুগনদ্ধ।

শৈব ও শাক্ততন্ত্রে অদ্বয়সত্যের দুই রূপ। একরূপ গুণাতীত নিবৃত্তি স্বরূপ — এইরূপই চিন্মাত্রতনু শিব ও অপররূপ ত্রিগুণাত্মিকা শক্তি — তিনি প্রবৃত্তিস্বরূপিনী, সংসার-প্রপঞ্চের কারণভূতা। এই শিব বা শক্তি কেউই অন্যোন্যনিরপেক্ষ নন। পরম-অদ্বয়-স্বরূপে একাত্মভাবে অবস্থান করেন উভয়ে। এরই নাম শিবশক্তির মিথুনরূপ। এই শিবশক্তির মিলিতাবস্থাই পরমার্থ — জীবের একমাত্র কাম্য।

তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের মধ্যে আমরা যে দেবদেবীর মিলিত মূর্তি দেখতে পাই তা একই সত্যের পরিচায়ক। এই অদ্বয় বা যুগনদ্ধ ভাবের সঙ্গে 'সমরস'-এর আদর্শ গভীর ভাবে সম্পৃক্ত। সমরসের অর্থ বিশ্বপ্রকৃতির বৈচিত্র্যের মধ্যে নিবিড় ঐক্যানুভূতি — একরসানুভূতি চরমতম অনুভূতির মুহূর্তে প্রজ্ঞা-উপায়, প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি, স্থাবর-জঙ্গম, ভাব ও অভাব — সকলের মধ্যে একটা পূর্ণ সমত্ব বোধ।

বৌদ্ধধর্মের নির্বাণের আদর্শ তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মে 'মহাসুখে' পরিবর্তিত হয়। নির্বাণের অর্থ-একটি প্রবাহের পূর্ণচ্ছেদ বা দীপনির্বাণ। সর্ববিধ বাসনা-সংস্কারের সমাপ্তির ভাব হতেই নির্বাণ কথাটি নেওয়া হয়েছে। কিন্তু লৌকিক বিশ্বাসে নির্বাণ একটি ভাবস্বভাব অবস্থা। পালি গ্রন্থে এই অবস্থাকে শুধু ভাবস্বভাবই নয়, পরমসুখাবস্থাও বলা হয়েছে। বিজ্ঞানবাদে নির্বাণ বা বিজ্ঞপ্তিমাত্রতাকে অচিন্ত্য, কুশল, ধ্রুব, পরমসুখ, মুক্তি ও সারতত্ত্ব-স্বরূপ বলা হয়েছে। তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মে নির্বাণের ভাবস্বভাব দিক মহাসুখের উপর জোর দেওয়ার ফলে পরবর্তীকালে নির্বাণ ও মহাসুখ সমার্থক হয়ে পড়ে। তন্ত্রে নির্বাণ সততসুখময় 'সুখাবতী'রূপে অভিহিত হয়।

ক্রমে মহাসুখ বিভিন্ন তান্ত্রিক বৌদ্ধ সম্প্রদায়ে বিভিন্ন তত্ত্বব্যাখ্যা লাভ করে। মহাযান বৌদ্ধধর্মে নির্বাণ অস্তিত্ব-বিলুপ্তিহীন পরমসত্য ধর্মকায়া ; তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মে মহাসুখ ভবনির্বাণের মিলিতাবস্থা, অস্তিত্ব-অনস্তিত্ব—ইনিই প্রভু বজ্রসত্ত্ব। আসলে এই 'মহাসুখস্বরূপ' ও হিন্দুগণের 'পরমব্রহ্মানন্দ-স্বরূপ' মূলত অভিন্ন। এইরূপে নির্বাণ মহাসুখরূপে কল্পিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মে পরমানন্দ লাভই জীবনের আদর্শ এবং সেজন্য গুহ্যযোগই প্রকৃত পন্থা বলে বিবেচিত হয়। এই প্রক্রিয়ায় চূড়ান্ত অনুভূতির মুহূর্তে স্থাবর-জঙ্গম-বিশ্বচরাচর যে অখণ্ড রসমূর্তি পরিগ্রহ করে, তাই মহাসুখরূপে কল্পিত হয়। তৎপরে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মে মহাসুখ সম্বন্ধে উক্ত ধারণাই ক্রমে পল্লবিত হতে থাকে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

চর্যাপদে বর্ণিত দার্শনিক তত্ত্ব

চর্যাপদগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাই, তত্ত্বের দিক থেকে বিচার করলে এর দুটি দিক রয়েছে। একটি হল দার্শনিক তত্ত্বের দিক, আর একটি হল সাধনার দিক। দার্শনিক তত্ত্বের দিকটা এর প্রধান দিক নয়। প্রধান দিক হল সাধন-তত্ত্বের দিক। এর কারণ হল চর্যাপদের কবিগণ ছিলেন মুখ্যত একটি বিশেষ গুহ্যযোগপন্থার সাধক ; তাঁদের সেই সাধনার বিভিন্ন প্রক্রিয়া এবং সেই সাধনালব্ধ বিচিত্র অনুভূতি — এর প্রকাশই ছিল তাঁদের মুখ্য লক্ষ্য। বৌদ্ধতন্ত্র এবং হিন্দুতন্ত্রগুলির মধ্যেও দেখতে পাই, তর্কপ্রধান দার্শনিক তত্ত্ব প্রচারে তাদের কোনও উৎসাহ নেই — তাদের সমস্ত উৎসাহ হল সাধনার দ্বারা তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার করা। চর্যাপদগুলির মধ্যে যে দার্শনিক পটভূমিটি গৃহীত হয়েছে সেই পটভূমিটি মোটামুটিভাবে মহাযান বৌদ্ধধর্মের অন্তর্বর্তী বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায়ের মতগুলি দ্বারাই গঠিত। মহাযান বৌদ্ধধর্মের অন্তর্বর্তী মতগুলির মধ্যে দুটি মতকে প্রধানভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে— একটি হল নাগার্জুনপাদ-প্রবর্তিত শূন্যবাদ, বা মাধ্যমিক বাদ ; অপরটি হল মৈত্রেয়, অসঙ্গ, বসুবন্ধু-প্রবর্তিত বিজ্ঞানবাদ বা যোগাচারবাদ। এই দুটি প্রসিদ্ধ মতবাদের মধ্যে যে-সমস্ত সিদ্ধান্তগত পার্থক্য রয়েছে চর্যাপদগুলির মধ্যে সেই পার্থক্য রক্ষিত হয় নি—সেখানে দেখতে পাই, বিজ্ঞানবাদের পাশেই শূন্যবাদের অনুকূল পদ রয়েছে ।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি জিনিস লক্ষ্য করা যেতে পারে। মহাযানের মধ্যে নাগার্জুনের শূন্যবাদ মুখ্যত নেতিবাচক — এটি সত্য নয়, ওটি নয় — সেটি নয় —, পরমার্থতত্ত্বকে সত্য বলা যায় না, মিথ্যাও বলা যায় না, তদুভয়ও বলা যায় না — অনুভয়ও বলা যায় না ; তা আছে বলতে পারি না — নেইও বলতে পারি না — আছেও বটে নেইও বটেও বলতে পারি না ; আছে এবং নেই, তার কোনটাই সত্য নয়, তাও বলতে পারি না। পরমার্থ সত্য এইভাবে চতুষ্কোটি-বিনির্মুক্ত — এবং যে-তত্ত্ব এই চতুষ্কোটি-বিনির্মুক্ত তাইই হল শূন্য। পরমার্থ সত্য সম্বন্ধে অস্ত্যর্থকভাবে কোনও কথা বলা যায় না বলেই নাগার্জুন তাকে শূন্যতা বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু বিজ্ঞানবাদিগণ শূন্যতাকে এমন করে অনস্তিবাচক বলে গ্রহণ করেন নি — তাঁরা বিশুদ্ধ বিজ্ঞানকেই (বিজ্ঞপ্তিমাত্রতা) শূন্যতত্ত্ব বলে অভিহিত করেছেন। এই বিজ্ঞপ্তিমাত্রতা আছে — কিন্তু তা অভূত-পরিকল্প (ন ভূত পরিকল্প অর্থাৎ হয় নি কোনও প্রকারের মানসিক পরিকল্প যেখানে) রূপে অবস্থিত। আমরা পূর্বেই ইঙ্গিত দিয়েছি, বিজ্ঞানবাদের এই অস্ত্যর্থক মতবাদের সঙ্গে আমাদের ঔপনিষদিক বা বৈদান্তিক ব্রহ্মবাদের একটি নিগূঢ় যোগ রয়েছে ; অর্থাৎ বিজ্ঞানবাদের 'অভূতপরিকল্প'কে বা 'বিজ্ঞপ্তি-মাত্রতা'কে আর একটু বাড়িয়ে নিলেই তা বৈদান্তিক ব্রহ্মবাদে পর্যবসিত হয়। এই কারণেই প্রসিদ্ধ বৈদান্তিক শঙ্করাচার্যকে পরবর্তী কালে অনেকে প্রচ্ছন্নবৌদ্ধ বলে অভিহিত করতেন। আমরা চর্যাপদগুলির ভেতরে দেখতে পাব, চর্যাকারগণ বহু স্থানেই এই বিজ্ঞানবাদী মহাযান ধর্মকে অবলম্বন করে একটু-একটু করে হিন্দু

ব্রহ্মবাদে বা আত্মবাদেই গিয়ে পৌঁছেছেন। এই প্রসঙ্গে আর একটি তথ্যও আমাদের স্মরণ রাখতে হবে : যে যুগে এই চর্যাপদগুলি রচিত সেই পালযুগ হল আমাদের ধর্ম ও সংস্কৃতির দিক থেকে একটি সর্বাঙ্গীণ সমন্বয়ের যুগ। সেই সমন্বয়ের মুখে হিন্দু-বৌদ্ধ চিন্তাও মিলিত হয়ে একটি সমন্বিত রূপ লাভ করেছিল, আবার সাধনার ক্ষেত্রেও উভয় ধারার সাধনা মিলিত হয়ে একটি সমন্বিত লোকায়ত সাধনার ধারা সৃষ্টি করেছিল। ধ্যান-মনন ও সাধনার দিক থেকে চর্যাপদগুলির মধ্যে যে-যে উপাদান পাওয়া যায় তার কতটা হিন্দু এবং কতটা বৌদ্ধ তা পৃথক করে দেখাও সর্বত্র সম্ভব নয়।

চর্যাপদগুলির মধ্যে কতগুলি পদ দেখতে পাই, যা সাধারণ বৌদ্ধধর্মের চিন্তাধারা থেকেই প্রসূত। যেখানেই বলা হয়েছে —:

ভবণই গহণ গম্ভীর বেগেঁ বাহী ।
দুআন্তে চিখিল মাঝে ন থাহী ॥ (চর্যা ৫)

তখন সমগ্র অস্তিত্ব-প্রবাহকে বৌদ্ধধর্মে যে একটি নদীপ্রবাহের সঙ্গে উপমিত কবা হয়েছে তারই কথা স্মরণ করি। একটি নদীপ্রবাহের মধ্যে যেমন দেখতে পাই, প্রত্যেক মুহূর্তের প্রতিটি জলকণাই অন্য জলকণা থেকে পৃথক — তথাপি সব জুড়ে একটি অখণ্ড প্রবাহের প্রতীতি হচ্ছে, তেমনই আমরা যাকে সংসার-প্রবাহ বলি সেই প্রবাহের ভিতরকার তিনটি অস্তিত্বই ক্ষণিক এবং পৃথক — তথাপি সব জুড়ে আমাদের একটা অখণ্ড ভব-প্রবাহের প্রতীতি ঘটছে। দ্বিতীয় পংক্তিটির মধ্যেও আমরা প্রাচীন বৌদ্ধমতের প্রতিধ্বনি দেখতে পাই। বৌদ্ধমতকে সাধারণভাবেই মাধ্যমিক মত বলা হয়ে থাকে ; সাধনা বিষয়ে বুদ্ধদেব প্রথমে একটা চরম কৃচ্ছ্রতার পথ বেছে নিয়েছিলেন — কিন্তু পরে তিনি এই সত্য উপলব্ধি করলেন যে, সাধনার পথ যেমন ভোগের পথ হওয়া উচিত নয়, তেমনি আবার চরম কৃচ্ছ্রতার পথও হওয়া উচিত নয় — মধ্যপথই হল শ্রেয়। এখানে সেই মধ্যপথেরই ইঙ্গিত দেখতে পাচ্ছি ; কিন্তু সেই মধ্যপথকে এখানে তান্ত্রিক মহাযানীদের মতানুরূপে রূপান্তরিত দেখতে পাচ্ছি — গম্ভীরবেগে প্রবাহিত ভবনদীর একদিকে হল শূন্যতা, অপরদিকে হল করুণা, — শূন্যতা হল জ্ঞানবাদী নিবৃত্তির দিক, করুণা হল কুশলধর্মবাদী প্রবৃত্তির দিক — এর যে-কোন একটি ছেড়ে অপরটিকে আশ্রয় করলেই পরম সত্য থেকে বিচ্যুত হয়ে কাদায় গিয়ে পড়তে হবে — পরস্পরকে পরস্পরের সঙ্গে অদ্বয়ভাবে যুক্ত করে নিতে পারলেই হবে বোধিচিত্ত লাভ। শূন্যতার বা প্রজ্ঞার সঙ্গে করুণা বা উপায়কে যুক্ত করে নিলে প্রজ্ঞা আমাদেরকে আত্মকেন্দ্রিক নিবৃত্তির সংকীর্ণ পথে টেনে নিতে পারবে না ; আবার করুণা বা উপায়ের সঙ্গে শূন্যতা বা প্রজ্ঞাকে যুক্ত করে নিতে পারলে বোধিসত্ত্বের আদর্শে অনুপ্রাণিত কুশলকর্মসমূহও কখনও বন্ধনের কারণ হতে পারে না।

প্রথম চর্যাতেই যেখানে দেখতে পাই, 'কাআ তরুবর পঞ্চ বি ডাল' — তখন আমরা রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান এই পঞ্চস্কন্ধের সমবায়েই যে আমাদের দেহ এবং সেই দেহের মধ্যে যে পুদ্‌গলরূপী একটি অহংপ্রতীতি গড়ে ওঠে এই সত্যের আভাস পাই। সপ্তম চর্যায় বলা হয়েছে —

তে তিনি তে তিনি তিনি হো ভিন্না ।
ভণই কাহ্নু ভবপরিচ্ছিন্না ॥
জে জে আইলা তে তে গেলা ।
অবনাগবণে কাহ্নু বিমন ভইলা ॥

'তাহারা তিন, তাহারা তিন, — তিনই হইল ভিন্ন। কাহ্ন বলে (তাহা ঠিক নয়), সকলই ভব-পরিচ্ছিন্ন। যাহারা যাহারা আসিয়াছে তাহারা তাহারই গিয়াছে — এই আসা যাওয়ায় কাহ্ন বিমন হইল।' আমরা তিন বা বহু বলে যা-কিছু পৃথক-পৃথক দেখছি আসলে সেই সকলের কিছুই পৃথক স্বয়ংসম্পূর্ণ বস্তু নয় — শূন্যতার মধ্যেই আমরা একটা ভববোধ বা অস্তিত্ব-বোধের দ্বারা সকল-কিছু পৃথক করে পরিচ্ছিন্ন করে দেখছি। যা ক্ষণিকে আসে তাই আবার ক্ষণিকে বিনাশশীল — এই আসা-যাওয়ার মধ্যে আসাটাও সত্য নয়, যাওয়াটাও সত্য নয় — এটিই কাহ্নুপাদকে বিমন করে তুলেছে। একটা অনাদি অবিদ্যাজনিত মায়ার স্বপ্নে প্রতিভাত এই ভবজলধি — তার সেই অনিত্য শূন্য,স্বরূপকে বুঝে নিয়েই তাকে হেলায় অতিক্রম করে যেতে হবে — 'তরিত্তা ভব-জলধি জিম করি মাঅ সুইনা।' (১৩) এই সংসার-প্রবাহের স্বরূপ এবং তার ভিতরে নিহিত বিশুদ্ধ বিজ্ঞান-রূপ সত্যের একটি চমৎকার বর্ণনা পাই লুইপাদের একটি পদে —

ভাব ন হোই অভাব ণ জাই ।
অইস সংবোহে কো পতিআই ॥
লুই ভণই বট দুলক্খ বিণাণা ।
তিঅ ধাএ বিলসই উহ লাগে ণা ॥
জাহের বাণচিহ্নরূব ণ জাণী।
সো কইসে আগম-বেএঁ বখাণী ॥
কাহেরে কিস ভণি মই দিবি পিরিচ্ছা।
উদক-চান্দ জিম সাচ ন মিচ্ছা ॥ (চর্যা ২৯)

'ভাবও হয় না অভাবও যায় না, — এইরূপ সংবোধের দ্বারা কে প্রতীতি লাভ করে? লুই বলিতেছে, ওহে, দুর্লক্ষ্য এই বিজ্ঞান — তিনি ধাতুতেই বিলাস করে, কিন্তু কোনও উদ্দেশ্য পাওয়া যায় না। যাহার জানা যায় না কোনও বর্ণচিহ্ন-রূপ, তাহা কিরূপে আগম-বেদে হইবে ব্যাখ্যাত? কাহার সম্বন্ধে কি বলিয়া আমি দিব জিজ্ঞাসার সমাধান — জলের মধ্যে চন্দ্র যেমন সত্যও নয় মিথ্যাও নয়।' এখানে দেখছি কবি মোটামুটিভাবে বিজ্ঞানবাদেরই অনুসরণ করেছেন। ভাব এবং অভাব — অস্তিত্ব এবং নাস্তিত্ব — এর কিছুই সত্যও নয়, মিথ্যাও নয় —সত্য শুধু এক দুর্লক্ষ্য বিজ্ঞান-স্বরূপ — যা সমস্ত অস্তিত্ব-প্রবাহের মধ্যেই বিলাস করছে — কিন্তু অভূত-পরিকল্প বলে তা সম্পূর্ণ 'অবাঙমনসোগোচরম্'। কিন্তু এই পদটির পাশেই আর একটি পদের উদ্ধার করা যেতে পারে — যেখানে শূন্যতাবাদিগণের ন্যায় প্রতীত্যসমুৎপাদ-হেতু প্রতিভাত সংসারের অনুৎপন্নত্ব এবং অনস্তিত্বই নানাভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে — কিন্তু মিথ্যা প্রতিভাস-প্রবাহের পশ্চাতে আর কোনও প্রকারের কোনও সত্যকেই কোনও আভাসে ইঙ্গিতেও স্বীকার করা হয় নি।

আইএ অনুঅনাএ জগ রে ভাংতিএঁ সো পড়িহাই।
রাজসাপ দেখি জো চমকিই সাঁচে কি তা বোড়ো খাই ॥
অকট জোইআরে মা কর হথা লোহা ।
আইস সভাবেঁ জই জগ বুঝবি তুটই বাষনা তোরা ॥
মরুমরীচিগন্ধর্বনঅরী দাপণ-পড়িবিম্বু জইসা ।
বাতাবৰ্ত্তে সো দৃঢ় ভইআ অপে পাথর জইসা ॥

বাঞ্ঝিসুঅ জিম কেলি করই খেলই বহুবিহ খেলা ।
বালুআতেলেঁ সসর সিংগে আকাশ-ফুলিলা ॥
রউতু ভণই কট ভুসুকু ভণই কট সঅলা অইস সহাব ।
জই তো মূঢ়া অচ্ছসি ভান্তী পুচ্ছতু সদ্‌গুরু-পাব ॥ (চর্যা ৪১)

'আদিতেই অনুৎপন্নহেতু এই জগৎ ভ্রান্তি দ্বারাই প্রতিভাত হয় ; রজ্জু-সর্প দেখিয়া যে চমকিত হয় সত্য সত্যই কি তাহাকে বোড়াসাপে খায় ? ওরে অকট (মূর্খ) যোগি ; নিজের হাত লোনা করিও না,— এই স্বভাবে যদি জগৎকে বুঝিতে পার তবে টুটিবে তোমার সকল বাসনা। (এখন এই জগতের স্বরূপ বলা হইতেছে) — মরুর মরীচিকা, গন্ধর্বনগরী, দর্পণ-প্রতিবিম্ব যেমন (মিথ্যা — অর্থাৎ কোনও বস্তুসত্য না থাকাতেও ভ্রান্তি-বশত এবং বাসনাবশত মনে প্রতিভাত), বাতাসের আবর্তে দৃঢ় হইয়া জলের মধ্যে যেমন পাথর (জলস্তম্ভাদি) প্রতিভাত হয় ; বন্ধ্যাসুত যেরূপ কেলি করে — খেলে বহুবিধ খেলা, — যেমন বালুর তেল, শশকের শৃঙ্গ — আকাশের ফুল। রাউত বলিতেছে, ওহে ভুসুকু কহিতেছে,— সকলই হইল এই স্বভাব ; যদি তুমি মূঢ় হইয়া থাক — তবে জিজ্ঞাসা কর নিজের সব ভ্রান্তি — সদ্‌গুরুর পায়ে।' এখানে দেখছি, আমাদের ব্যবহারিক জীবনে যেমন দেখতে পাই, আমাদের বহু বস্তুজ্ঞান আছে — অথচ তাদের পশ্চাতে কোনরূপ বস্তুসত্য থাকাই সম্ভব নয়, সেখানে যেমন চিত্তবিকল্পের দ্বারাই কিছু না থেকেই আমরা অনেক কিছু গড়ে নিই — জগৎ-সংসারের সমগ্র অস্তিত্ব সম্বন্ধেই সেই এক কথা সত্য — এটি অনাদি অবিদ্যাজাত একটা চিত্ত-বিকল্পের প্রতীতিমাত্র — আসলে সবই একটি প্রকাণ্ড নিরধিষ্ঠান ভ্রম। কিন্তু এই পদটির পাশেই আমরা কাহ্নপাদের একটি পদ উদ্ধৃত করতে পারি — যে পদের মধ্যে অভূত-পরিকল্প বিজ্ঞান মহাসুখ-স্বরূপে একটা সর্বব্যাপী শাশ্বত আনন্দ-স্বরূপে দেখা দিয়েছে এবং সেই মহাসুখ-স্বরূপ বিজ্ঞান বেদান্তের আনন্দ-স্বরূপ সর্বব্যাপী ব্রহ্মের সঙ্গে মনের অজ্ঞাতে যুক্ত হয়ে গেছে।

চিঅ সহজে শূণ সংপুন্না ।
কান্ধবিয়োএঁ মা হোহি বিসন্না ॥
ভণ কইসে কাহ্ন নাহি ।
ফরই অনুদিন তৈলোএ পমাই ॥
মূঢ়া দিঠ নাঠ দেখি কাঅর ।
ভাগ তরঙ্গ কি সোষই সাঅর ॥
মূঢ়া অচ্ছন্তে লোঅ ন পেখই ।
দুধ মাঝেঁ লড় অচ্ছন্তে ন দেখই ॥
ভব জাই ণ আবই এথু কোই।
অইস ভাবে বিলসই কাহ্নিল জোই ॥ (চর্যা ৪২)

'চিত্ত সহজের দ্বারা (মহাসুখ-রূপ সহজ-স্বরূপে) শূন্য-সম্পূর্ণ (শূন্য হইয়াই সম্পূর্ণ) ; স্কন্ধবিয়োগে বিষণ্ণ হইও না। বল, কি করিয়া কাহ্নু নাই—? অনুদিন ত্রিলোকে ব্যাপ্ত হইয়া স্ফূর্তি লাভ করিতেছে (মূঢ়গণই দৃষ্টকে নষ্ট দেখিয়া কাতর হয়; তরঙ্গ-ভঙ্গ কি সাগরকে শোষণ করে? আছে যে লোক, মূঢ়েরা তাহাকেও দেখিতে পায় না, দুধের মধ্যে যেমন স্নেহ পদার্থ থাকিলেও দেখিতে পায় না। এখানে কোনও অস্তিত্ব আসেও না যায়ও না, — এই ভাবেই বিলাস করিতেছে কাহ্নিল যোগী।' এখানে দেখছি শূন্যতা ত শূন্যতা নয়, তা পূর্ণতারই নামান্তর।

মৃত্যুতে সব শেষ নয় — মৃত্যু ত স্থূল দেহের অবসান — পঞ্চস্কন্ধের বিয়োগ মাত্র ; এই স্কন্ধ-বিয়োগের পরেও কি থাকে? থাকে আমাদের আনন্দময় সহজ-স্বরূপ ; সেই আনন্দময় সহজ-স্বরূপ আসলে একটা আনন্দময় সর্বব্যাপী শাশ্বত অস্তিত্ব। সেই সর্বব্যাপী আনন্দময় অস্তিত্ব যেন একটি সাগর, প্রতিটি ব্যক্তিজীবন তাতে এক-একটি ঢেউ। ঢেউ-এর ওঠা-পড়ায় যেমন সাগরের কোনও ভাব-অভাব সূচিত হয় না, তেমনই এক আনন্দময় অস্তিত্বের মহাসাগরে অবিদ্যাবিক্ষুব্ধ যে এই ব্যক্তি-জীবনের ঢেউ তার দ্বারা সেই মহাসাগরে কোনরূপ পরিবর্তনই সূচিত হয় না। স্কন্ধ-বিয়োগের পরে যে আমাদের এক অখণ্ড আনন্দস্বরূপের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে তিনলোকব্যাপী আনন্দের বিলাস — স্থূলদৃষ্টিতে ত তাকে দেখবার বোঝবার কোনও সম্ভাবনা নেই, সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন — প্রজ্ঞাসম্পন্ন ব্যক্তিরাই সেই আনন্দময় অস্তিত্বকে অনুভব করতে পারে। এই যে সহজানন্দস্বরূপ শূন্য-স্বরূপ — অনিত্য সংসারের ভিতরে এটিই একমাত্র আপনার বস্তু। তাই সরহপাদ গেয়েছেন —

অদভুঅ ভবমোহরে দিসই পর অপ্পণা ।
এ জগ জলবিম্বাকারে সহজেঁ সুণ অপণা ॥ (চর্যা ৩৯)

অদ্ভুত এই ভবমোহ — তা-ই দেখায় যত পর ও আপন; এই জলবিম্বাকার রূপ-জগতে সহজে প্রতিষ্ঠিত শূন্য-স্বরূপই আত্ম-স্বরূপ — তাই শুধু আপনার।

মতবাদের অন্যান্য অমিল সত্ত্বেও নাগার্জুনের শূন্যবাদ এবং মৈত্রেয়-অসঙ্গ-বসুবন্ধুর বিজ্ঞানবাদের মধ্যে এইখানে ঐকমত্য রয়েছে যে, বস্তু-জগতের যেমন কোনও পারমার্থিক সত্তা নেই, তেমনই মনোধর্ম এবং সেই মনোধর্ম হতে উদ্ভূত আত্মবোধ বা পুদ্‌গল-বোধেরও কোন পরমার্থিক সত্তা নেই। বস্তুর অসারত্বকে সাধারণত ধর্মনৈরাত্ম্য এবং আত্মবোধের অসারত্বকে পুদ্‌গল-নৈরাত্ম্য বলা হয়ে থাকে ; এই উভয়বিধ নৈরাত্ম্যে প্রতিষ্ঠিত থাকাই হল শূন্যতার প্রতিষ্ঠা। এর ভিতরে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বহির্বস্তু সম্বন্ধে এঁদের মত হল যে, বহির্বস্তু সবটাই হল অবিদ্যাক্ষুব্ধ চিত্তচৈতসিকের সৃষ্টি। শূন্যবাদীদের মতে সম্পূর্ণ কিছু না হতেই জগৎ-সংসারের সব কিছু গড়ে নেয় ; অনাদি-অবিদ্যায় ধৃত অনাদি বাসনারই বহিঃপ্রকাশ বিচিত্র বস্তুরূপে। বিজ্ঞানবাদীরা বলবেন, ব্যক্তি-বিজ্ঞানেরই বহিঃপ্রকাশ বস্তুরূপে, আর এই ব্যক্তি-বিজ্ঞান বিধৃত আছে একটি সমষ্টি-বিজ্ঞানে — বিজ্ঞানবাদীরা এর নাম দিয়েছেন আলয়-বিজ্ঞান। বিজ্ঞানই অবিদ্যা দ্বারা বিক্ষুব্ধ হয়ে একদিকে চিত্ত-চৈতসিকরূপে নিজেকে ছড়িয়ে দেয় — আর এই চঞ্চল চিত্তবৃত্তিই আবার কাল-জ্ঞান এবং দেশ-জ্ঞান সৃষ্টি করে বস্তুজ্ঞান সম্ভব করে তোলে। এইজন্যই লুইপাদ বলেছেন, — 'চঞ্চল চীঅ পইঠা কাল'। কালজ্ঞান আমাদের সকল বস্তুজ্ঞানের মূলে — সব বস্তুর অস্তিত্বই ত কালে, কালের বোধ না থাকলে বস্তু সম্বন্ধে বোধ সম্ভব হবে কিরূপে? সকল প্রকার অস্তিত্ববোধের মূলীভূত যে কাল তা ত কোনও বহির্বস্তু নয় — চিত্তের চাঞ্চল্যের জন্য চিত্তবৃত্তির মধ্যে যে সন্ততি-বোধ তাই কালবোধকে সম্ভব করে তোলে, — সুতরাং কাল হল সম্পূর্ণই চৈত্তিক বা চৈতসিক। অবিদ্যাজনিত বাসনাবিক্ষোভ নিরুদ্ধ হলেই চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হয়, চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হলেই কাল নিরুদ্ধ হয় — কাল নিরুদ্ধ হলেই বস্তুজ্ঞান নিরুদ্ধ হয় এবং ধর্মনৈরাত্ম্য এবং পুদ্‌গল-নৈরাত্ম্যে প্রতিষ্ঠিত থাকা — অর্থাৎ শূন্যতায় প্রতিষ্ঠিত থাকা সম্ভব হয়।

বৌদ্ধ দর্শনের এই চিত্ত-প্রাধান্যবাদের (Idealism) দ্বারা চর্যাকারগণ গভীরভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছেন এবং নানা রূপকের সাহায্যে সংসারে চিত্তের খেলা এবং চিত্ত-নিরোধের প্রয়োজন ও

পন্থা ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করেছেন। একটি পদে স্পষ্টই বলা হয়েছে যে, চিত্তের জাল বিস্তার করে করে আমরা বস্তুজাল রচনা করছি — এবং এই চিত্তজাল এবং তদ্-রচিত বস্তুজালের মধ্যে নিজেরাই নিজেদের বন্ধনগ্রস্ত করে তুলছি। ভব ও নির্বাণ — অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব — এর দুটিই আমরা আমাদের মনের দ্বারা সৃষ্টি করে নিই। আসলে জন্মও মিথ্যা — মৃত্যুও মিথ্যা— তত্ত্বজ্ঞানীর নিকটে জন্ম এবং মৃত্যু এই উভয়ের মধ্যে কোনও রকমেরই কোনও পার্থক্য বোধ হয় না, — কারণ দুই মিথ্যার মধ্যে আবার পার্থক্য-বোধের সম্ভাবনা কোথায়? যারা জন্মকে সত্য বলে গ্রহণ করে তারাই মৃত্যুর চিন্তায় ভীত হয়; জন্মকেই যদি আদিতে ভ্রান্তি বলে প্রত্যয় জন্মায় তবে আর মৃত্যুভয় কোথায় — এবং মৃত্যুর হাত হতে নিষ্কৃতি পাবার জন্য চেষ্টাদির প্রয়োজন কি? কেউ বলেন কর্মের দ্বারা জন্ম হয়, কেউ বলেন জন্মের দ্বারা কর্ম হয় — চর্যাকারগণ বলবেন, জন্ম ও কর্ম উভয়ই বাসনা-বিক্ষোভজনিত ভ্রান্তিরই বিলাপ।

এই তত্ত্বটিই প্রকাশ পেয়েছে সরহপাদের একটি সুন্দর পদে —

অপণে রচি রচি ভবনির্বাণা।
মিছেঁ লোঅ বন্ধাবএ অপণা ॥
অম্হে ণ জাণহুঁ অচিন্ত জোই।
জাম মরণ ভব কইসণ হোই ॥
জইসে জাম মরণ বি তইসো।
জীবন্তে মইলেঁ নাহি বিশেসো ॥
* * *
জামে কাম কি কামে জাম।
সরহ ভণতি অচিন্ত সো ধাম ॥ (চর্যা ২২)

'আপনি রচিয়া রচিয়া ভব-নির্বাণ মিথ্যাই লোক নিজেকে বাঁধায়। অচিন্ত্যযোগী আমরা জানি না কি করিয়া জন্ম মরণ ও ভব (অস্তিত্ব) হয়। যেরূপ জন্ম, মরণও সেইরূপ; জীবন্তে ও মৃতাবস্থায় নাহি কোনও বিশেষ। ....জন্মে কর্ম কি কর্মে জন্ম — সরহ বলে, অচিন্ত্য সেই ধাম।'

এই চিত্তের দুইটি রূপ আছে। একটি হল সর্ববিধ দোষগ্রস্ত অপরিশুদ্ধ রূপ — এই মায়াবচ্ছিন্ন যে অপরিশুদ্ধ বিজ্ঞান তাই হল বদ্ধজীব। চিত্ত যেখানে বিশুদ্ধবিজ্ঞান সেখানে সে প্রজ্ঞালোকে দীপ্ত — সেখানে সে 'প্রকৃতি-প্রভাস্বর' — অর্থাৎ প্রকৃতিতেই জ্যোতিঃস্বরূপ। এই প্রকৃতি-প্রভাস্বর বিশুদ্ধ বিজ্ঞানই আমাদের আনন্দময় সহজস্বরূপ — তাই সহজানন্দদায়িনী বা মহাসুখদায়িনী শূন্যতা। চিত্তের এই দুই অবস্থার কথা স্নিগ্ধ করুণরসের পরিবেশনের সঙ্গে প্রকাশ করেছেন ভুসুকুপাদ তাঁর একটি প্রসিদ্ধ পদে (চর্যা ৬)। নিজেকে ভুসুকুপাদ এখানে কল্পনা করেছেন একটি অবোধ হরিণের সঙ্গে — যে আশ-পাশের কোন খবর না রেখে আনন্দে বিহার করে বনভূমিতে। সহসা একদিন সে সচেতন হয়ে ওঠে চারিদিকে বেড়ে-ধরা হাঁক-ডাক-দেওয়া ব্যাধের সম্বন্ধে; বুঝতে পারে, সে নিজের চারিদিকে নিজেই যেন ডেকে এনেছে কত বৈরী। তখন আসে তার বৈরাগ্য — অন্তশ্চিন্তন — ছোঁয় না সে আর তৃণ — পান করে না জল — মনে পড়ে যায় তার আপনজন হরিণীকে — সুপরিশুদ্ধা প্রকৃতি-প্রভাস্বরা মহাসুখরূপা শূন্যতারূপিণীকে — তার সহজ স্বরূপকে। তখন চলতে থাকে চিত্তশুদ্ধির সাধনা — সেই সাধনার ফলে একদিন এসে দেখা দেয় হরিণী — নিজের মধ্যেই অনুভূত হয় সেই সহজ-স্বরূপ — প্রকৃতি-প্রভাস্বরা শূন্যতা, — সে

বলে এই সংসার-অরণ্য ছেড়ে চলে যেতে। সেই প্রজ্ঞার আহ্বানে সাড়া দেয় বদ্ধজীব হরিণ — তীব্র গতিতে চলে তার ঊর্ধ্বায়ন — আর খুঁজে পাওয়া যায় না তার সন্ধান।

ভুসুকুপাদেরই অন্য একটি পদে এই চঞ্চল চিত্তকে উপমিত করা হয়েছে একটি চঞ্চল মূষিকের সঙ্গে। —

নিসি অন্ধারী মুসা আচারা ।
অমিঅ-ভখঅ মুসা করঅ অহারা ॥
মাররে জোইআ মুসা-পবণা।
জেণ তুটঅ অবণা-গবণা ॥
ভব বিন্দারঅ মুসা খণঅ গাতি।
চঞ্চল মুসা কলিআঁ নাশক থাতী ॥
কাল মুসা উহ ণ বাণ ।
গঅণে উঠি করঅ অমিঅ পাণ ॥
তাব সে মুসা উঞ্চল-পাঞ্চল।
সদ্‌গুরু-বোহে করহ সো নিচ্চল ॥
জবেঁ মুসাএর আচার তুটঅ।
ভুসুকু ভণঅ তবেঁ বান্ধন ফিটঅ ॥ (চর্যা ২১)

'নিশি অন্ধকার — মূষিকের চরণ (আনাগোনা, সক্রিয়তা) ; অমৃত ভক্ষণ করে মূষিক— করে (সব) আহার। হে যোগি, মার এই মূষিক-পবনকে, — যাহাতে টুটিয়া যাইবে আসা-যাওয়া। ভব-বিদারক মূষিক — খনন করে গর্ত ; চঞ্চল মূষিককে ভাল করিয়া বুঝিয়া (যোগিগণ) তাহার নাশক হইয়া থাকে। কাল মূষিক — উদ্দেশও নাই বর্ণও নাই ; গগনে উঠিয়া করে অমৃত পান। সেই পর্যন্ত থাকে মূষিক উঁচল-পাঁচল, সদ্‌গুরুর বোধের দ্বারা (উপদেশ দ্বারা) তাহাকে কর নিশ্চল। যখন মূষিকের আচার (আচরণ, সক্রিয়তা) টোটে, ভুসুকু বলে, তবে বন্ধন খসিয়া যায়।' চঞ্চল মূষিকের আনাগোনা রাত্রির অন্ধকারে। এই চঞ্চলচিত্ত নষ্ট করে দেয় দেহাগারে অবস্থিত সকল অমৃত। পবনই হল চিত্তমূষিক — কারণ যোগমতে শ্বাস-প্রশ্বাস বায়ুই হল চিত্তের বাহন। বায়ু-স্থৈর্য দ্বারাই চিত্তস্থৈর্য — চিত্তস্থৈর্য দ্বারাই ভবচক্রের নিরোধ। চঞ্চল চিত্ত-মূষিকই হল ভব-বিস্তারক (বিদারক কথাটি এখানে বিস্তারক অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে বলে মনে হয়) — সকল অস্তিত্বজ্ঞানের প্রসারক — এটিই খনন করে আমাদের পতনের জন্য যত গর্ত। কিন্তু যখন একে গগনাভিমুখে অর্থাৎ শূন্যতাভিমুখে ঊর্ধ্বে তোলা যায় — তখন মহাসুখ- কমলে এই মূষিক পান করে বোধিচিত্তরূপ চন্দ্র হতে ক্ষরিত অমৃত — তখন চঞ্চল মূষিকই দেখা দেয় স্থির এবং প্রকৃতি-প্রভাস্বররূপে।

অপর একটি পদে মনকে উপমিত করা হয়েছে একটি ক্রম-বর্ধিষ্ণু বৃক্ষের সঙ্গে (চর্যা ৪৫)। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ই হল এই মনতরুর পাঁচটি শাখা — আর বহুল আশাই হল পত্রফলবাহক। মূলে নিত্য জলসিঞ্চিত হলে যেমন তরু বেড়ে ওঠে — শুভাশুভের কল্পনা দ্বারাই তেমনই মন-তরু রসসঞ্চয় করে ওঠে। এই মনতরুকে ছেদনই হল সাধকের বড় কাজ । সদ্‌গুরুর নিকট থেকে উপদেশ নিয়ে পরিপূর্ণ প্রজ্ঞা রূপ কুঠারের দ্বারা — (অর্থাৎ চিত্তের বিশুদ্ধ প্রভাস্বর স্বরূপের দ্বারাই) এই মনতরুকে মূল-ডালসহ কেটে ফেলতে হয় — অর্থাৎ মনকে নির্বীজভাবে নিরুদ্ধ করতে হয়।

জয়নন্দীপাদ তাঁর একটি পদেও চিত্তের এই দুই অবস্থার একটি চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন।

পেখু সুঅণে অদশ জইসা।
অন্তরালে মোহ তইসা ॥
মোহবিমুক্কা জই মণা।
তবেঁ তুটই অবণাগমণা ॥
নউ দাঢ়ই নউ তিমই ন চ্ছিজই।
পেখ লোঅ মোহে বলি বলি বাঝই ॥
ছাঅ মাআ কাঅ সমাণা।
বেণি পাখেঁ সোই বিণাণা ॥
চিঅ তথতা-স্বভাবে ষোহঅ ।
ভণই জঅনন্দি ফুড়অ ণ হোই ॥ (চর্যা ৪৬)

'দেখ, স্বপ্নে আদর্শে (আয়নায়) যেরূপ, অন্তরালে মোহ সেইরূপ। মোহবিমুক্ত যদি মন, তবে টুটে আসা-যাওয়া। (তখন মোহশূন্য প্রভাস্বর চিত্ত) দগ্ধ হয় না, ভেজে না, ছিন্ন হয় না, — (তথাপি) দেখ, লোক মোহে দৃঢ়ভাবে বদ্ধ হয় । ছায়া মায়া কায়া সমান — দুই পক্ষে সেই বিজ্ঞান। চিত্ত তথতা-স্বভাবে শোভা পায় — জয়নন্দী বলে, তখন সবই স্ফুট (পরিষ্কার) — অন্য কিছু নাই।'

মনের ভিতরে যে মোহ থাকে তার কাজ কি? স্বপ্নে যেমন কিছু ঘটছে না — তবু অনেক কিছু ঘটছে দেখা যায়, আয়নার মধ্যে যেমন কিছু নেই — তথাপি অনেক কিছু দেখা যায়, তেমনই মনের মোহ মিথ্যার মধ্যেই জগৎ-ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করে নেয়। এই যে মোহগ্রস্ত মন তাই হল অপরিশুদ্ধ চিত্ত — এই চিত্ত মোহবিমুক্ত হয়ে পরিশুদ্ধ হলেই ভব-চক্র থেমে যায় — আসা-যাওয়ার প্রবাহ নিরুদ্ধ হয়। তখনকার সেই মোহহীন পরিশুদ্ধ যে প্রভাস্বর চিত্ত তা বিশুদ্ধ বিজ্ঞান-স্বরূপ — তা সর্বগত অদ্বয় বিজ্ঞানেরই বিশেষ প্রকাশ — তা অদাহ্য, অক্লেদ্য, অচ্ছেদ্য। বিজ্ঞানের মধ্যে যেখানে গ্রাহ্যত্ব এবং গ্রাহকত্ব বা জ্ঞেয়ত্ব এবং জ্ঞাতৃত্বরূপ দ্বৈতত্ব — সেখানেই একই বিজ্ঞান হতে কত ছায়া-মায়া-কায়ার উৎপত্তি। কিন্তু চিত্ত যেখানে তথতা-স্বভাবে বা বিশুদ্ধ অদ্বয় স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় সেখানে শুধু প্রভাস্বর চিত্তেরই প্রকাশ — আর কোথাও কিছু নেই। এই প্রভাস্বর চিত্তই হল মহাসুখময় সহজ-স্বরূপ।

ধ্যান-বিচার ও যোগসাধনার সাহায্যে সাধকগণ এই অবিদ্যা-বিত্তকে যে কি করে বিনাশ করতেন অনেক পদের মধ্যে তার আভাস রয়েছে। শান্তিপাদ তাঁর একটি পদে বলেছেন, —

তুলা ধুণি ধুণি আঁসুরে আঁসু ।
আঁসু ধুণি ধুণি নিরবর সেসু ॥
তউসে হেরুঅ ন পাবিঅই।
শান্তি ভণই কিণ স ভাবিঅই ॥
তুলা ধুণি ধুণি সুণে অহারিউ।
পুণ লইআঁ অপণা চটারিউ ॥ (চর্যা ২৬)

'তুলা ধুনিয়া আঁশ আঁশ করিলাম, আঁশ ধুনিয়া ধুনিয়া নিরবয়ব শেষ। তথাপি হেতুরূপ

পাওয়া গেল না, শাস্তি বলে, কেন আর ভাবা হইতেছে ! তুলা ধুনিয়া ধুনিয়া শূন্যে গ্রহণ করিলাম — শূন্যকে লইয়া নিজেকেও উৎপাটিত করিলাম।' এখানে তুলা হল চিত্ত তুলা — তাকে বিশ্লেষণ করে-করে শেষ করে দেখলেও তার ভিতরে বস্তুনির্মাণের জগৎ প্রতিভাসের হেতুরূপ যা তা আর বোঝা গেল না। আসলে এই হেতুরূপটি চিত্তের স্বধর্ম নয়, এটি অবিদ্যাশ্রিত আগন্তুক ধর্ম। তাই চিত্তকে বিচার-বিশ্লেষণ — ধ্যান-ধারণার ভিতর দিয়ে যখন বিশুদ্ধ করে নেওয়া হয় — তখন বোঝা যায়, ভাব্য-ভাবক সবই মিথ্যা। চিত্তকে ধুনে-ধুনে তাকে দিতে হয় শূন্যে বিলীন করে — চিত্ত শূন্যে বিলীন হলেই সব অহং-প্রত্যয়ও নিঃশেষে বিলীন হয়ে যায় — শুধু একটা স্বসংবেদ্য মহাসুখ-স্বরূপতা ব্যতীত তখন আর অন্য-কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।

এই চিত্ত-বিনাশ সম্বন্ধে ভাদেপাদ বলেছেন,

এতকাল হাঁউ আছ্‌ছিলোঁ স্বমোহেঁ ।
এবেঁ মই বুঝিল সদ্‌গুরুবোহেঁ ॥
এবেঁ চিঅরাঅ মকুঁ ণঠা।
গঅণসমুদে টলিআ পইঠা ॥
পেখমি দহদিহ্‌ সব্‌বই শূন।
চিঅ বিহুন্নে পাপ ন পুন্ন ॥
বাজুলে দিল মো লক্‌খ ভণিআ।
মই অহারিল গঅণত পসিয়া ॥
ভাদে ভণই অভাগে লইআ ।
চিঅরাঅ মই অহার কএলা ॥ (চর্যা ৩৫)

'এতকাল আমি ছিলাম স্বমোহে, এখন আমি (সব) বুঝিলাম সদ্‌গুরুর বোধে। এখন আমার (অবিদ্যাক্লিষ্ট) চিত্তরাজ নষ্ট (নিঃস্বভাবীকৃত) হইয়া গিয়াছে — গগন-সমুদ্রে টলিয়া প্রবিষ্ট হইয়াছে। (এখন) দেখিতেছি দশদিক্‌ সবই শূন্য, চিত্ত-বিহনে পাপও নাই, পুণ্যও নাই। বজ্রগুরু আমাকে লক্ষ্য বলিয়া দিয়াছেন, আমি আহার করিয়াছি (নিঃস্বভাবীকৃত করিয়াছি) গগনে প্রবেশ করিয়া। ভাদে বলে, অভাগকে (যাহার আর ভাগ হয় না — অদ্বয় সত্যকে) লইয়া চিত্তরাজকে আমি আহার করিয়াছি।' এখানে গগন সমুদ্র হল শূন্যতারূপ পরমপ্রজ্ঞা, চন্দ্র যেমন সমুদ্রে টলে পড়লে সব অন্ধকার হয়ে যায় — সঙ্গে সঙ্গে বস্তুবোধও সব নিরস্ত হয়ে যায় — চিত্ত-চন্দ্র শূন্যতা-সমুদ্রে ডুবে গেলেও সেইরূপ সকল বিষয়বোধ নিরস্ত হয়ে যায় — সাধক এক অদ্বয়বোধেই প্রতিষ্ঠিত থাকেন। এ বিষয়ে আর্যদেবপাদও বলেছেন, —

জহি মণ ইন্দিঅ-পবণ হো ণঠা।
ণ জানমি অপা কহিঁ গই পইঠা ॥

... ...

চান্দরে চান্দকান্তি জিম পতিভাসঅ ।
চিঅ বিকরণে তহিঁ টলি পইসই ॥ (চর্যা ৩১)

'যেখানে মন ইন্দ্রিয় পবন হয় নষ্ট, (তখন) আমি জানি না নিজে কোথায় গিয়া প্রবিষ্ট হই।... চন্দ্র চন্দ্রকান্তিকে যেমন প্রতিভাসিত করে, — চিত্ত-বিকরণে (নিঃস্বভাবীকরণে) তাহার মধ্যেই (সব) টলিয়া প্রবেশ করে।' অর্থাৎ চন্দ্র না থাকলে যেমন চন্দ্রকান্তি বাহ্যজগৎকে

প্রতিভাত করে তুলতে পারে না, তেমনই চিত্ত না থাকলে চৈতসিক বিকল্পাদিও আর বস্তুজগৎকে সম্ভব করে তুলতে পারে না।

মনে রাখতে হবে, অবিদ্যা-চিত্তকে বিনাশ করার অর্থই হল তাকে প্রকৃতি-প্রভাস্বর করে তোলা। মহাসুখের অনুভূতিতে মত্ত সাধকের প্রভাস্বর চিত্তকে অনেক সময় মদমত্ত হস্তীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। কাহ্নুপাদের একটি পদে বলা হয়েছে, একটি মদমত্ত হস্তী যেমন তাকে যে-সকল খামের সহিত বেঁধে রাখা হয়, যে-সকল বন্ধনে তাকে বেঁধে রাখা হয়, সব ভেঙে ছিঁড়ে পদ্ম-বনে গিয়ে প্রবেশ করে এবং স্বচ্ছন্দে বিলাস করে, তাঁর মহাসুখরূপ-আসবে মত্ত প্রভাস্বর-চিত্তও তেমনই গ্রাহ্য-গ্রাহকত্বের দুই খাম মর্দিত করে, বিবিধ ব্যাপক বন্ধন ছিঁড়ে ফেলে, সহজ-নলিনী-বনে প্রবেশ করে বিলাস করছে।

এবংকার দৃঢ় বাখোড় মোড়িউ।
বিবিহ বিআপক বান্ধণ তোড়িউ ॥
কাহ্নু বিলসঅ আসবমাতা।
সহজ নলিনীবন পইসি নিবিতা ॥ (চর্যা ৯)

চিত্তগজেন্দ্রের এই অবস্থার বর্ণনায় মহীধরপাদ বলেছেন,

মাতেল চীঅ-গএন্দা ধাবই।
নিরন্তর গঅণন্ত তুসেঁ ঘোলই ॥
পাপ পুন্ন বেণি তোড়িঅ সিকল মোড়িঅ খম্ভাঠাণা।
গঅণ-টাকলি লাগি রে চিত্ত পইঠ নিবাণা
মহারসপানে মাতেল রে তিহুঅন সএল উএখী।
পঞ্চ-বিসঅ-নায়ক রে বিপখ কোবি ন দেখি ॥
খররবি-কিরণ সন্তাপেঁ রে গঅণাঙ্গণ গই পইঠা।
ভণন্তি মহিত্তা মই এথু বুড়ন্তে কিম্পি ন দিঠা ॥ (চর্যা ১৬)

'মত্ত আমার চিত্ত-গজেন্দ্র ধাবিত হইতেছে—নিরন্তর গগনে (শূন্যতা-বোধে) সর্বপ্রকার দ্বৈতত্বকে ঘোলাইয়া দিতেছে। পাপ-পুণ্যের দুই শিকল ছিঁড়িয়া, স্তম্ভস্থানকে মর্দিত করিয়া গগন-শিখরে (শূন্যতার শেষ স্তরে) পৌঁছিয়া চিত্ত নির্বাণে প্রবিষ্ট হইল। ত্রিভুবনের সকল কিছু উপেক্ষা করিয়া সে মহারসপানে মাতিল,—(এখন সে) পঞ্চ-বিষয়ের নায়ক — তাহার পক্ষে কাহাকেও দেখি না। (মহাসুখানুভূতিরূপ) খররবি সন্তাপে সে গগনাঙ্গনে (শূন্যতায়) গিয়া পৌঁছিয়াছে। মহীধরপাদ বলিতেছেন, আমি যখন ইহার মধ্যে ডুবিয়া যাই তখন আর কিছুই দেখিতে পাই না।'

এই যে সর্বসংকল্প-বিকল্প বর্জিত প্রভাস্বর চিত্ত এটিই প্রজ্ঞাস্বরূপ, এটিই শূন্যতা, এবং শূন্যতাই হল সাধক-জীবনের 'সোনা' — আর অবিদ্যাচিত্তজাত যে রূপ-জগৎ তাই রূপা। তাই কম্বলাম্বরপাদ চমৎকার করে বলেছেন একটি পদে —

সোনে ভরিতী করুণা নাবী।
রূপা থোই নাহিক ঠাবী ॥ (চর্যা ৮)

'শূন্যতারূপ সোনা-দ্বারা ভরিয়া লইয়াছি আমার করুণার নৌকা, 'রূপে'র রূপা রাখিব এমন আর ঠাঁই নাই।'

আমরা বৌদ্ধতন্ত্রের মধ্যে একটি চতুঃশূন্যের মতবাদ দেখতে পাই, নাগার্জুন পাদের নামে

প্রচলিত 'পঞ্চক্রম' নামক তান্ত্রিক গ্রন্থে এ-সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা দেখতে পাই। এই চতুঃশূন্য হল শূন্যতারূপ প্রজ্ঞার স্তরভেদ নিয়ে চিত্তেরই চারটি স্তরভেদ। প্রথম স্তর হল শূন্য — এই স্তরে চিত্ত প্রজ্ঞা বা আলোকোন্মুখী বটে, কিন্তু এই স্তরেও চিত্তের সঙ্গে অবিশুদ্ধির কারণ-স্বরূপ শোক, ভয়, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, বেদনা, সমবেদনা, প্রত্যবেক্ষা, কারুণ্য প্রভৃতি তেত্রিশ প্রকারের প্রকৃতি-দোষ জড়িত থাকে। দ্বিতীয় স্তর হল অতিশূন্য — এটি প্রথম স্তর থেকেই উদ্ভূত হয় ; এর সঙ্গে কাম, সন্তোষ, সুখ, বিস্ময়, ধৈর্য, গর্ব প্রভৃতি চল্লিশটি প্রকৃতিদোষ যুক্ত থাকে। তৃতীয় স্তর হল মহাশূন্য — এটি অপর দুই শূন্য হতে বিশুদ্ধতর এবং উর্ধ্বে হলেও এর সঙ্গে বিস্মৃতি, ভ্রান্তি, আলস্য প্রভৃতি সাতটি প্রকৃতিদোষ যুক্ত থাকে। এই প্রকৃতি-দোষসকল আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে দিনরাত্রই প্রবাহিত হতে থাকে। চতুর্থ স্তর হল সর্বশূন্য — এটি সর্বপ্রকারের প্রকৃতিদোষ-রহিত এবং এটি প্রকৃতি-প্রভাস্বর অর্থাৎ আত্মপ্রকৃতি বা আত্ম-স্বরূপেই প্রভাস্বর। এটি হল পরম বিশুদ্ধ, পরম সত্য — পরম বিজ্ঞান। এটি আদি বা অনাদি নয়, মধ্য বা অমধ্য নয় — অন্ত বা অনন্ত নয় ; এটি অস্তিনাস্তি, পাপ-পুণ্য-প্রভৃতি সকলের উর্ধ্বে।

বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণের দোহা এবং চর্যাগীতির মধ্যে এই চারিশূন্যের তত্ত্ব নানাভাবে গৃহীত এবং ব্যাখ্যাত হয়েছে। কাহ্নপাদ একটি দোহায় বলেছেন — 'পত্ত চউটঠ্ চউ-মূণাল চিঅ মহাসুহ বাসে' — মহা-সুখের আবাসে চারটি পত্র এবং চারিটি মৃণাল রয়েছে। এই চারটি পত্র হল পূর্ব-ব্যাখ্যাত চতুঃশূন্য। চর্যাপদের মধ্যে ঢেণ্ঢণপাদের একটি পদ রয়েছে, —

টালত মোর ঘর নাহি পড়িবেষী।
হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী ॥
... ...
বলদ বিআঅল গবিআ বাঁঝে ।
পিটা দুহিএ এ তিনা সাঁঝে ॥ (চর্যা ৩৩)

'উঁচুতে (টিলাতে) আমার ঘর, নাই কোনও প্রতিবেশী ; হাঁড়িতে ভাত নাই, নিত্য আসে।...বলদ বিয়াইল, গাভী বন্ধ্যা ; পিঠ দোহা হয় এ তিন সন্ধ্যা।' চর্যাপদের মুনিদত্ত-কৃত যে টীকা রয়েছে তা অবলম্বনে ব্যাখ্যা করলে, এখানে হাঁড়ির ভাত হল পূর্বোক্ত প্রকৃতিদোষ সমূহ। এই প্রকৃতি-দোষ সব চলে গেলে উষ্ণীষকমলে বা মহাসুখচক্রে (উঁচু টিলায়) সাধকের বাস হয় এবং চন্দ্র-সূর্যরূপ প্রতিবেশী (গ্রাহ্য-গ্রাহকত্বরূপ দ্বৈতত্ব) চলে যায়। ত্রিবিধ প্রকৃতিদোষ (ভাসত্রয়) যুক্ত যে-চিত্ত তাই হল 'বলদ' — তাই বিয়ায় — অর্থাৎ জগৎ-প্রপঞ্চের পরিকল্পনা করে, চতুর্থশূন্য বা সর্বশূন্যরূপ যে গাভী তাই হল বন্ধ্যা — সেখানে আর কোনও ভব-বিকল্পের সম্ভাবনা নেই। যোগী সর্বদাই তাই 'পীঠ' বা এই ত্রিবিধ প্রকৃতিদোষকে দোহন করবার চেষ্টা করেন। দারিকপাদ একটি পদে বলেছেন, — 'বিলসই দারিক গঅণত পারিমকুলেঁ' — 'দারিক গগনের অপরকূলে বিলাস করিতেছেন'। এখানে গগন অর্থ শূন্য, গগনের অপরকূলে অর্থ হল প্রকৃতিদোষযুক্ত ত্রিশূন্যের অপরকূলে — অর্থাৎ সর্বশূন্যরূপ প্রভাস্বর মহাসুখে। কাহ্নপাদ একটি পদে বলেছেন, —

সুণ বাহ তথতা পহারী।
মোহ ভণ্ডার লই সঅলা অহারী ॥
ঘুমই ণ চেবই সপরবিভাগা।
সহজ নিদালু কাহ্নিলা লাঙ্গা ॥

চেঅণ ন বেঅন ভব নিদ গেলা।
সঅল সুফল করি সুহে সুতেলা ॥ (চর্যা ৩৬)

'শূন্যবাহুতে তথতা প্রহার করিয়া মোহ-ভাণ্ডার লইলাম সকলই আহার করিয়া (নিঃশেষে হরণ করিয়া)। (এখন) ঘুমায় না, জাগেও না, আত্মপর-বিভাগও নাই ; সহজে নিদ্রালু "লাঙ্গা যোগী" কাহ্ন। চেতনাও নাই — বেদনাও নাই — গভীরে নিদ্রা গেল ; সকল সুফল করিয়া সুখে শুইল।' এখানে দেখছি, 'শূন্যের নিকটেই আছে মোহভাণ্ডার, সেই মোহভাণ্ডারকে লুঠ করিয়া লইতে প্রথমে তাই শূন্যের বাহুতেই কঠিন আঘাত করিতে হইল।' এই শূন্য হল পূর্ববর্ণিত প্রথম তিন শূন্য, আর এই তিন শূন্যের আশ্রিত প্রকৃতি-দোষই হল মোহভাণ্ডার। সর্বশূন্যরূপ চতুর্থ শূন্য হল তথতা ; এই 'তথতা'ই হল পারমার্থিক অদ্বয় সত্তা — সেই 'তথতা' বা পরমবিশুদ্ধ চতুর্থ শূন্যের দ্বারা প্রথম শূন্যকে আঘাত করে তাদের ঘায়েল করতে পারলেই সব প্রকৃতিদোষ চলে যায়। প্রকৃতিদোষ নিঃশেষে চলে গেলে সাধকের যে অবস্থা হয় কাহ্নপাদ পরবর্তী পদগুলিতে তারই বর্ণনা করেছেন। কাহ্নপাদ আর একটি পদে দাবাখেলার রূপকে সাধনার বর্ণনা করেছেন । সেখানে বলেছেন, —

ফীটউ দুআ মাদেসিঁ রে ঠাকুর।
উআরি উএসেঁ কাহ্ন নিঅড় জিনউর ॥
পহিলেঁ তোড়িআ বড়িআ মারিউ।
গঅবরেঁ তোড়িআ পাঞ্চজনা ঘালিউ ॥ (চর্যা ১২)

'দুই স্ফীটিত — নিঃস্বভাবীকৃত হইল, ঠাকুরও মৃত হইলে ; উপকারিক (গুরু) উপদেশে কাহ্ন (দেখিল) নিকটেই জিনপুর। প্রথমে তোড়িয়া বড়িকাকে মারিলাম, গজবরকে তোড়িয়া পাঁচজনকে ঘায়েল করিলাম ।' এখানে প্রথমে যে 'দুই'য়ের কথা বলা হয়েছে তা হল 'শূন্য' ও 'অতিশূন্য'-রূপ প্রকৃতি-দোষযুক্ত আভাস-দ্বয় ; 'ঠাকুর' হল তৃতীয়-শূন্যরূপ অবিদ্যাচিত্ত ; এই তিনশূন্যই ক্রমে বিনষ্ট হলে উপকারিক গুরুর উপদেশে নিকটেই দেখা দেয় মহাসুখময় পরমধাম । দ্বিতীয় পংক্তিতে যে বড়িকার ('বড়ে') কথা বলা হয়েছে, টীকায় এই বড়িকার অর্থ করা হয়েছে 'ষষ্ঠ্যুত্তরশত প্রকৃতিদোষ' । আমরা দেখেছি, প্রথম শূন্যের সঙ্গে তেত্রিশ প্রকারের প্রকৃতিদোষ থাকে, দ্বিতীয় অতিশূন্যের সঙ্গে থাকে চল্লিশটি প্রকৃতিদোষ, আর তৃতীয় মহাশূন্যের সঙ্গে থাকে সাতটি ; এই মোট আশীটি ; এগুলি আবার দিন ও রাত্রি ভেদে দ্বিগুণ—তাই প্রকৃতিদোষের মোট সংখ্যা হল একশত ষাটটি। এগুলি নিঃশেষে বিনষ্ট হলে তখন বাকি থাকে যে গজবর সেটিই হল সর্বশূন্যরূপে তথতাচিত্ত, পঞ্চস্কন্ধাত্মক পঞ্চবিষয়ে জেগে ওঠে যে অহংকার-মমাকারাদি প্রত্যয় সেই তথতা-চিত্তকে দিয়েই তাকেও দূর করে সহজ-স্বরূপ সাক্ষাৎকার হয়। শবরপাদের একটি পদে দেখি, —

গঅণত গঅণত তইলা বাড়ী হেঞ্চে কুরাড়ী ।
কণ্ঠে নৈরামণি বালি জাগন্তে উপাড়ী ॥

... ...

তইলা বাড়ির পাসেঁর জোহ্না বাড়ী উএলা ।
ফিটেলি অন্ধারি রে আকাশ ফুলিআ ॥ (চর্যা ৫০)

'গগনে গগনে তল্লগ্ন বাড়ি, কুঠারের দ্বারা তাহাকে ছিন্ন করা হইল, কণ্ঠে নৈরামণি বালিকা জাগিয়া উঠিলে হয় গৃহীত । ...তল্লগ্ন বাড়ীর পাশে জ্যোৎস্না বাড়ী উদিত হইল,

আকাশের কুসুমের মতন অন্ধকার গেল দূর হইয়া ।' এখানে প্রথম গগন হল শূন্য, দ্বিতীয় গগন অতিশূন্য — এবং তল্লগ্ন বাড়ী হল তৃতীয় মহাশূন্য ; এই তিনকেই তথতা-চিত্ত রূপ চতুর্থশূন্যের কুঠার দ্বারা বিনষ্ট করতে হবে, তা হলেই সহজানন্দরূপিণী নৈরামণি (নৈরাত্মা) কণ্ঠে অর্থাৎ সম্ভোগচক্রে জাগ্রত হয়, — অর্থাৎ তখন এই সহজানন্দের অনুভূতি সাধকের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে। তল্লগ্ন বাড়ি — অর্থাৎ তৃতীয় মহাশূন্যের পাশের বাড়ীই হল জ্যোৎস্না বাড়ী — অর্থাৎ প্রভাস্বরধাম ; এই প্রভাস্বর ধামের প্রকাশের দ্বারা অলীক যত অন্ধকার চারিদিকে পুঞ্জীভূত হয় তা সবই মুহূর্তে দূরীভূত হয়ে গেল।

এই চর্যাকারগণ সকলেই সহজিয়া বৌদ্ধ ছিলেন। আমরা পূর্বেই বলেছি, সহজিয়া বৌদ্ধধর্ম মহাযান হতে উদ্ভূত ; এইজন্য মহাযান বৌদ্ধধর্মের যে মূল কথা — অর্থাৎ শুধু শূন্যতাকে গ্রহণ করলে চলবে না — শূন্যতার সঙ্গে মহাকরুণাকে অভেদে মিলিয়ে নিতে হবে — এই তত্ত্ব চর্যাপদগুলির মধ্যে নানাভাবে ছড়ান দেখি। সাধনার ক্ষেত্রে এই সহজিয়া সাধকগণ শূন্যতা ও করুণাকে যেভাবে মিলিয়ে নিয়েছেন তা ছাড়াও চর্যাপদগুলির ভিতরে নানাভাবে এই শূন্যতা ও করুণার মিলনের কথা আমরা লক্ষ্য করতে পারি। আমরা দেখেছি, কম্বলাম্বরপাদ তাঁর করুণার নৌকাকে সোনা — অর্থাৎ শূন্যতাদ্বারা ভরে নিয়েছেন (চর্যা ৮)। কাহ্নপাদ যেখানে দাবাখেলার রূপকে সাধনতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন সেখানেও দেখি, 'করুণা পিহাড়ী খেলহু নঅবল' — করুণার পিঁড়িতে তিনি দাবা খেলতে বসেছেন অর্থাৎ মহাকরুণাতেই তাঁদের সব সাধনার প্রতিষ্ঠা। অন্যত্র কাহ্নপাদ বলেছেন—'নিঅ দেহ করুণা শূণমে হেরী ॥ (চর্যা ১৩)।

বৌদ্ধ চর্যাগীতি, দোঁহা এবং বৌদ্ধতন্ত্রগুলিতে এই করুণার এমন একটা প্রভাব দেখতে পাওয়া যায় যে, এ-বিষয়ে এই প্রসঙ্গে আর একটু বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন আছে বলে বোধ করি। এই করুণার উপরে জোর দিয়েই মহাযানী বৌদ্ধগণ বোধিসত্ত্বের আদর্শকে প্রাচীন অর্হতের আদর্শ থেকে অনেক বড় করে দেখেছিলেন। অর্হৎগণ শূন্যতাকে অবলম্বন করে নির্বাণ লাভ করতেন ; কিন্তু মহাযানিগণ নির্বাণ লাভের বিরোধী ছিলেন। তাঁদের আদর্শ ছিল এই, নির্বাণ লাভের উপযুক্ত হয়ে নির্বাণকে উপেক্ষা করতে হবে—দুঃখ-প্রপীড়িত প্রাণিগণের জন্য কল্প-কল্পান্তর দেহ ধারণ করে বোধিসত্ত্বকে অবস্থান করতে হবে কুশল-কর্মের জন্য।

ভগবান বুদ্ধ ছিলেন করুণাঘন মূর্তি, বিশ্বের সমস্ত করুণা ঘনীভূত হয়েই যেন তাঁর জ্যোতির্ময় দিব্য দেহখানি গড়ে তুলেছিল । তাঁর এই করুণার ক্ষেত্র শুধু বিশ্বমানবের ভিতরেই সীমাবদ্ধ ছিল না — নিখিল জীবকোটির ভিতরে তা নিঃসীমভাবে পরিব্যাপ্ত ছিল। মহাযানিগণ মনে করতেন, বুদ্ধদেবকে অবলম্বন করে যে জাতক-গল্পগুলি তা বোধিসত্ত্বের করুণাময়ত্বেরই অভিব্যঞ্জক। তিনি করুণায় বিগলিত হয়ে যুগে-যুগে জন্মে-জন্মে সর্ববিধ যোনিতে অবতীর্ণ হয়ে সর্বশ্রেণীর প্রাণীর মধ্যে কুশল-কর্মের মহিমা প্রচার করেছেন তাঁর বাস্তব আচরণের ভিতর দিয়ে।

মহাযানমতে করুণার ভিত্তিভূমি হল একটা অদ্বয়বোধ — নিখিল বিশ্বের সঙ্গে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে এক করে দেখা। এই অদ্বয়বোধ মানুষের চিত্তকে ক্ষুদ্রতার গণ্ডী থেকে মুক্তি দান করে — চিত্তের ভিতরে আনে অসীম প্রসার। এই চিত্ত-প্রসারই আমাদের বৃহৎ করে তোলে। বৌদ্ধ 'ব্রহ্মবিহার'-এরও তাই একটি প্রধান উপাদান করুণা। ব্রহ্মবিহার কথাটিকে কোনও পারিভাষিক অর্থে যদি সীমাবদ্ধ না রাখি তবে ব্রহ্ম শব্দটিকে এখানে এর সাধারণ 'বৃহৎ' অর্থে গ্রহণ করা যেতে পারে ; নিজেদের ক্ষুদ্র অস্তিত্বকে অতিক্রম করে বা তাকে

প্রসারিত করে একটি বৃহৎ অস্তিত্বের মধ্যে বিহার করাকেই আমরা ব্রহ্মবিহারের তাৎপর্য বলে গ্রহণ করতে পারি।

মহাযান বৌদ্ধধর্মে এই করুণাই একরূপ ধর্মের মূলমন্ত্র হয়ে উঠল। এই করুণার বিশুদ্ধির জন্যই চাই শূন্যতা, নতুবা কুশলকর্মের প্রেরক এই করুণাই হয়ত মানুষকে শুভাশুভ কর্মের দ্বারা ক্লিষ্ট করবে। কিন্তু করুণাকে ছেড়ে কেউ যদি শুধু নিবৃত্তিমূলক শূন্যতার পথই অবলম্বন করে, তবে সে বিশ্ববিমুখ হয়ে একেবারেই আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়বে। এই একান্ত আত্ম-কেন্দ্রিকতাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় হীনতা, এই জন্যই শুধু মাত্র শূন্যতার পথকে বলা হচ্ছে হীনযান।

অনেক পরবর্তী কালের তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মে দেখতে পাই, এই করুণাই দেখা দিল সব তান্ত্রিক সাধনার মূলনীতি রূপে। বৌদ্ধতন্ত্রগুলিতে দেখতে পাই, যেখানে ভিন্ন দেব-দেবীর পূজা-অর্চনার বিধান রয়েছে — এমন কি, যক্ষ-রক্ষ, ভূতযোনি বা উপদেবতার তান্ত্রিক-মতে পূজার্চনার বিধি রয়েছে, তার সর্বত্রই সর্ব ক্রিয়াঙ্গের প্রথমে সাধককে সংকল্প গ্রহণ করতে হবে যে, ব্রহ্মাণ্ডের জীবকোটির দুঃখে করুণার্দ্রচিত্ত হয়েই তিনি এই সকল ক্রিয়াকাণ্ড করছেন — 'জগদুদ্ধরণ'-চেষ্টাতেই সব কিছু কৃত ; এই সব কর্মের দ্বারা যা কিছু পুণ্য লাভ হবে সে সমস্ত প্রাপ্য জগৎ-জীবের। গুহ্য-তান্ত্রিক যোগসাধনার ক্ষেত্রেও যোগীকে এই সংকল্প গ্রহণ করতে হয় — এই সংকল্পে প্রতিষ্ঠিত হতে হয়। এই সংকল্পে প্রতিষ্ঠিত হওয়া শব্দের অর্থই হল করুণায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া। মহাকরুণায় দৃঢ়-প্রতিষ্ঠা না ঘটলে কোনও সাধকের কোনও তান্ত্রিক সাধনাতেই অধিকার ঘটে না।

পরবর্তী কালের তান্ত্রিক দোঁহাকারগণের দোঁহা-গীতিতেও এই করুণার বাণীর অপূর্ব প্রতিধ্বনি দেখতে পাই। এই করুণাকে বলা হয়েছে নৌকা। নৌকা কখনও আপনা-আপনি নদীর এপার-ওপার করে না, সে অপরকেও এপার-ওপার করায়। এই যে সকলের জন্য এক — একের জন্য সকল — এইই হল শ্রেষ্ঠ পথ — তাই মহাযান। সরহপাদ তাঁর দোঁহায় বলেছেন —

করুণা ছড্ডি জো সুণ্ণহিঁ লগ্গু ।
ণউ সো পাবই উত্তম মগ্গু ॥

'করুণাকে ছাড়িয়া যে হয় 'শূন্য'তে লগ্ন সে কখনও পায় না উত্তম পথ।' কিন্তু পূর্বেই বলেছি, শূন্যতাকে ছেড়ে কেবল মাত্র করুণা আশ্রয় করলে তাতেও কুশল-অকুশল কর্ম দ্বারা ক্লিষ্ট হবার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই —

অহবা করুণা কেবল ভাবই ।
জম্ম সহস্সহি মোক্খ ণ পাবই ॥

'অথবা কেবল করুণাকে যে ভাবে জন্ম-সহস্রেও সে মোক্ষ পায় না।' সরহ বলেছেন,—

এহু সো অপ্পা এহু পরু জো পরিভাবই কোবি ।
তেঁ বিণু বন্ধে বেট্‌ঠি কিউ অপ্প বিমুক্কউ তোবি ॥

'এই হইল আপন, এই হইল পর — এই ভাবে যে কেউ পরিভাবনা করে, তাহারা বিনা-বন্ধনে বিমুক্ত নিজেকে আবার বন্ধনে বেষ্টিত করে।'

পর অপ্পাণ ম ভন্তি করু সঅল নিরন্তর বুদ্ধ ।
এহু সে নিম্মল পরম পউ চিত্ত সহাবে সুদ্ধ ॥

'পর ও আপন এই ভ্রান্তি কখনও করিও না ; সকলই নিরন্তর বুদ্ধ (পরমার্থতঃ)। এই যে পরম প্রভু চিত্ত — ইহা স্বভাবে (স্বরূপে) শুদ্ধ।' অর্থাৎ স্বরূপে সবই শুদ্ধ — সবই এক ; অতএব পর এবং আপন এই বোধ একান্তই ভ্রান্তি মাত্র।

অদ্বয় চিত্ত তরুঅরহ গউ তিহুবণেঁ বিত্থার ।
করুণাফুল্লীফল ধরই ণাউ পরত্ত উআর ॥

'(আমাদের যে) অদ্বয় চিত্ত (অদ্বয়ে প্রতিষ্ঠিত চিত্ত) তাহা একটি বিরাট তরুবরের মত— সে ত্রিভুবনে বিস্তার লাভ করিয়াছে; (এই অদ্বয় চিত্ততরুবর) ধরে করুণার ফলফুল—ইহার পরে আর কিছুই নাই (ইহাই হইল পরমতত্ত্ব)।'

সুণ্ণ তরুবর ফুল্লিঅউ করুণা বিবিহ বিচিত্ত ।
অণ্ণা ভোঅ পরত্তফলু এহু সোক্‌খ পরু চিত্ত ॥

'শূন্যতরুবর ফুল্লিত হইয়াছে — বিবিধ বিচিত্র করুণা ; অন্য ভোগে পরত্র ফল, এই চিত্তেই হইল পরম সুখ।'

এক্কেস্বো এক্কেবি তরু তেঁ কারণে ফল এক্ক ।
এ অভিণ্ণা জো মুণই সো ভবনিব্বাণ বিমক্ক ॥

'সবই এক—তাই একই হইল তরু—সেই কারণে ফলও হইল এক। ইহাকে অভিন্ন বলিয়া যে মনে করে সে হয় ভব-নির্বাণ বিমুক্ত।'

জো অত্থীঅণ ঠীঅউ সো জই জাই ণিরাস ।
খণ্ড-সরাবেঁ ভিক্‌খ বরু চ্ছড়্ডহু এ গিহবাস ॥

'যে ব্যক্তি অর্থী সে যদি যায় নিরাশ হইয়া—তবে খণ্ড সরাবে ভিক্ষাই ভাল—ছাড় এই গৃহবাস।'

পরউ আর ণ কিঅউ অত্থি ণ দীঅউ দাণ ।
এহু সংসারে কবণ ফলু বরু ছড্ডহু অপ্পাণ ॥

'পরের উপকার করা হয় না—অর্থীকেও দেওয়া হয় না দান—এমন সংসারে কিই বা ফল—বরং ছাড় আপনাকে।'

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সহজিয়াদের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি

১. বৌদ্ধ গান ও দোহায় প্রচারিত ধর্মের মূলসূত্র

[ক] প্রতিবাদ ও বিদ্রোহাত্মক সুর ॥ বৌদ্ধ সহজিয়া কবিগণ ধর্মাচরণ তথা জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে যাবতীয় বাহ্যানুষ্ঠানের তীব্র নিন্দা করেছেন। স্নান-অধ্যয়ন-উপবাস-দার্শনিকতা অথবা মূর্তিগঠন ও চিত্রাঙ্কনের দ্বারা সত্যকে লাভ করা যায় না — তত্ত্ব-দৃষ্টি ও যোগের দ্বারা দিব্যজ্ঞান লাভ করা প্রয়োজন। সকল শাস্ত্রে ক্ষুধা এবং যৌনক্ষুধাকে মানুষের আদিমতম বৃত্তি বলে স্বীকার করা হয়েছে এবং এইসব বৃত্তিকে অবদমনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে — কিন্তু স্বাভাবিক বৃত্তিগুলির এই ক্রমাগত নিরোধের দ্বারা মানুষ শুধু অসুস্থ ও স্নায়ুরোগগ্রস্ত হয়—তা মানুষকে তার স্বাভাবিক ধর্মপথে চালিত করে না ; যা মানুষকে তার সহজধর্ম-পথে চালিত করে না, তা মানুষের স্বরূপোপলব্ধির কোন সাহায্যও করে না। সহজিয়াদের মতে, মানবের সহজাত বৃত্তিগুলিই সত্য দর্শনের শ্রেষ্ঠ সহায়ক — সে জন্য এই পথই 'সহজ' পথ। অন্যান্য ধর্ম সম্প্রদায় অপেক্ষা সহজিয়াদের নৈতিক দৈন্যের পরিচায়ক এটি নয়। অন্যান্য ধর্মসম্প্রদায় যেখানে সহজাত বৃত্তিগুলির সম্পূর্ণ উচ্ছেদ চেয়েছেন, সহজিয়াগণ সেখানে তাদের উচ্ছেদ অস্বাভাবিক ও অসম্ভব বলে তাদের পরিবর্তন ও উন্নয়ন করতে চেয়েছেন।

সুতরাং 'সহজযান' — এই অভিধা দ্ব্যর্থ-বোধক। প্রথমত, এইভাব আত্মার সহজস্বরূপ ও ধর্মসমূহের সত্যরূপ প্রকাশ করে। দ্বিতীয়ত, এই পথে মানবের সহজ বৃত্তিগুলিকেই সহায়করূপে গ্রহণ করা হয়। সহজের অর্থই সহজাত। সহজ-সরল অর্থেও এই সহজযান অভিধা সুপ্রযুক্ত। শান্তিপাদ বলেছেন — পূর্ণতা লাভে সহজ পথই রাজপথ, সরলপথ (চর্যা ১৫)। সরহপাদ বলেছেন — সহজপথ পরিত্যাগ করে বক্রপথ অবলম্বন করো না। বোধিচিত্ত নিকটেই আছে। তার জন্য লঙ্কায় যাবার প্রয়োজন নেই — হাতের কঙ্কন দেখবার জন্য দর্পণের প্রয়োজন কি ?

উজু রে উজু ছাড়ি মা লেহুরে বঙ্ক।
নিঅড়ি বোহি মা জাহুরে লাঙ্ক ॥
হাথের কাঙ্কণ মা লেউ দাপণ ।
অপণে অপা বুঝতু নিঅমণ । (চর্যা ৩২)

একবার সহজতত্ত্ব বা বোধিচিত্ত লাভ হলে, আর মন্ত্রপাঠ-যাগযজ্ঞ প্রভৃতি কর্মকাণ্ডের কি প্রয়োজন?

– [খ] বহির্মুখ পাণ্ডিত্যের নিন্দা ॥ সহজিয়াদের মতে কঠিন ন্যায়শাস্ত্রের দুর্গম পথে সত্যদর্শন অসম্ভব। যুক্তি-তর্কের কণ্টকিত-পথে পরমার্থ-তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে চাইলে মহাসুখের স্বরূপ অবগত হওয়া যায় না — কারণ তা ইন্দ্রিয়াতীত, অচিন্তনীয়। সরহপাদ বলেন — দেহের মধ্যেই বুদ্ধ রয়েছেন। পাণ্ডিত্যাভিমানীরা একথা জানেন না ; তাই শাস্ত্রাধ্যয়ন ও

শাস্ত্রব্যাখ্যায় অজ্ঞাত এবং অজ্ঞেয় পরমসত্যের বৃথা চেষ্টা করেন। সহজ সর্বশ্রেষ্ঠধন, তথাকথিত পণ্ডিতগণ এই সত্যে বঞ্চিত। কাহ্নপাদ বলেছেন — আগম-বেদ-পুরাণাদি পাঠে গর্বিত পণ্ডিতগণ পক্ক বিল্বফলের গন্ধে আকৃষ্ট মক্ষিকার মতই বিপর্যস্ত হন।

আগম-বেঅ-পুরাণে পণ্ডিআ মাণ বহান্তি ।
পক্ক সিরিফলে অলিঅ জিম বাহেরিঅ ভমান্তি ॥

[গ] ধর্মাচরণে ও জীবনযাপনে সর্ববিধ আনুষ্ঠানিকতার প্রতি কটাক্ষ ॥ সহজিয়াগণ সর্ববিধ আচার-অনুষ্ঠান ও সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। সরহপাদ বলছেন —বর্ণাশ্রমভেদ, ধর্মসংস্কার ও শাস্ত্রপাঠ ব্রাহ্মণত্বের কারণ হলে শূদ্রও ব্রাহ্মণ হতে পারে এবং ব্যাকরণ-প্রভৃতিতে বেদের অনেক অংশ তারা পাঠও করে। ব্রাহ্মণেরা ক্ষিতি-অপ্-কুশ প্রভৃতি নিয়ে মন্ত্রপাঠ করে বৃথাই ধূমাকুলিত-লোচন হয় — আত্মোপলব্ধি না হলে উপনয়নের দ্বারা যজ্ঞসূত্র গ্রহণ করাও অর্থহীন। জটাধারণ ও ভস্মলেপন করে মুদ্রিত নয়নে আসনের ভান করে প্রদীপ জ্বেলে ঘন্টা নেড়ে একদল লোক সূর্যের কর্ণে মন্ত্রোচ্চারণ করে এবং উপবাসব্রতধারিণী মুণ্ডী ও অন্যান্য ব্রতধারীগণ তাদের দ্বারা প্রতারিত হয়। জৈন ক্ষপণকগণ দীর্ঘ নখ ও ধূসর কেশ ধারণ করে, মুণ্ডিত মস্তক ও বিবসন হয়ে মানুষকে মিথ্যাপথে নিয়ে যায়। নগ্নতা মুক্তির কারণ হলে শৃগাল-কুক্কুর, লোমোৎপাটন মুক্তির কারণ হলে যুবতীগণ, মৃগাচর্ম অথবা ময়ুরপুচ্ছ-ধারণ মুক্তির কারণ হলে মৃগময়ুর এবং তৃণভক্ষণ মুক্তির কারণ হলে হস্তি-অশ্বও মুক্তি লাভ করত। ভিক্ষু ও স্থবিরগণ প্রব্রজ্যা ব্রত নিয়ে শাস্ত্রপাঠ ও ধ্যান-ধারণায় মিথ্যা কালাতিপাত করে। লোকে ধ্যানধারণায় বোধিলাভ করতে না পেরে বিভিন্ন যানকেই দোষারোপ করে — কিন্তু কেউ আত্মতত্ত্ব-সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের চেষ্টা করে না।

কাহ্নপাদ বলেছেন—সহজ ডোম্বী সর্ববিধ কল্পনা ও সংস্কাররূপ নটপেটিকা ত্যাগ করে ; চিরাচরিত বেশভূষা ও আচার-অনুষ্ঠানের দ্বারা কাপালিক যোগী হওয়া যায় না — প্রকৃত কাপালিক সংস্কার ত্যাগ করে বোধিচিত্তের সহজস্বরূপ অবগত হন। কাপালিক কাহ্নপাদ সহজদেবীকে সহচরীরূপে গ্রহণ করে শ্বাসরূপ শাশুড়ি, ইন্দ্রিয়রূপ শ্যালিকা এবং মায়ারূপ মাতাকে সংহার করেছেন। এই প্রসঙ্গে কাহ্নপাদ প্রকৃত কাপালিক যোগীর যে বর্ণনা দিয়েছেন তা লক্ষণীয় :

নাড়ি-শক্তি দিঢ় ধরিঅ খট্টে ।
অনহা ডমরু বাজই বীরনাদে ॥
কাহ্ন কপালী যোগী পইঠ অচারে ।
দেহ-নঅরী বিহরই একাকারে ॥
আলি কালি ঘণ্টা নেউর চরণে ।
রবিশশী কুণ্ডল কিউ আভরণে ॥
রাগ দেষ মোহ লইআ ছার ।
পরম মোখ লবএ মুত্তাহার ॥
মারিঅ শাসু নণন্দ ঘরে শালী ।
মাঅ মারিআ কাহ্ন ভইল কবালী ॥ (চর্যা ১১)

'নাড়ী-শক্তিকে দৃঢ়ভাবে ধরিলাম খট্টায় (শূন্যতায়), অনাহত ডমরু বাজে বীরনাদে। কাহ্ন কাপালী যোগী প্রবিষ্ট হইল যোগাচারে ; দেহ-নগরীতে সে বেড়ায় একাকারে (অদ্বয়ে

সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া)। আলিও কালিরূপ বা গ্রাহ্য-গ্রাহকরূপ দ্বৈতত্ত্ববোধ হইল তাহার চরণের ঘণ্টা-নূপুর (ঘুঙুর), রবি-শশি-রূপ দুইকে (বাম-দক্ষিণের দুই নাড়ীকে) করিল কুণ্ডল আভরণ ; রাগ-দ্বেষ-মোহের ছাই লইয়া (তাহা অঙ্গে মাখিয়া) পরম মোক্ষরূপ মুক্তাহার লাভ করে। শ্বাস রূপ শাশুড়ীতে মারিয়া, আনন্দদায়ক দেহেন্দ্রিয়কে নিঃশেষে বিনষ্ট করিয়া এবং মায়ারূপ মাতাকে মারিয়া কাহ্নপাদ (প্রকৃত) কাপালী হইল।'

চর্যপদ ও দোহাগুলির সমসাময়িক জৈন অপভ্রংশ দোহাগুলিও একই আদর্শের অনুসারী। মুনিরাম সিংহের দোহা-সংগ্রহে (পাহুড় দোহা) শাস্ত্রাধ্যায়ন ও পাণ্ডিত্যাভিমানকে ধিক্কার দিয়ে বলা হয়েছে যে, এগুলির বস্তুগত কোন মূল্য নেই। সুদূর তীর্থযাত্রা, অরণ্য ও পর্বত-পরিক্রমায় এবং শুদ্ধিস্নানে কোন ফল আছে কি, যদি নিরঞ্জনে দৃঢ়রূপে মন আবদ্ধ না হয়? নির্মোক-ত্যাগে সর্প নির্বিষ হয় না, মস্তকমুণ্ডনেও হৃদয়ের বাসনা দূর হয় না ; হৃদয় বাসনামুক্ত হলেই সমস্ত বন্ধন ছিন্ন হয়।

আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষাগুলির জন্মপূর্বে, শৈশবে এবং মধ্যবয়সে সর্ববিধ অন্ধ সংস্কারের বিরুদ্ধে এরূপ বিদ্রোহাত্মক মনোভাব সর্বত্রই প্রস্ফুট। এই জাতীয় সকল সাহিত্যসৃষ্টিকেই সাধারণভাবে সহজিয়া বা মরমীয়া সাহিত্য বলে। বৌদ্ধ ও জৈন সহজিয়া সম্প্রদায়, বৈষ্ণব সহজিয়া ও বাউল নামে অভিহিত গ্রাম্য কবিগণ, উত্তর ভারতের সন্ত কবিগণ ও অন্যান্য ভক্ত কবিগণ, মারাঠার ভক্তি সংগীতকারগণ, এমনকি শিখ ও সুফী সম্প্রদায়ের কবিগণও এই সম্প্রদায়ভুক্ত। সুতরাং আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষাগুলির সকলেরই সাহিত্যের ইতিহাসে সহজিয়া সাহিত্যের একটি বিস্তৃত অধ্যায় আছে।

[ঘ] **সহজিয়াদের বিদ্রোহাত্মক আদর্শের উৎস ॥** ভারতবর্ষের ধর্মনৈতিক চিন্তাধারার ইতিহাসে এই মত-বৈপরীত্য ও সমালোচনার প্রথম সাক্ষাৎ পাওয়া যায় আরণ্যক ও উপনিষদসমূহে। ইতিপূর্বে সংহিতা ও ব্রাহ্মণসমূহে যাগযজ্ঞ ও কর্মকাণ্ডের উপরেই অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। কিন্তু তাদের মধ্যে ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা লাভের পরেই, আরণ্যক ও উপনিষদগুলিতে কর্মকাণ্ড সংকুচিত হয়ে আত্মজিজ্ঞাসা ও ব্রহ্মজিজ্ঞাসাই প্রাধান্য লাভ করে। বৃহদারণ্যকে বলা হয়েছে — ক্রিয়াকাণ্ডের অনুষ্ঠানে ব্রহ্মদর্শন হয় না, বাসনানিবৃত্ত চিত্তের নির্মলতাই ব্রহ্মদর্শনের সহায়ক। মহাকাব্য-যুগেও এই আদর্শের প্রাধান্য দেখা যায়। মহাভারতের একস্থানে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলছেন — সকল পুণ্যস্নানের শ্রেষ্ঠ পুণ্য তিনিই লাভ করেছেন, যিনি পূত-হৃদয়-সলিলে স্নান করে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেছেন।

পরবর্তীযুগে উপনিষদের এই আদর্শ দুটি প্রধান শাখায় বিভক্ত হয়ে চলেছে — বৈদান্তিক ও বৈষ্ণবীয়। বৈদান্তিকেরা জোর দিয়েছেন বিশুদ্ধজ্ঞানের উপরে, আর বৈষ্ণবেরা চেয়েছেন শুদ্ধাভক্তি বা প্রেম। বৈষ্ণবগণ সাযুজ্য বা অনন্ত স্বর্গসুখ চান নি — জন্ম-জন্মান্তরে দয়িতের লীলারসাস্বাদন করতেই চেয়েছেন। দক্ষিণ ভারতের শৈব-সম্প্রদায় এবং পরবর্তীকালের শাক্ত-সম্প্রদায়ের মধ্যেও এই ভক্তিধর্ম বিস্তার লাভ করেছে। কিন্তু উত্তর ও পূর্ব ভারতে এই ভক্তিধর্ম মুখ্যত বৈষ্ণবধর্মকেই অবলম্বন করে পল্লবিত হয়েছে।

এইরূপে বৈষ্ণবধর্ম ও অন্যান্য ভক্তিধর্ম কর্মবাদের কঠিন নাগপাশের মধ্যে ঐশিক করুণার অভয় বার্তা বয়ে নিয়ে এসেছে। সংহিতা ও ব্রাহ্মণসমূহের যাগযজ্ঞ-মন্ত্রতন্ত্র ও ক্রিয়াকাণ্ডের মধ্যে ঐশিক ইচ্ছা বা করুণার কোন স্থান ছিল না—উপনিষদের মধ্যেই প্রথম তাঁকে ইচ্ছাময়-লীলাময়রূপে দেখতে আরম্ভ করা হয়েছে। এবং তদনুবর্তী সকল ভক্তিমার্গেই ঐশিক করুণার

নিকট অকুণ্ঠ আত্মনিবেদনের আকুতিই প্রকাশ পেয়েছে। তৎপরে প্রায় নবম শতাব্দী পর্যন্ত বৈষ্ণব-ধর্মে ভগবানের অনন্ত করুণারাজ্যের অধিবাসী হবার আকাঙ্ক্ষা দেখা যায়। ভাগবত পুরাণের অশিক্ষিতা গ্রাম্যবালাগণ তাঁদের অকৃত্রিম অনুরাগের জন্যই সর্বকালের সাধকের পুরোভাগে স্থান লাভ করেছেন। কিন্তু বৈষ্ণবধর্মের এই ভক্তিবাদও পরবর্তীকালে দুইভাগে বিভক্ত হয়েছে—বৈধীভক্তি ও রাগানুগাভক্তি। বৈষ্ণব শাস্ত্রানুশীলন ও বিধিমার্গে যে জ্ঞান-মিশ্রা ভক্তির উদয় হয়, তা বৈধী বা পরাভক্তি এবং ভগবানে নিহিত-চিত্ত ভক্ত লোকধর্ম ও বেদধর্ম পরিত্যাগ করে যে অনন্যা, অহৈতুকী ভক্তি লাভ করেন, তা রাগানুগা ভক্তি। এই অবিচ্ছিন্না, অহৈতুকী ও অব্যভিচারী ভক্তিমার্গে লীলারসাস্বাদনই প্রকৃষ্ট সাধন —ভক্তকে এই সুযোগ দেবার জন্যই ভগবান লীলাবিগ্রহ ধারণ করেন।

বিভিন্ন যোগসাধনার ক্ষেত্রেও এই মন্ময়তার উপরেই অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এমনকি হঠযোগের গূঢ় মন্ত্রতন্ত্র ও যাদুবিদ্যার মধ্যেও এই আদর্শবাদের সুর সুস্পষ্ট। যোগপন্থী সকল সম্প্রদায়ের মতে, চঞ্চল মনপবন দেহ-নৌকাকে ঠেলে সংসারের দুঃখময় কূলে আনছে — তাই সর্বাগ্রে এই মনপবনকেই নিরোধ করতে হবে। তন্ত্রের মধ্যেও এই বিদ্রোহের সুর শোনা যায় — হিন্দুতন্ত্র যেমন ব্রাহ্মণ্যধর্মের বর্ণাশ্রম বিভাগকে, বৌদ্ধতন্ত্র তেমনই তার প্রব্রজ্যার আদর্শকে প্রতিহত করেছে। তারা সকলেই বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের শাস্ত্রবিধি ও আচার-অনুষ্ঠানের পথ পরিত্যাগ করে যোগের কার্যকারিতা স্বীকার করেছে। উক্ত আস্তিক্যবাদিগণের চেয়ে ব্রাহ্মণ্যধর্ম অধিক প্রতিকূল সমালোচনার মুখোমুখি হয়েছে নিরীশ্বরবাদীদের। উপনিষদের মধ্যেই অনেকস্থলে সৃষ্টিকর্তা চিৎস্বরূপের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় নি। পালি ও তৎপূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে একাধিক জড়বাদী অর্থাৎ লোকায়ত সম্প্রদায়ের উল্লেখ দেখা যায়। তাদের মধ্যে চার্বাকদর্শনই চিন্তার অভিনবত্বে ও যুক্তির তীক্ষ্ণতায় স্বতন্ত্র মহিমায় প্রতিষ্ঠিত। চার্বাকের মতে, সমগ্র সৃষ্টি ও জৈবপ্রবাহ পঞ্চভূতের সৃষ্টি—ঈশ্বর, আত্মা, মোক্ষ, পুনর্জন্মবাদ সমস্তই ধূর্ত ব্রাহ্মণগণের জীবিকার্জনের হীন কৌশল মাত্র। বৌদ্ধ ও জৈনগণ নিরীশ্বর-বাদী হলেও সম্পূর্ণ বিরুদ্ধবাদী নন। তাঁরা ধর্মকে শুদ্ধ আনুষ্ঠানিকতার ক্ষেত্র থেকে নৈতিক মানবতার ক্ষেত্রে উন্নীত করতে চাইছেন। বৌদ্ধ ও জৈন দর্শন ও ধর্মশাস্ত্রে প্রভূত পার্থক্য বিদ্যমান থাকলেও, বেদের অভ্রান্ততা ও পরমতত্ত্বরূপে কোন চিৎ-স্বরূপের অস্তিত্বে তাঁরা উভয়েই সন্দিহান। উভয়ের মতেই অহিংসা সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম। জৈনদের মতে, কর্মই বস্তুজগতের সহিত জীবাত্মার বন্ধনের কারণ — বিবিধ সংযম-সাধনায় এই কর্মবন্ধন থেকে মুক্তিলাভ সম্ভব। কিন্তু ব্রাহ্মণ্যধর্মকে দার্শনিক ও ধর্মনৈতিক উভয় চিন্তার ক্ষেত্রেই প্রচণ্ড সংঘাতের সম্মুখীন হতে হয়েছে বৌদ্ধ ধর্মের কাছে। বুদ্ধের 'প্রতীত্য-সমুৎপাদ' কার্য্য-কারণ-বস্তু এবং দেশকাল সম্বন্ধে পূর্ববর্তী সমস্ত সিদ্ধান্তের মধ্যেই বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে। সকল বৌদ্ধ গ্রন্থেই ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের শাস্ত্রানুশাসন, কর্মকাণ্ড, সৃষ্টিকর্তা হিসাবে কোন চিৎস্বরূপের অস্তিত্ব, বর্ণাশ্রম বিভাগ, পুণ্যস্নানের দ্বারা মোক্ষলাভের প্রচেষ্টা — সমস্তই তীব্র ভাষায় ধিক্কৃত হয়েছে।

কিন্তু এই চিন্তার স্বাধীনতা নিয়ে বৌদ্ধধর্মের যাত্রা শুরু হলেও তার দৈনন্দিন ধর্মাচরণের মধ্যে ধীরে-ধীরে কঠোর বিধিনিষেধ ও সন্ন্যাসের আদর্শ প্রবেশ করে এবং কালক্রমে তার মধ্যেও দুটি সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। কালক্রমে মহাযান বৌদ্ধধর্মে আবার তান্ত্রিকতা প্রবেশ করার সঙ্গে-সঙ্গে এই বৌদ্ধতন্ত্র গুহ্যসাধনমার্গে মুক্তিলাভের আদর্শ ধারণ করে হীনযান ও মহাযান উভয় সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ ঘোষণা করে। বৌদ্ধতন্ত্রে বলা হয়েছে, কঠোর

তপশ্চর্যা, পুণ্যস্নান অথবা তীর্থদর্শনের দ্বারা মুক্তিলাভ অসম্ভব ; পঞ্চবিধ কাম্যবস্তুর ভোগানন্দ তত্ত্বদীক্ষা এবং প্রজ্ঞা বা শক্তির (নারীর) সঙ্গে যোগানন্দেই বুদ্ধত্বলাভ হয়।

কিন্তু এই বৌদ্ধতন্ত্র বা বজ্রযান তার গুহ্যসাধনপ্রণালীর সঙ্গে পুনরায় অসংখ্য মন্ত্রতন্ত্র-মুদ্রামণ্ডল-ইন্দ্রজাল ও ক্রিয়াকাণ্ডের ব্যবহারে ধীরে-ধীরে সকল সম্প্রদায়কেই অতিক্রম করে গেছে। আবার অল্পকাল-মধ্যেই তার মধ্য থেকে একটি সম্প্রদায় বজ্রযান বৌদ্ধধর্মের সমস্ত আনুষ্ঠানিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে কয়েকটি গুহ্য যোগপদ্ধতিকেই সত্যস্বরূপের উপলব্ধি বা পূর্ণতা লাভের একমাত্র পথ বলে গ্রহণ করে এবং বৌদ্ধ সহজিয়া সম্প্রদায় রূপে অভিহিত হয়।

তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের শাখা-হিসাবে সহজিয়া-বৌদ্ধধর্মের মধ্যেও প্রভূত পরস্পর-বিরোধী ধর্ম-বিশ্বাস স্থান লাভ করেছে। দার্শনিক যুক্তি ও সূক্ষ্ম পাণ্ডিত্যের প্রতি বিরক্তি এবং ধর্মসাধনার সক্রিয় পন্থার অধিক গুরুত্ব এটির মধ্যে তন্ত্র ও যোগের যুগ্ম-প্রভাবের পরিচায়ক। আবার আত্মদর্শনের সাহায্যেই সত্যদর্শন হয় — এই উপলব্ধি বেদান্তের প্রভাব-প্রসূত। সহজিয়াদের আত্মতত্ত্ব বা সহজতত্ত্বের উপলব্ধিই চরম লক্ষ্য বা নিঃশ্রেয়স — এই বোধ উপনিষদেব ব্রহ্মের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। বিচিত্র ধর্মনৈতিক চিন্তাধারার অসংখ্য ভাবকল্পনার সংমিশ্রণে বৌদ্ধ ও জৈন গান ও দোহাগুলির ধর্মভিত্তি স্থাপিত হয়েছে। ভক্তিধর্ম ও প্রেমর্ধমের আদর্শ এদের মধ্যে অনুস্যূত না হলেও মধ্যযুগের বৈষ্ণব-সহজিয়া-বাউল-সূফী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের দোহা ও গানগুলিতে তার প্রভাব অপরিসীম। তা ছাড়া মধ্যযুগীয় কবিগণ ঐসলামিক সূফী-সম্প্রদায়ের মধ্যেও চিন্তা ও ভাবাদর্শের সাজাত্য অনুভব করেছেন।

২. সহজের স্বরূপ

পূর্বে বলা হয়েছে, সহজ-স্বরূপের উপলব্ধিই চরম কাম্য বলে বৌদ্ধসিদ্ধাচার্য-সম্প্রদায় সহজিয়া নামে অভিহিত ছিলেন — অবশ্য এই সহজ-স্বরূপকে তাঁরা আবার সহজপথেই উপলব্ধি করতে চেয়েছেন। সহজ অথবা সর্বভূত ও জীবের অন্তর্নিহিত স্বরূপের বিশ্লেষণে সহজিয়া ধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির পরিচয় পাওয়া যাবে। সহজ শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ, যা সহজাত (সহ জায়তে ইতি সহজ) ; অর্থাৎ যে পরমস্বরূপ আমাদের অস্তিত্বের সহিত — সকল অস্তিত্বের সারভূত সত্য রূপে বর্তমান থাকে। হেবজ্রতন্ত্রে বলা হয়েছে, সর্বভূতের সহজাত ধর্ম অর্থাৎ সহজশক্তি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যেও রয়েছে — সুতরাং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও মূলত সহজস্বরূপ। সর্বধর্মের স্বরূপ মহাসুখ — তাই মহাসুখই সর্বধর্মের সহজ স্বরূপ। জৈব প্রবাহের মধ্য দিয়ে এই মহাসুখ-রূপ সহজশক্তি লব্ধ হলেও এবং এই দেহের মধ্যেই সহজসত্য নিহিত হলেও, এটি সর্বভূতেরও স্বরূপ এবং পরমসত্য-স্বরূপ। উপনিষদের ব্রহ্মের মতই সহজশক্তি আত্মা ও সর্বভূতের পরম স্বরূপ, বুদ্ধি ও বাক্যের অতীত এবং স্বয়ংবেদ্য — অন্তরের দিকে আবৃত্তচক্ষু হয়ে তাঁকে লাভ করতে হয়। তিনি জ্ঞাতৃত্ব জ্ঞেয়ত্ব ও সর্বপ্রকার জ্ঞানের অতীত। একটি চর্যায় কাহ্নপাদ এই সহজ-স্বরূপ সম্বন্ধে বলছেন —

জো মণগোঅর আলাজালা ।
আগম পোথী ইষ্টামালা ॥
ভণ কইসেঁ সহজ বোল বা জাঅ।
কাঅবাক্‌চিঅ জসু ণ সমাঅ ॥

আলে গুরু উএসই সীস।
বাক্‌পথাতীত কহিব কীস ॥
জে তঁই বোলী তে তবি টাল।
গুরু বোব সে সীসা কাল ॥
ভণই কাহ্নু জিণ-রঅণ বি কইসা।
কালেঁ বোব সংবোহিঅ জইসা ॥ (চর্যা ৪০)

'যাহা কিছু মনগোচর তাহাই আলাজালা — (আলাজালা সব) আগম পুঁথি ইষ্টমালা। বল কি করিয়া সহজ বলা যাইতে পারে — কায়বাক্‌চিত্ত যাহাতে প্রবেশ করে না। বৃথা গুরু উপদেশ করেন শিষ্যকে, যাহা বাক্‌পথাতীত তাই কি করিয়া বলিবে? যাহারা সে সম্বন্ধে কিছু বলে সে সবই মিথ্যা, (এখানে) গুরু বোবা, শিষ্য কালা। কাহ্নু বলিতেছে, (সহজরূপ) জিনরত্ন কি রকম? কালা যেমন বোবা দ্বারা সংবোধিত হয়। অর্থাৎ সহজ-স্বরূপের তত্ত্ব মুখে বলবার এবং কানে শোনবার নয় — অনুভবশীল গুরু আকারে-ইঙ্গিতে তার আভাস দেন, — শ্রাদ্ধাবান্ শিষ্য তা থেকেই বুঝে নেবার চেষ্টা করে।

তাড়কপাদ বলছেন — সহজশক্তি বাক্‌পথাতীত হওয়ায় বাহ্য-লক্ষণে অনুমান করা যায় না — 'বাক্‌পথাতীত কাঁহি বখাণী ॥' (চর্যা ৩৭)। তিল্লোপাদ ও সরহপাদ তাঁদের দোহায় বলছেন — সহজ-অবস্থায় ভববিকল্প তিরোহিত হয়। প্রাণবায়ুর নিরোধে চঞ্চল মনপবনের ক্রিয়া নষ্ট হয় ; এ অবস্থায় সহজের ব্যাখ্যা কিরূপে সম্ভব? উপনিষদ ও বেদান্তের ব্রহ্মের মত এই সহজও শব্দ-বর্ণ-গুণ-সংস্কার উর্ধ্বে। সুতরাং এটি বৌদ্ধধর্মের 'নির্বাণ ধাতু', অশ্বঘোষের 'তথতা' নাগার্জুনের চতুষ্কোটির উর্ধ্বে অবস্থিত অভাবস্বভাব পরমসত্য, বিজ্ঞানবাদীদের 'অভূত-পরিকল্প' বা 'বিজ্ঞপ্তি-মাত্রতা' এবং বজ্রযানীদের 'বজ্রধাতু' বা 'বজ্রসত্ত্ব' এবং মহাসুখ বা শূন্যতা-করুণার মিলিতাবস্থা বোধিচিত্ত-স্বরূপ। সহজ অনাদি-অনন্ত ; এটি অস্তিত্ব-অনস্তিত্ব, পাপপুণ্য, দোষ-গুণ ও চক্ষুকর্ণের অতীত ; এটি অব্যয় অদাহ্য ; এটি অদ্বয় সমরস ; এটি মন ও প্রাণবায়ুর নিশ্চল অবস্থা। সহজানন্দ পদ্মের অদৃশ্য গন্ধের মতো সর্বভূতের অন্তর্লীন অখণ্ড সত্য বা কেবলস্বরূপের প্রতীতি। সহজানন্দে মনের ক্রিয়া লুপ্ত হলে স্বরূপের উপলব্ধি হয়।

এখানে লক্ষ্য করতে হবে যে, অবিমিশ্র নাস্তিক্যবাদের মধ্যে বৌদ্ধধর্মের যাত্রা শুরু হলেও কালক্রমে তার মধ্যে অশ্বঘোষের তথতাবাদ, অসঙ্গ-বসুবন্ধুর বিজ্ঞপ্তিমাত্রতা বা অভূত-পরিকল্পবাদ হতে উপনিষদের আত্মবাদ পর্যন্ত গৃহীত হয়েছে। বজ্রযানীদের বজ্রসত্ত্ব বা শ্রীমহাসুখের কল্পনার মধ্যেই পরমপুরুষের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত দেখা যায়। সহজের অসংখ্য চক্ষুকর্ণ-হস্তপদের কল্পনাও উপনিষদের ব্রহ্মের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। ব্রহ্মের মত সহজও সর্বভূত ও সর্বজীবের মধ্যে অপরিবর্তনীয় সত্য। তিনিই কর্তা ও ভর্তা। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাঁতেই ধৃত, তাঁতেই আশ্রিত ও জাত ; তিনিই জীবের জীবন, তিনিই কাল ও অহং স্বরূপ।[১]

১ তুলনীয় : স এব প্রাণিনাং প্রাণঃ স এব পরমাক্ষরঃ।
সর্বব্যাপী স এবাসৌ সর্বদেহে ব্যবস্থিতঃ ॥
স এবাসৌ মহাপ্রাণঃ স এবাসৌ জগন্ময়ঃ।
ভাবাভাবৌ তদুদ্ভূতৌ অন্যানি যানি তানি চ ॥
সম্বিং বিজ্ঞানরূপঞ্চ পুরুষং পুরাণমীশ্বরম্।
আত্মা জীবঞ্চ সর্বঞ্চ কালঃ পুদ্‌গল এব চ ॥ — হেবজ্রতন্ত্র।

তিল্লোপাদ তাঁর দোহায় বলছেন— আমিই বিশ্ব, আমিই বুদ্ধ, আমিই বিশুদ্ধসত্ত্ব, আমিই ভবচক্রের সংহারক। এটিই সহজতত্ত্বের উপলব্ধি। সহজের উদ্দেশ্য অন্যত্র বলা হয়েছে — তুমিই সর্বভূতে বিরাজিত, সর্বশাস্ত্রে খ্যাত, সর্বধর্মের লক্ষ্য ও কারণ। হে সুরাসুরের অধীশ্বর তোমাকে নমস্কার ; ইন্দ্রিয়গণের অতীত তুমি, গানে তোমার বন্দনা করি। —

কেবল সহজ সহাউ রি দিসই
নমহু সুরাসুর তিহুঅণ নাহই।
ইন্দিঅ লোঅ ণ জানই কোই
পরম মহাসুহ পূজহু গাহই ॥

—ডাকার্ণব।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সহজিয়া সাধন-প্রণালী ও মহাসুখ

বিভিন্ন দর্শন-শাস্ত্রে পরমার্থ-সত্যের স্বরূপ সম্বন্ধে যত আলোচনা হয়েছে, সেই সত্যকে লাভ করবার কার্যকর পন্থা সম্বন্ধে তত আলোচনা হয় নি। হিন্দু অথবা বৌদ্ধতন্ত্র মূলত কোন দার্শনিক মতবাদ নয় — এর মুখ্য আলোচ্য একটি সাধন-প্রক্রিয়া। তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম থেকে উদ্ভূত সহজিয়া মতেরও এটিই বৈশিষ্ট্য। বর্তমান পরিচ্ছেদে সহজিয়া সম্প্রদায়ের সাধন প্রণালী ও মহাসুখ সম্বন্ধে একটা সাধারণ ধারণা দেবার চেষ্টা করা হবে।

১. গুরুবাদ

সহজিয়া সাধন প্রণালীর প্রথম কথা উপযুক্ত গুরু-নির্বাচন। প্রকৃতপক্ষে এটি সকল ভারতীয় দর্শন ও ধর্মসাধনারই প্রথম কথা। ভারতীয় ধর্মসাধনায় গুরুর সহায়তা একান্ত প্রয়োজনীয় এই জন্য যে, এখানে পরমতত্ত্ব চতুষ্কোটির উর্ধ্বে অবস্থিত এবং বুদ্ধির অনধিগম্য ; তাঁকে অন্তরের মধ্যে আবৃত্তচক্ষু হয়ে দেখতে হয়। প্রকৃত গুরু অদ্বয় অবস্থায় শিষ্যের সঙ্গে মিলিত হয়ে শিষ্যের আধ্যাত্মিক উন্নতি বিধান করেন — শিষ্যকে যন্ত্রবৎ পরিচালিত করেন। অনেক ধর্মসাধনায় গুরু ঈশ্বরের প্রতিনিধি — তাঁর মাধ্যমেই ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করতে হয়। গুরুর কর্তব্য সম্বন্ধেও তন্ত্রে অনেক নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এ ছাড়া তান্ত্রিক সাধনায় অনেক গুহ্য প্রক্রিয়ায় গুরুর সহায়তার প্রয়োজন। অভিজ্ঞ গুরুর সক্রিয় সাহায্য ভিন্ন এই সাধনার জটিল প্রক্রিয়ায় প্রতিপদে নরকের পঙ্কিল আবর্তে পতিত হবার আশঙ্কা। এই সকল কারণেই তন্ত্রে গুরু পরমসত্য-রূপেই পূজিত হয়েছেন। চর্যাপদেও যেখানে সাধকের মনে বিন্দুমাত্র সংশয়ের ছায়া আসন্ন হয়েছে অথবা ঘনায়মান সঙ্কটে সাধকের মন সন্দেহ-দোলায় আন্দোলিত হয়েছে, সেখানেই বারংবার প্রকৃত গুরুর শরণাপন্ন হবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আমাদের প্রাচীন ও মধ্যযুগের সমস্ত ধর্মমত ও সাহিত্যের ক্ষেত্রেই গুরুবাদের এই আদর্শ পুরোভাগে স্থাপিত হয়েছে।

২. সাধনায় দেহের প্রাধান্য

বৌদ্ধ তান্ত্রিক ও সহজিয়াদের মতে, সকল সত্য আমাদের ভিতরে — শুধু অন্তরে নয়, আমাদের দেহের ভিতরেও। যে-সত্য বিরাজিত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিপুল প্রবাহের ভিতরে, সেই সত্যই বিরাজিত আমাদের দেহের ভিতরে — সমস্ত জৈবিক প্রবাহের ভিতরে। সমস্ত জৈবিক প্রবাহ নিয়ে আমাদের এই দেহটিই আবহমান বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতিমূর্তি। এই দেহের ভিতরেই রয়েছে চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-নক্ষত্র, সকল পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, সংবৎসর, মাস-দিবস-তিথি-ক্ষণ। এই দেহই সত্যের মন্দির, সকল তত্ত্বের বাহন। এটিকেই যন্ত্র করে এর ভিতরেই সকল সত্য আবিষ্কার করে এর ভিতরেই শিবশক্তির

মিলন ঘটাতে হবে। নিজের ভিতরে এই শিবশক্তির মিলনের দ্বারা সত্য-প্রতিষ্ঠা হলেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ভিতর দিয়েও সেই সত্যকে উপলব্ধি করা সহজ হবে। সাধককে তাই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড থেকে ফিরে আসতে হবে দেহভাণ্ডে। শ্রীকালচক্রে বলা হয়েছে, দেহ ভিন্ন মহাসুখের আস্বাদন বা পূর্ণতালাভ অসম্ভব। সেজন্য যোগসাধনায় স্নায়ুতন্ত্র-সমন্বিত দেহেরই প্রাধান্য। সরহপাদ তাঁর দোহাকোষে বলছেন — এই দেহের মধ্যেই রয়েছে গঙ্গা-যমুনা-গঙ্গাসাগর ; এখানেই সকল পীঠস্থান ও উপপীঠস্থান ; আমার এই দেহের মত এমন তীর্থ, এমন সুখের আবাস আর নেই, — 'তিনি ঘরেই রহিয়াছেন, তাঁহাকে বাহিরে অন্বেষণ করিতেছ? পতিকে দেখিতেছ — তবু প্রতিবেশীকে (তাহার কথা) জিজ্ঞাসা করিতেছ? নিজেকে জান, ধ্যান-ধারণা-মন্ত্রে তাঁহাকে লাভ হইবে না।'

ঘরে অচ্ছই বাহিরে পুচ্ছই।
পই দেক্‌খই পড়িবেসী পুচ্ছই ॥
সরহ ভণই বঢ় জাণউ অপ্পা।
ণউ সো ধেঅ ন ধারণ জপ্পা ॥
পণ্ডিঅ সঅল সত্থ বক্‌খাণই।
দেহাই বুদ্ধ বসন্ত ন জাণই ॥

'পণ্ডিতেরা সকলে শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করে — কিন্তু দেহের মধ্যেই বাস করেন যে বুদ্ধ তাঁহাকে জানে না।'

অসরির কোই সরীরহি লুক্কো।
জো তহি জাণই সো-তহিঁ মুক্কো ॥

'অশরীরী কেহ এই শরীরের মধ্যে লুকাইয়া আছে, যে তাহাকে জানে সেই হয় মুক্ত।'

চর্যাপদে কাহ্নপাদ বলছেন — কাহ্ন কপালী হয়ে যোগে দেহ-নগরে প্রবেশ করে অদ্বয়রূপে ক্রীড়া করছেন (চর্যা ১১)। পঞ্চতথাগতকে ক্ষেপণী করে মায়াজাল ছিন্ন করে দেহ-তরণী বেয়ে চল (চর্যা ১৩)। সত্যের অভিমুখে অগ্রসর হবার জন্য দেহকে নৌকা ও বিশুদ্ধ চিত্তকে ক্ষেপণীরূপে অনেকেই উপমিত করেছেন।

তন্ত্রমতে দেহের মেরুদণ্ডটিই মেরুপর্বতের ন্যায় দেহব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রস্থলে দাঁড়িয়ে আছে। হিন্দুতন্ত্র ও অন্যান্য যোগসাধনায় এই মেরুদণ্ডকে অবলম্বন করে ষট্‌চক্রের অবস্থান কল্পিত হয়েছে — কিন্তু বৌদ্ধতন্ত্রে নাভিপদ্মে নির্মাণকায়া, হৃদ্‌পদ্মে ধর্মকায়া, কণ্ঠে অবস্থিত সম্ভোগকায়া, — এই তিনটি চক্রের কল্পনা দৃষ্ট হয়। বৌদ্ধ তন্ত্রের আর একটি চক্র বজ্রকায়া বা সহজকায়া উষ্ণীষকমলে (হিন্দুতন্ত্রের সহস্রারে) অবস্থিত। এটিই পরমতত্ত্বের আলয় মহাসুখচক্র বা মহাসুখকমল।

শূন্যতা-করুণা বা প্রজ্ঞা-উপায়ের মিলনে বোধিচিত্তের উৎপত্তি হয়। দেহাভ্যন্তরে বত্রিশটি প্রধান নাড়ীর মধ্যে তিনটিই সর্বশ্রেষ্ঠ — মেরুদণ্ডের দুইপার্শ্বে প্রজ্ঞা ও উপায় এবং মধ্যবর্তী নাড়ী অবধূতিকা। এই প্রজ্ঞা ও উপায় অবধূতিমার্গের সহিত মিলিত হয়ে বোধিচিত্তকে উৎপন্ন করে। বৌদ্ধতন্ত্র ও চর্যাপদে এই নাড়ীগুলি অসংখ্য নামে অভিহিত। দক্ষিণ দিকস্থ নাড়ী উপায়, পিঙ্গলা, রসনা, সূর্য, রবি, প্রাণ, চমণ, কালি, বিন্দু, যমুনা, রক্ত, রজ, ভাব, পুরুষ, গ্রাহ্য ব্যঞ্জন, 'বং' প্রভৃতি নামে অভিহিত। বাম দিকস্থ নাড়ী প্রজ্ঞা, ইড়া, ললনা, চন্দ্র, শশি, অপান, ধমন, কালি, নাদ, গঙ্গা, শুক্র, তম, অভাব, নির্বাণ, প্রকৃতি, গ্রাহক, স্বর, 'এ' প্রভৃতি নামে খ্যাত। এই উভয়দিকস্থ নাড়ী দ্বৈতসত্যের এবং মধ্যগা অবধূতিকা অদ্বয়সত্যের প্রতীক।

৩. গুহ্য সাধন-পদ্ধতি

সহজিয়াগণ সূক্ষ্মতত্ত্বসমূহের উপলব্ধির জন্য দেহকে কায়সাধন বা যোগসাধনার দ্বারা সুদৃঢ় করা প্রয়োজন মনে করতেন। সকল গুহ্য সাধক-সম্প্রদায় বিশেষত নাথসিদ্ধগণের মধ্যেই এই কায়সাধনার প্রাধান্য। যোগে পরিশুদ্ধ ও পরিপক্ক দেহের প্রয়োজন এবং এই পরিপূর্ণতার জন্য প্রয়োজন হঠযোগের অভ্যাস। বৌদ্ধ সিদ্ধগণ সেজন্য সকলেই ছিলেন হঠযোগী। চর্যাপদেও বারংবার পঞ্চস্কন্ধকে সুদৃঢ় করবার উপদেশ দেওয়া হয়েছে — হঠযোগের দ্বারা স্কন্ধ-সমূহকে পরিপক্ক না করলে মহাসুখাস্বাদনে ইন্দ্রিয়সমূহ নিস্তেজ অবস্থায় থাকে ; তাতে পরিপূর্ণ আস্বাদন অসম্ভব।

বৌদ্ধ সহজিয়াগণের গুহ্যসাধনার অর্থ হঠযোগের সাহায্যে নাভিপদ্মে অবস্থিত নির্মাণচক্র বা মণিপুরচক্রে বোধিচিত্ত উৎপাদন এবং তাকে ঊর্ধ্বগা করে ধর্মচক্র ও সম্ভোগচক্রের মধ্য দিয়ে উষ্ণীষ-কমলে স্থির করে মহাসুখ বা সহজশক্তি লাভ। বোধিচিত্তের দুইরূপ— সাধারণ মিলনের জৈবিক ধারার ক্ষরণে যে স্থূল আনন্দ, তা সংবৃত বোধিচিত্ত এবং ক্ষরণমুখী জৈবিক ধারাকে উজানে চালিত করে যে স্থির চরমানন্দ — তা বিবৃত বা পারমার্থিক বোধিচিত্ত নামে অভিহিত। সংবৃত বোধিচিত্ত সংবৃতি সত্য বা অনিত্য সত্যের প্রতীক। পারমর্থিক বোধিচিত্ত পরমতত্ত্বের প্রতীক। সহজিয়াদের লক্ষ্য প্রজ্ঞা ও উপায়ের মিলনে বোধিচিত্তের উৎপাদন এবং তৎপরে সংবৃত বোধিচিত্তকে পারমার্থিক বোধিচিত্তে পরিবর্তিত করা--প্রজ্ঞা ও উপায়ের মিলনে চরমানন্দ যতক্ষণ নাভিদেশস্থ প্রবৃত্তির রাজ্য মণিপুর বা নির্মাণচক্রে অবস্থিত থাকে, সাধক ততক্ষণ সংসারের দুঃখময় বন্ধন ভোগ করে। কিন্তু মূল মহাযানমতে, বোধিচিত্ত উৎপন্ন হয়ে স্বতই দশটি বোধিচিত্তভূমি অতিক্রম করে এবং শেষভূমি ধর্মমেঘে উপস্থিত হয়ে বুদ্ধত্ব লাভ করে। সহজিয়া মতে, এই আনন্দপ্রবাহ তারই অনুরূপ দশটি কায়া অতিক্রম করে শেষ পর্যায় বজ্রকায়া বা সহজকায়ায় অধিষ্ঠিত হয়। এই আনন্দ-প্রবাহের ঊর্ধ্ব থেকে ঊর্ধ্বতর চক্রে গমনের ফলে সাধকের সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর তত্ত্ব-সমূহের উপলব্ধি হতে থাকে এবং বজ্রকায়া বা সহজকায়ায় উপস্থিত হলে মহাসুখে রূপান্তরিত হয় — সেখানে সকল দ্বৈধতার অবসানে অনন্য সুখের উপলব্ধি হয়।

৪. গুহ্যসাধনায় মধ্যপথ

মহাযান বৌদ্ধধর্মের অপর বৈশিষ্ট্য বিপরীত ধর্মাদর্শের উভয়কূল পরিহার করে মধ্যপথ অবলম্বনের আদর্শ। নাগার্জুনের মাধ্যমিকবাদ ভাবস্বভাব ও অভাবস্বভাব উভয়-আদর্শের মধ্যপথ, বসুবন্ধুর অভূতপরিকল্প সর্বাস্তিবাদ ও অনাস্তিক্যবাদের মধ্যগা এবং বিজ্ঞানবাদও উক্তরূপ মধ্যপথ অবলম্বনের আদর্শ। মহাযান মতে, জীবের সর্বশেষ অবস্থা ভবও নহে বা নির্বাণও নহে — পরন্তু এমন এক অদ্বয় অবস্থা যেখানে ভব ও নির্বাণ এক হয়ে যায়। অদ্বয় ও যুগনদ্ধের পরিকল্পনাতেও এই সত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। সহজিয়া মতেও মেরুদণ্ডের উভয়পার্শ্বের নাড়ী দ্বৈত সত্যের প্রতীক — স্বতন্ত্রপথে কাজ করে তারা জীবকে দুঃখময় বন্ধনের পথে টেনে চলে — যোগসাধনায় এই উভয়ধারাকে মধ্যপথে চালনা করেই অদ্বয়সত্য বা সহজে উপনীত হতে হবে।

বোধিচিত্ত-প্রবাহকে এই মধ্য নাড়ীতে চালানই সর্বাপেক্ষা কঠিন সাধনা। চর্যাপদ, দোহাকোষ

ও অন্যান্য বৌদ্ধতন্ত্রে তাই সাধককে বারংবার গুরুর শরণাপন্ন হবার নির্দেশ রয়েছে। চর্যায় লুই-পা বলছেন — ধ্যানে দেখেছি ধমন ও চবন দুই নাড়ীকে একত্র করে তার উপর বসেছি।

ভণই লুই আম্‌হে সানে (ঝানে?) দিঠা ।
ধমণ চমণ বেণি-পিণ্ডি বইঠা ॥ (চর্যা ১)।

গুণ্ডরীপাদ বলছেন — দেহপুরে প্রাণবায়ুরূপ শাশুড়িকে রুদ্ধ করে তালা দাও এবং চন্দ্রসূর্য দুই পক্ষকে খণ্ডন কর ।

সাসু ঘরেঁ ঘালি কোঞ্চা তাল।
চান্দসুজ বেণি পখা ফাল ॥ (চর্যা ৪)।

চাটিল্লপাদ বলছেন—ভবনদী গভীর ও গম্ভীর বেগে বইছে, তার দুইদিক পঙ্কে অনুলিপ্ত। মধ্যে থই পাওয়া যায় না ; চাটিল তার উপরে এক সেতু নির্মাণ করেছেন। এই সেতুর উপর বামে-দক্ষিণে যাওয়া চলবে না ; বোধি নিকটেই আছে — দূরে যাবার আবশ্যক নেই।

ধামার্থে চাটিল সাঙ্কম গঢ়ই।
পারগামি লোঅ নিভর তারই ॥

সাঙ্কমত চড়িলে দাহিণ বাম মা হোহী।
নিঅড়ি বোহি দূর মা জাহী ॥ (চর্যা ৫)।

কাহ্নপাদ বলছেন — আলি-কালি অবধূতিমার্গ রুদ্ধ করেছে দেখে তিনি বিমনা হয়েছেন (চর্যা ৭) ; অন্যত্র বলছেন — 'এ' ও 'বং' দুইটি স্তম্ভ ভগ্ন করে তিনি সহজ-নলিনীবনে প্রবেশ করেছেন (চর্যা ৯) ; তিনি আলিকালিকে ঘণ্টানূপুর ও রবিশশীকে কর্ণকুণ্ডল করেছেন (চর্যা ১১) ; তিনি মধ্যপথের সুখতরঙ্গ অনুভব করেছেন (চর্যা ১৩)। দোহাতেও তিনি বলছেন যে, তিনি ললনা-রসনা, রবিশশী দুই নাড়ী ছিন্ন করেছেন। কম্বলাম্বরপাদ বলছেন— বাম ও দক্ষিণপথ পরিত্যাগ করে মধ্যপথের সহিত যুক্ত হয়ে অগ্রসর হলে মহাসুখ-সঙ্গমে উপস্থিত হওয়া যায়।

বামদাহিণ চাপী মিলি মিলি মাঙ্গা ।
বাটত মিলিল মহাসুহ সাঙ্গা ॥ (চর্যা ৮)।

ডোম্বীপাদ বলছেন — গঙ্গাযমুনার মধ্যে নৌকা বাহিত হয়, তাতে নিমজ্জিতা মাতঙ্গকন্যা (পাটনী = সহজসুন্দরী) যোগীন্দ্রকে লীলায় পার করে। বেয়ে চল হে ডোম্বি, শীঘ্র বেয়ে চলো, পথেই হল অনেক বেলা ; সদ্‌গুরুর পাদপ্রসাদে জিনপুরে যাব। পাঁচটি দাঁড় পড়ছে পথে ; পিঠে কাছি বেঁধে শূন্যতাপাত্রে বিষয়-সলিল তুলে ফেলে দাও — জল যেন নৌকার সন্ধিতে প্রবেশ করে না। চন্দ্রসূর্য দুইচক্র, সৃষ্টি সংহার রূপ পুলিন্দা — বাম-দক্ষিণ দৃষ্টি না করে তুমি স্বচ্ছন্দে বেয়ে চলো (চর্যা ১৪)। বীণাপাদ বলছেন — তিনি সূর্যরূপ লাউ, চন্দ্ররূপ তন্ত্রী ও অবধূতীদণ্ডে যে বীণা প্রস্তুত করেছেন, তার অনাহত-শব্দে চিত্তগজ সমরসে প্রবেশ করেছে (চর্যা ১৭)। সরহপাদ বলছেন — বামদক্ষিণে রয়েছে খাল-বিখাল, মধ্যবর্তী সহজ পন্থাই শ্রেষ্ঠ।

বাম দাহিণ জো খাল-বিখলা।
সরহ ভণই বাপা লজুবাটা ভাইলা ॥ (চর্যা ৩২)।

এইরূপে যোগসাধনায় সর্বত্র বোধিচিত্তকে মধ্যপথে চালনা করার নির্দেশ রয়েছে। কিন্তু

বোধিচিত্তকে উর্ধ্বপথে চালনা করার উপায় কি? অপানবায়ু প্রকৃতিতে নিম্নগা, প্রাণবায়ু সর্বদাই উর্ধ্বগা। যোগসাধনায় এই প্রাণ ও অপানবায়ুকে নিরুদ্ধ করে মধ্যপথে চালিত করতে হবে এবং এই প্রাণবায়ুর সহিত বোধিচিত্ত মধ্যপথে চালিত হয়ে উষ্ণীষকমলে মহাসুখ উৎপাদন করবে।

যোগের চারটি পর্যায়ে চারটি চক্রে বা পদ্মে চারটি মুদ্রার উল্লেখ দেখা যায় — কর্মমুদ্রা, ধর্মমুদ্রা, মহামুদ্রা ও সময়মুদ্রা। তা ছাড়া চারিটি মানসিক অবস্থা বা ক্ষণের কল্পনাও করা হয়েছে — বিচিত্র, বিপাক, বিমর্দ ও বিলক্ষণ। সুখেরও চারটি পর্যায় আছে — আনন্দ, পরমানন্দ, বিরমানন্দ ও সহজানন্দ। বোধিচিত্ত নির্মাণচক্রে অবস্থিত হলে আনন্দ, ধর্মচক্রে পরমানন্দ, সম্ভোগচক্রে বিরমানন্দ, এবং মহাসুখচক্রে থাকলে সহজানন্দ হয়। প্রথমে তরল আনন্দের, দ্বিতীয়ে প্রগাঢ় আনন্দের, তৃতীয়ে জাগতিক আনন্দ থেকে মুক্তির ও চতুর্থে মহাসুখের উপলব্ধি হয়।

৫. সহজসাধনা ও শক্তি

সহজিয়াদের যোগসাধনার অপর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য তাদের শক্তির কল্পনা। চর্যাপদের সর্বত্রই চণ্ডালী, ডোম্বী, শবরী, যোগিনী, নৈরামণি, সহজসুন্দরী প্রভৃতির সঙ্গে যোগীর মিলন কল্পিত হয়েছে। এই সহজসুন্দরী গুহ্যসাধনার সঙ্গে সম্পৃক্ত সত্যকার নারী নন — ইনি যোগের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন চক্রে অবস্থিতা অনুভবরূপিণী শক্তি।

হিন্দুতন্ত্রে দেহের মধ্যে শক্তির অবস্থান সর্বনিম্নচক্র মূলাধারে — সার্ধ ত্রিবলিত কুণ্ডলীর ভিতরে তিনি কুলকুণ্ডলিনী শক্তিরূপে নিদ্রিতা। এই মূলাধারে অবস্থিতা নিদ্রিতা শক্তিকে প্রথমে জাগ্রত করে, তাকে উর্ধ্ব-গা করে সহস্রারে অবস্থিত শিবের সঙ্গে মিলিত করতে হবে— এটিই তান্ত্রিক সাধনার মূল কথা। বৌদ্ধতন্ত্রে এই কুলকুণ্ডলিনী-শক্তির স্থলে সর্বনিম্নচক্র নির্মাণকায়ায় চণ্ডালীরূপে খ্যাতা অগ্নির কল্পনা করা হয়েছে। চর্যায় কাহ্নপাদ বলছেন — চৌষট্টিদল পদ্মে আরোহণ করে ডোম্বী নৃত্য করছে (চর্যা ১০)। ধামপাদ বলছেন — পদ্ম ও বজ্র মধ্যপথে মিলিত হলে নাভিপদ্মস্থিত নির্মাণচক্রে চণ্ডালী জ্বলে উঠল ; এই মহাসুখ-অগ্নিতে বিষয়ানুভূতি-গৃহ ভস্মীভূত হল এবং বোধিচিত্ত তাতে জলসেচন করল। এই সহাসুখ-অগ্নির তাপও নাই, ধূম্রও নাই — যেন সে মেরুপর্বতপথে শূন্যতা গগনে প্রবেশ করে।

কমল কুলিশ-মাঝেঁ ভইঅ মিঅলী ।
সমতাজোএঁ জলিঅ-চণ্ডালী ॥
ডাহ ডোম্বীঘরে লাগেলি আগি ।
সসহর লই সিঞ্চহুঁ পাণী ॥
নউ খর-জালা ধূম ন দিসই।
মেরু-শিখর লই গঅণ পইসই ॥ (চর্যা ৪৭)।

সাধনমালায় উক্ত হয়েছে, সহাসুখের উৎপাদনকারী মহামুদ্রা নাভিপদ্মে বাস করেন — অত্যধিক তাপহেতু তিনি অগ্নি-স্বরূপা। সম্পুটিকায় বলা হয়েছে — এই চণ্ডালী প্রজ্ঞারূপে বজ্রসত্ত্বের সহচরী এবং নৈরাত্মাদেবী অথবা বসন্ততিলক নামে খ্যাতা। যৌগিক প্রক্রিয়ায় ইনি বিদ্যুৎ-প্রভায় জ্বলে উঠে, সাধকের হৃদয়স্থিত ধর্মচক্রকে দগ্ধ করে সম্ভোগচক্রের মধ্য দিয়ে

উষ্ণীষকমলে প্রবেশ করেন এবং সর্বত্র দগ্ধ করে মহাসুখের উৎপাদন করে পুনরায় নাভিপদ্মে অবতরণ করেন। মর্মকলিকাতন্ত্রের টীকায় বলা হয়েছে — এটি ইক্ষুপিষ্ট মিষ্টরস, অরণ্যঘর্ষণজাত দাবানল, দাম্পত্যপ্রেমের যৌনমিলনসুখ, মন্থনজাত ঘৃত, ঘূর্ণনজাত মৃৎপাত্র এবং বিবিধ প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত দ্রাক্ষাসারের সঙ্গে তুলনীয়। বৌদ্ধ সহজিয়াদের এই শক্তি নিঃসন্দেহে তন্ত্রের শক্তি ও নাথযোগীদের নাভিপদ্মে অবস্থিত অগ্নির সমন্বয়ে কল্পিত।

এই চণ্ডালী, উর্ধ্ব-গমনের পথে ডোম্বী এবং মহাসুখচক্রে যোগীর সহিত মিলিত অবস্থায় সহজসুন্দরীরূপে কথিত। চর্যাপদে কণ্ঠস্থিত সম্ভোগচক্রে বা কায়ায় নৈরাত্মাদেবীর সহিত যোগীর মিলনের বর্ণনা পাওয়া যায়। শবরপাদ বলছেন — তিনি প্রভাস্বর চিত্তরূপ তাম্বুল-কর্পূর আহার করে নৈরাত্মা দেবীকে কণ্ঠে ধারণ করে প্রেমরাত্রি মহাসুখে কাটিয়েছেন (চর্যা ২৮)। কাহ্নপাদ বলছেন — পরমার্থতত্ত্বজ্ঞগণ নৈরাত্মাদেবীকে কণ্ঠ থেকে ত্যাগ করেন না (চর্যা ১৮)। শবরপাদ বলছেন — যোগীগণ সর্বদা নৈরাত্মাদেবীকে কণ্ঠে ধারণ করে জাগ্রত থাকেন (চর্যা ৫০)। গুণ্ডরীপাদ বলছেন — ত্রিনাড়ীকে চেপে নিরাভাস করে যোগিনীকে আলিঙ্গন করি। যোগিনী, তোমাকে ছাড়া একদণ্ড বাঁচব না— তোমার মুখচুম্বন করে কমলরস পান করব (চর্যা ৪)। কাহ্নপাদ বলছেন — হে ডোম্বী, নগরের বাইরে তোমার ঘর অর্থাৎ নৈরাত্মা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্যা নহেন ; যোগীগণের চপল-চিত্তকে কেবল স্পর্শ করেই তুমি চলে যাও। আমিও ঘৃণালজ্জাদিমুক্ত নগ্নযোগী হয়ে তোমার সঙ্গে মিলনের উপযুক্ত হয়েছি। তুমি চৌষট্টিদল নাভিকমলে চেপে নৃত্য কর। তুমি অবিদ্যারূপ তন্ত্রী ও বিষয়াভাসরূপ চাঙাড়ি বিক্রয় বা পরিত্যাগ কর এবং কায়ারূপ সরোবর ভেঙে মৃণালরূপ বোধিচিত্ত ভক্ষণ কর (চর্যা ১০) । বীণাপাদ বলছেন যে, তিনি সূর্য-অলাবু, চন্দ্রতন্ত্রী, ও অবধূতিদণ্ডে বীণা প্রস্তুত করে তার মধুর শব্দে নৈরাত্মাদেবীর সহিত নৃত্য করছেন (চর্যা ১৭)। কাহ্নপাদ বলছেন —হে ডোম্বী, তোমার চাতুর্য বুদ্ধির অতীত ; পাণ্ডিত্য-অভিমানী পণ্ডিতগণ বাইরে রয়েছেন — আর ভিতরে রয়েছে কাপালিক ; তুমিই অবিদ্যা-মোহিত হয়ে চন্দ্র বা বোধিচিত্তকে সংহার কর (চর্যা ১৮)। অন্যত্র বলছেন —ভব ও নির্বাণকে পটহমাদল এবং মন ও প্রাণবায়ুকে করণ্ডকবাদ্য করে তিনি ডোম্বীকে বিবাহ করতে যাচ্ছেন। বিবাহ করে তিনি জন্ম বিনষ্ট করলেন এবং যৌতুকস্বরূপ তিনি অনুত্তরধাম লাভ করলেন। অহর্নিশ সুরতপ্রসঙ্গরূপ নিত্যানন্দে কাটিয়ে অজ্ঞান-রজনীর অবসান হল (চর্যা ১৯)। কুক্কুরীপাদের চর্যায়, নৈরাত্মাদেবী বলছেন — সংসারের কোন বস্তুতে আমার আসক্তি নেই, সর্বশূন্যতা আমার স্বামীস্বরূপ, তাঁর সঙ্গে আমি অনির্বচনীয় আনন্দ লাভ করেছি (চর্যা ২০)। শবরপাদ বলছেন — মেরুদণ্ডের উচ্চ-পর্বতে শবরীবালিকা বাস করে। তার ময়ূরপুচ্ছের সজ্জা, গলায় গুঞ্জার মালা। সে অনুনয়-বিনয় করে বলছে, ওগো উন্মত্ত শবর, ওগো পাগল শবর, সব ভুল করো না, আমি তোমার ঘরেরই ঘরণী অর্থাৎ দেহেই আছি — আমার নাম সহজসুন্দরী। শবর ত্রিধাতুর খাট পেতে মহাসুখে শয্যা রচনা করল এবং নৈরামণিকে নিয়ে রাত্রি যাপন করল (চর্যা ২৮)। ভুসুকপাদ বলছেন — তিনি প্রজ্ঞারূপ পদ্মখালে শূন্যতা বা বজ্ররূপ নৌকা বাইছেন ; অদ্বয়রূপ বাঙাল তাঁর সর্বক্লেশরূপ ধন লুণ্ঠন করে নিল। নিজ পত্নীকে চণ্ডালী করে তিনিও বাঙাল হলেন — অর্থাৎ নিজে অদ্বয়জ্ঞানী হয়ে চিত্তকে প্রভাস্বর-প্রকৃতিতে পরিবর্তিত করলেন (চর্যা ৪৯)।

৬. বোধিচিত্তের শেষ-পর্যায় বা মহাসুখ

বিভিন্ন কায়ার মধ্য দিয়ে উষ্ণীষ-কমলে উপস্থিত হয়ে বোধিচিত্তের মহাসুখ উৎপাদনের কল্পনার সঙ্গে সর্বানিম্নচক্রের প্রবৃত্তির রাজ্য থেকে শক্তির সর্বোচ্চচক্রের পরমসত্যে ঊর্ধ্বগমনের কল্পনা গভীর ভাবে সম্পৃক্ত। শক্তি বজ্রকায়া বা সহজকায়ায় উপনীত হয়ে শূন্যতাস্বরূপিণী হন এবং পরিশুদ্ধ-চিত্ত বজ্রসত্ত্বে পরিণত হন — সহজকায়ায় শূন্যতা বজ্রসত্ত্বের সঙ্গে মিলিত হয়ে মহাসুখ দান করে।

সাধনার বিভিন্ন পর্যায়ে যোগিগণ কয়েকটি নিদর্শনের বা চিহ্নের কথা বলেছেন। শ্রীকালচক্রতন্ত্রে ও মর্মকলিকাতন্ত্রের টীকায় বলা হয়েছে — সাধনার প্রথম পর্যায়ে সাধকের মনে ভব-বিকল্পেরই প্রাধান্য বলে মরীচিকাকার, দ্বিতীয় পর্যায়ে এই ভববিকল্প বিনষ্ট হয়ে কোন প্রতিভাস থাকে না বলে ধূম্রাকার, তৃতীয় পর্যায়ে পূর্ণজ্ঞান ক্ষণে-ক্ষণে নিজেকে আভাসিত করে বলে খদ্যোতাকার, চতুর্থ পর্যায়ে পরিশুদ্ধজ্ঞান পূর্ণ দীপবর্তিকার ন্যায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে বলে দীপাবর্তিকাকার এবং পঞ্চম পর্যায়ে প্রভাস্বর-শূন্যতা শরৎকালের মধ্যাহ্ন-আকাশের মতো স্বচ্ছ-নির্মল হয়ে উঠে বলে গগন-সন্নিভ চিহ্ন লাভ হয়।

কিন্তু স্বরূপোলব্ধিতে সাধকের কি অবস্থা হয়? ব্যক্ত-ভাবানুগত-তত্ত্ব-সিদ্ধিতে বলা হয়েছে — এই সময়ে ইন্দ্রিয়সমূহ অন্তর্মুখে প্রত্যাবৃত, ভববিকল্প ও ভববীজ বিনষ্ট, আনন্দ-আভাময় গগনসমতুল্য শূন্য শীতল ভাবের উদয় হয়। অন্যত্র বলা হয়েছে — এই সময়ে ইন্দ্রিয়সমূহ স্বপ্নাতুর, মন অন্তর্মুখে প্রবিষ্ট এবং কায় নষ্ট-চেষ্ট সৎসুখ-মূর্ছিত হয়। চর্যাপদেও সহজানন্দের নিম্নোক্তরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। কাহ্নপাদ বলছেন — তিনি যেন মত্তহস্তীর মত চন্দ্র-সূর্য এবং অন্যান্য স্তম্ভের বন্ধন ছিন্ন করে সহজনলিনীবনে প্রবেশ করে নির্বিকল্পরূপে ক্রীড়ারত আছেন (চর্যা ৯)। মহীধরপাদ বলছেন — কায়বাক্‌চিত্তের তিনটি পাট মিলিত হল; অনাহত শব্দ ভয়ানকভাবে বাজছে; তার শব্দে যাবতীয় দুঃখময় বন্ধন ধ্বংস হল। চিত্তগজ চন্দ্রসূর্যরূপ বিকল্পস্তম্ভ ও পাপপুণ্য-শৃঙ্খল ছিন্ন করে শূন্য গগনে মহাসুখ-শিখরে প্রবেশ করল এবং ত্রিভুবনের যাবতীয় বিষয় উপেক্ষা করে পঞ্চবিষয়ের নায়কত্ব লাভ করে মহাসুখ-অনল-সন্তাপিত-দেহে শূন্যতায় প্রবেশ করল (চর্যা ১৬)। ভুসুকপাদ বলছেন — অস্তিত্ব-অনস্তিত্বরূপ দ্বৈতভাব বিনষ্ট করার জন্য করুণাস্বরূপ মেঘ প্রস্ফুরিত হল। গগনে সহজস্বরূপ উত্থিত হয়েছেন — তদ্দর্শনে ইন্দ্রিয় অভিভূত ও হৃদয় প্রভাস্বর-শূন্যতায় পূর্ণ হল। পূর্ণচন্দ্রের উদয়ে যেমন রজনীর অন্ধকার দূরীভূত হয়, বোধিচিত্তের প্রকাশে তেমনই অজ্ঞানতার অন্ধকার তিরোহিত হল এবং সহজ সুখের প্রতীতিতে সর্বভূতের অন্তর্নিহিত সত্যের প্রকাশ হল।

করুণা মেহ নিরন্তর ফরিআ।
ভাবাভাব দ্বন্দল দলিআ ॥
উইত্তা গঅণ মাঝেঁ অদভূআ।
পেখরে ভুসুকু সহজ সরূআ ॥
জাসু সুনন্তে তুটই ইন্দিআল ।
নিহুরে নিঅ মন দে উলাল ॥
বিসঅ বিশুদ্ধেঁ মই বুজ্‌ঝিঅ আনন্দে।
গঅণহ জিম উজোলি চান্দে ॥
এ তৈলোএ এত বিসারা ।
জোই ভুসুকু ফেড়ই অন্ধকারা ॥ (চর্যা ৩০)

দ্বিতীয় পর্ব

মধ্যযুগের সহজিয়া সম্প্রদায়

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বৈষ্ণব সহজিয়া ধর্ম

১ বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্মের বৈষ্ণব-সহজিয়ায় রূপান্তর

বাঙ্‌লার বৈষ্ণব-সহজিয়াধর্ম গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রভাবে বৌদ্ধ-সহজিয়া মতের এক বিশেষ রূপান্তর। বৈষ্ণব-সহজিয়া সাহিত্যের অনেক পুঁথি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বঙ্গীয় পরিষৎ গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। বৈষ্ণব পদাবলীর অনন্য বৈশিষ্ট্য তার ধর্মবোধের সঙ্গে সৌন্দর্যবোধ ও মানবীয় মূল্যবোধের অপূর্ব সমন্বয়ে। মূল বৈষ্ণবধর্মে পরকীয়া-প্রেমতত্ত্ব কেবল দার্শনিক তত্ত্বেই স্বীকৃত। কিন্তু বৈষ্ণব সহজিয়া ধর্মে তা সাধনার কার্যকরী ক্ষেত্রেও গৃহীত হয়েছে। সহজিয়াদের সাধন-প্রণালী ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবের প্রেমাদর্শ উভয়কেই উভয়ে প্রভাবান্বিত করেছে। চণ্ডীদাসের কাহিনী এখনও সত্য প্রমাণিত না হলেও, অসংখ্য কিংবদন্তী ও তাঁর ভণিতায় প্রচলিত পদাবলী থেকে অনুমান করা অন্যায় হবে না যে, চণ্ডীদাস নিজেই সহজিয়া সাধক ছিলেন এবং ব্যক্তিগত প্রেমের অনুপ্রেরণাই তাঁকে রাধাকৃষ্ণের প্রেমকাব্যের অমর কবি করেছে। অন্যদিকে শ্রীচৈতন্যের ভাবজীবনে জয়দেব-বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের প্রভাবও অনস্বীকার্য। বৈষ্ণব সহজিয়া ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের এই পরস্পর সম্পর্কের জন্যই বাঙলা বৈষ্ণব গীতিকাব্য ভাল করে বুঝতে বৈষ্ণব ও সহজিয়া ধর্ম ও সাহিত্য সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের বিশেষ প্রয়োজন।

বৈষ্ণব-সহজিয়া-পদাবলী ও সহজিয়াদের অন্যান্য গ্রন্থের রচয়িতা হিসাবে চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, রূপ, সনাতন, বৃন্দাবন দাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, নরহরি, নরোত্তম, লোচন, চৈতন্য দাস প্রভৃতির নাম পাওয়া যায়। কিন্তু শাস্ত্রবিধি-বর্হির্ভূত সহজিয়া সাধনকে প্রামাণিকতা দান করবার জন্যই অনেক ক্ষেত্রে বিখ্যাত বৈষ্ণব কবির নাম ব্যবহৃত হয়েছে। এমনকি সহজিয়াগণ জয়দেব-বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের মত বৈষ্ণব-কবি এবং রূপসনাতন-স্বরূপ দামোদর এবং জীব গোস্বামীর মত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের মুখ্যপাত্রগণকেও সহজিয়া ধর্মের প্রবর্তক বলে প্রচার করতেও কুণ্ঠিত হন নি। অনেক সহজিয়ার মতে, শ্রীচৈতন্য স্বয়ং বাসুদেব-কন্যার সঙ্গে সহজ-সাধনায় পূর্ণতা লাভ করেছিলেন — বৌদ্ধ সহজিয়াদের মতে যেমন গোপার সাহচর্যে বুদ্ধ স্বয়ং সহজ-সাধনায় অভ্যস্ত ছিলেন। চণ্ডীদাসের ভণিতায়, প্রচলিত রাগাত্মিকা পদাবলী ও অন্যান্য অনেক সহজিয়া গ্রন্থ যে খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতক ও তার পরবর্তীকালে রচিত হয়েছিল, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

পূর্বেই উক্ত হয়েছে যে, যোগের গূঢ় প্রক্রিয়াগুলি মূলত হিন্দুও নয়, বৌদ্ধও নয়— বিভিন্ন ধর্মমত ও দর্শনের পটভূমিকায় তারা বিচিত্র সাধন-প্রণালীর সৃষ্টি করেছে। মৈথুন-আনন্দকে যৌগিক প্রক্রিয়ায় নিয়ন্ত্রিত করে তুরীয়ানন্দ লাভের আদর্শ গুহ্যসাধনমার্গের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই গুহ্যযোগ শিব-শক্তি-সাধনার সংস্পর্শে হিন্দু-তান্ত্রিকতা, প্রজ্ঞা-উপায়ের সংস্পর্শে বৌদ্ধতন্ত্র ও বৌদ্ধ সহজিয়া এবং রাধাকৃষ্ণের (গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে রতি ও রস •)

সংস্পর্শে বৈষ্ণব সহজিয়া মতের সৃষ্টি করেছে। সুতরাং বৈষ্ণব সহজিয়া ধর্মের সঙ্গে বৌদ্ধ সহজিয়া মতবাদের কোন সম্পর্ক নেই, একথা বলা যায় না। বৈষ্ণব সহজিয়া সাহিত্যে হিন্দু ও বৌদ্ধতন্ত্র এবং বৌদ্ধগান ও দোহার দেহতত্ত্ব-ঘটিত সাধনার প্রত্যক্ষ পরিচয়ও দুর্লভ নয়। এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয় যে, সপ্তদশ থেকে ঊনবিংশ শতকের মধ্যে রচিত বৈষ্ণব সহজিয়া সাহিত্যে শিবশক্তির কথোপকথনের মাধ্যমে বৈষ্ণব সহজিয়া মতের গূঢ় সাধনতত্ত্বগুলি আলোচিত হয়েছে; 'আনন্দভৈরব' এ উক্ত হয়েছে যে, শিব স্বয়ং কুচনীদের দেশে বিভিন্ন শক্তির সঙ্গে এই সহজসাধন অভ্যাস করতেন।

মধ্যযুগের অন্যান্য সম্প্রদায়ের মত বৈষ্ণব সহজিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যেও বিদ্রোহের সুর সুস্পষ্ট। কিন্তু যেখানে বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্মের ভিত্তি বৌদ্ধধর্ম, বেদান্ত, তন্ত্র ও যোগের উপর, সেখানে বৈষ্ণব সহজিয়া মতের ভিত্তি তন্ত্র, যোগ ও প্রেমের আদর্শে স্থাপিত হয়েছে। এই দেহভাণ্ডেই ব্রহ্মাণ্ড নিহিত — তন্ত্র ও যোগের এই তত্ত্বকেই বৈষ্ণব সহজিয়াগণ আরো একটু ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করে বলেছেন, 'শুনহ মানুষ ভাই. সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।' বৌদ্ধ সহজিয়া গুরুবাদের আদর্শও বৈষ্ণব-সহজিয়াগণ গ্রহণ করেছেন। তা ছাড়া গুহ্য সাধনা-বর্ণনায় প্রহেলিকা এবং উল্টারীতির ব্যবহার করে তাঁরাও গুহ্য-সাধন-সঙ্কেত প্রচ্ছন্ন রাখতেই চেষ্টা করেছেন। সুতরাং বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব সহজিয়াগণ ধর্মমতে ও সাহিত্যের আঙ্গিকের ব্যবহারে সর্বত্রই একই আদর্শের অনুসরণ করেছেন বলা যায়।

বাঙলাদেশে পালরাজত্বের অবসানের সঙ্গে-সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের পতন এবং সেন-রাজত্বের পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দু-জাগরণের সূচনা হয়। রাধাকৃষ্ণ-প্রেম-কাহিনীমূলক বৈষ্ণবধর্ম সেন-রাজত্বের প্রারম্ভেই সমাদর লাভ করতে থাকে। খ্রীঃ দ্বাদশ শতকের শেষার্ধে বাংলার প্রথম বৈষ্ণবকবি জয়দেব লক্ষ্মণসেনের সভাকবি ছিলেন। চতুর্দশ শতকে বাঙলার কবি চণ্ডীদাস ও মৈথিল কবি বিদ্যাপতির পদাবলী রাধাকৃষ্ণ-প্রেমের অলৌকিক মহিমা প্রতিষ্ঠিত করে। রাধাকৃষ্ণ-কাব্যের এই নূতন আদর্শ ধীরে-ধীরে বৌদ্ধ-সহজিয়ামতের অভ্যন্তরেও এক পরিবর্তনের সূচনা করে।

প্রেমের এই আদর্শ জনচিত্তে প্রভাব বিস্তার করার সঙ্গে-সঙ্গে পরকীয়া রতির শ্রেষ্ঠত্ব সর্বত্র স্বীকৃত হয় এবং চৈতন্য-পরবর্তী সমস্ত বৈষ্ণব সাহিত্যেই স্বকীয়া ও পরকীয়ার আলোচনা একটি মুখ্য স্থান লাভ করেছে। অষ্টাদশ শতকেও গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে স্বকীয়া ও পরকীয়াতত্ত্বের বিচার-সভা আহূত হতে এবং স্বকীয়ার সমর্থকদের পরাজয় বরণ করতে দেখা যায়। বাঙলার সহজিয়া বৈষ্ণব-সাহিত্যের ইতিহাসে এই পরকীয়া প্রেমের প্রভাব অত্যন্ত ব্যাপক।

২. পরিবর্তনের ধারা

এখন আমরা বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির বৈষ্ণব সহজিয়া-মতে রূপান্তরের সূত্রগুলি অনুসন্ধানের চেষ্টা করব। বৌদ্ধ সহজিয়াদের চরম লক্ষ্য শূন্যতা, প্রজ্ঞা, বোধিচিত্ত বা মহাসুখের আদর্শ। মূল বৌদ্ধধর্মে নির্বাণের আদর্শ অভাবাত্মক, কিন্তু মহাসুখ ভাবস্বভাব। অন্যান্য যোগপন্থীদের লক্ষ্যের সঙ্গে এর পার্থক্য এই যে, এটি চিত্তবৃত্তির নিরুদ্ধ অবস্থা থেকে সঞ্জাত—কিন্তু সম্পূর্ণরূপে একটা বিলয়ের অবস্থা নয়। বৌদ্ধ সহজিয়া-মতের লক্ষ্য সহজরূপ মহাসুখ, কিন্তু বৈষ্ণব সহজিয়া মতের লক্ষ্য সহজরূপ প্রেম। এই পরমপ্রেম সমগ্র সৃষ্টি-প্রবাহের

গুহাহিত সনাতন তত্ত্ব। এটিই হিন্দুতন্ত্রের শিবশক্তির অদ্বয়রূপ। বৌদ্ধ সহজিয়া মতেও এটি পরমতত্ত্বের দ্বিধাবিভক্ত প্রজ্ঞা-উপায়ের অদ্বয়রূপ। এই দুইরূপ ব্যবহারিক জগতে পুরুষ ও নারীর মধ্যে প্রকাশিত — সত্যকার সাধক অন্তর্দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করেন এই স্থূলরূপের অন্তর্নিহিত সত্যকে। এইরূপে স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত নরনারী যোগের পথে মিলনের দ্বারা স্থূল ভোগানন্দকে উর্ধ্বে টেনে নেন শিবশক্তি বা প্রজ্ঞা-উপায়ের যোগানন্দরূপে — এই যোগানন্দই সাধককে পৌঁছিয়ে দেয় অদ্বয়-স্বরূপে। বৈষ্ণব সহজিয়াগণ রাধাকৃষ্ণের মিলনকে অনুরূপ ভাবেই গ্রহণ করেছেন। তাঁদের মতে, সকল নরনারীই রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্বের বহিঃপ্রকাশ এবং তাদের প্রেমের পূর্ণতাই সহজের পরমস্বরূপ।

কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবে বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্ম থেকে গৃহীত বৈষ্ণব সহজিয়াদের মৈথুন-সাধনাও একটি অপরূপ মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্ব ব্যাখ্যা লাভ করেছে। বৌদ্ধ সহজিয়া মতে, মৈথুন-সাধনায় চরমতম অনুভূতির মুহূর্তে মনের উপর বহির্জগতের ক্রিয়া লুপ্ত হলে যে-অনন্য সুখাবস্থা লাভ হয় — তাই সহজানন্দ বা সহজোপলব্ধি। বৈষ্ণব সহজিয়াগণ আমাদের এই মরদেহকে অনন্ত প্রেমস্বর্গের আলোকে তুলে ধরে ঐশী প্রেমের আলোকে মানবীয় প্রেমকে ও মানব-প্রেমে ঐশী-প্রেমকে উদ্ভাসিত করে তুলেছেন। এইরূপে বৌদ্ধ সহজিয়া সম্প্রদায়ের দেহযোগকে বর্জন করে তাঁরা ধর্মতত্ত্বকে ক্রমে সম্পূর্ণ মনস্তাত্ত্বিক-ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করেছেন।

৩. বৈষ্ণব সহজিয়া সাধনায় মনস্তাত্ত্বিক উপাদান

[ক] প্রেমের আদর্শ ॥ বৈষ্ণব সহজিয়াদের মনস্তাত্ত্বিক কল্পলোক গড়ে উঠেছিল রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব ও তাঁদের অপ্রাকৃত বৃন্দাবনে নিত্যপ্রেমের কল্পনাকে অবলম্বন করে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম ও দর্শনে পরমপুরুষের দুইটি রূপ — নির্গুণ ব্রহ্ম বা সক্রিয় সগুণ ভগবান। সবিশেষ ভগবানের তিনটি শক্তি (১) পরমস্বরূপে তিনি যে-শক্তির অধিকারী তা স্বরূপ-শক্তি, (২) সর্ব জীব তাঁর যে-শক্তিতে জাত ও সংস্থিত তা জীবশক্তি বা তটস্থাশক্তি এবং (৩) এই জড়-জগৎ যে-শক্তি থেকে উৎপন্ন তাই মায়াশক্তি। ভগবান স্বরূপে সচ্চিদানন্দ — তাঁর সত্তা, চৈতন্য এবং আনন্দ বিধৃত তাঁর স্বরূপ-শক্তির দ্বারা। এই সত্তা, চৈতন্য এবং আনন্দকে অবলম্বন করে তাঁর স্বরূপ-শক্তি ত্রিবিধ — সন্ধিনী, সংবিৎ ও হ্লাদিনী। শ্রীরাধা ভগবানের এই হ্লাদিনী শক্তির বিকাশ — সুতরাং তিনি মূলপ্রকৃতি, ঈশ্বরী এবং শ্রীকৃষ্ণের অর্ধাংশস্বরূপা। ভগবান একাধারে ভোক্তা ও ভোগ্য, কিন্তু 'তস্মাৎ একাকী ন রমতে' — তিনি একাকী রমণ করেন না — সেজন্য দ্বৈত ইচ্ছা করে আপনাকে দ্বিধাবিভক্ত করে 'লীলারস আস্বাদিতে ধরি দুইরূপ' আপনারই প্রেমরসের আস্বাদন করলেন। এই অচ্ছেদ্য সম্পর্কের মধ্য দিয়ে রাধা তাঁর সমগ্র সত্তার মাধুর্য এবং শ্রীকৃষ্ণ আপনার অন্তর্নিহিত প্রেমঘন স্বরূপের আস্বাদন লাভ করলেন। নিত্য বৃন্দাবনকুঞ্জে রাধাকৃষ্ণের এই প্রেমলীলার অভিনয়ও নিত্য।

বৈষ্ণব-দর্শন এই নিত্য প্রেমের কল্পনায় প্রমাণিত করেছে যে, এই ঐশী প্রেমের মাধুর্য একমাত্র মানবের পরকীয়া প্রেমের অহৈতুক অনুরাগের সঙ্গে উপমিত হতে পারে । নরনারী যে-অন্তরঙ্গ অনুরাগবশে ইহলোক-পরলোক উপেক্ষা করে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়, বিবাহাদি বহিরঙ্গ লৌকিক ধর্মের অপেক্ষা রাখে না — তাই-ই পরকীয়া প্রেম । বিবাহোত্তর প্রেমে 'অতিপরিচয়াৎ অবজ্ঞা — অনাদরোঽপি'। 'যেখানে বহু বারণ, যেখানে বাধ্য হয়ে প্রচ্ছন্ন

কামসেবা, যেখানে নায়কের পক্ষে নায়িকা এবং নায়িকার পক্ষে নায়ক দুর্লভ, সেইখানেই কামের পরাকাষ্ঠা'। যা সহজ-প্রাপ্য নয়, তাতেই মানবের আকাঙ্ক্ষা। আবার বিবাহিত প্রেমে নিরবচ্ছিন্ন মিলন — বিরহ নেই — 'পর না হইলে নহে ভাবের উদয়, বিচ্ছেদের ভয়ে আর্তি অনুরাগ হয়।' পরকীয়া-প্রেমের এই নিবিড়তার জন্যই শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া ভার্যা নন — আয়ানের ঘরণীরূপে কল্পিতা হয়েছেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মতে, চৈতন্যলীলায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং রাধার হৃদয়ে নিজ-প্রেমের অনুভূতি কেমন তা জানবার জন্য 'রাধিকার ভাবকান্তি করি অঙ্গীকার', নিজরূপ আস্বাদিতে অবতার রূপ গ্রহণ করেছিলেন। সুতরাং শ্রীচৈতন্য 'রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত-তনু' স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। মর্ত্যজগতে শ্রীচৈতন্য রাধাভাবের যে-মাধুর্য তাঁর অশ্রু-বিগলিত প্রেমতন্ময়তায় উদ্ভাসিত করেছেন, তা দয়িতের জন্য দয়িতার — ঈশ্বরের জন্য জীবের অহৈতুক অনুরাগেরই প্রকাশ।

সখীভাবই গৌড়ীয় বৈষ্ণব কবিদের সাধনার আদর্শ ছিল। শ্রীচৈতন্য রাধাভাবে ভাবিত হয়ে শ্যামসুন্দরের অনুধ্যানে উদ্‌গতাশ্রু হয়েছেন। কিন্তু জয়দেব-বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিগণ কৃষ্ণের সহিত মিলনের আকাঙ্ক্ষা করেন নি — তাঁরা অনন্তকাল সখীভাবে অপ্রাকৃত বৃন্দাবনের এককোণে দাঁড়িয়ে রাধাকৃষ্ণের শাশ্বত প্রেমলীলা প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছেন। গীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোকেই জয়দেবের এই আন্তরিক ইচ্ছা ব্যক্ত হয়েছে — 'রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি যমুনাকূলে রহঃ কেলয়ঃ'। এই প্রার্থনা শুধু জয়দেবেরই নয়, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসেরও — এই ইচ্ছা সকল বৈষ্ণব কবির।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে রায় রামানন্দ ও মহাপ্রভুর আলোচনায় ব্যক্ত হয়েছে যে, কৃষ্ণের তটস্থাশক্তি জীবের পক্ষে তাঁর স্বরূপ-শক্তির মধ্যে প্রবেশ করে পুরুষাভিমান ত্যাগ করে সখীভাবে উপাসনার পথই শ্রেয়।

নিত্যবৃন্দাবনে শ্রীভগবান অনন্তকাল নিজেকে নিজে আস্বাদন করছেন— 'শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার হয়েন প্রাণপতি, রাধাসনে নিত্যলীলা করেন দিবারাত্রি।' অথবা 'রাধাকৃষ্ণ রসপ্রেম একই সে হয়, নিত্য নিত্য ধ্বংস নাই নিত্য বিরাজয়' এবং 'নিত্যলীলা কৃষ্ণের নাহিক পারাপার, অবিশ্রাম বহে লীলা যেন গঙ্গাধার।' জীবের নিকট এই অপ্রাকৃত বৃন্দাবনের পরিচয় দেবার জন্যই মর্ত্য-বৃন্দাবনে গোপবালক ও গোপবালিকার বেশে একদা রাধাকৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েছিলেন। বৈষ্ণব কবিগণ ঐতিহাসিক রাধাকৃষ্ণের প্রেমহার-রচনার অবসরে অধ্যাত্ম-জীবনের পরম-পুরুষার্থ সেই অপ্রাকৃত লীলারও আভাস পেয়েছেন।

চৈতন্যচরিতামৃত বর্ণিত বৈষ্ণব-দর্শনের সহিত চৈতন্য-পরবর্তী বৈষ্ণব কবিদের মতের কিছু পার্থক্য আছে। বৈষ্ণব সহজিয়াগণ রাধাকৃষ্ণের নিত্যলীলা এবং প্রাকৃত বৃন্দাবনলীলা ছাড়াও বিশ্বাস করতেন, প্রত্যেক নরের মধ্যে কৃষ্ণের এবং প্রত্যেক নারীর মধ্যে রাধার স্বরূপশক্তি রয়েছে— প্রত্যেক নরনারীর মধ্যে রাধাকৃষ্ণ সর্ববীজ ও সর্বস্ত্রীরূপধারিণী হয়ে নিত্যলীলায় অবতীর্ণ হয়েছেন। রাধাকৃষ্ণের এই স্বরূপলীলা ও রূপলীলা অপ্রাকৃত ও প্রাকৃত লীলারূপেও অভিহিত। এটিও সম্ভবত তন্ত্রের প্রভাবপ্রসূত। হিন্দুতন্ত্রে নরনারীর মধ্যে শিব ও শক্তিতত্ত্ব এবং বৌদ্ধতন্ত্রে প্রজ্ঞা ও উপায়তত্ত্ব নিহিত। পূর্বেই কথিত হয়েছে, অনেক বৈষ্ণব সহজিয়া-গ্রন্থে রধাকৃষ্ণকে শিবশক্তির সহিত অভিন্ন কল্পনা করে শক্তির সঙ্গে শিবের সহজ সাধনার ইঙ্গিত আছে। বৈষ্ণবদের প্রিয় গ্রন্থ স্বয়ং শ্রীচৈতন্য-কর্তৃক দাক্ষিণাত্য থেকে আনীত 'ব্রহ্ম সংহিতা'র মধ্যেই তান্ত্রিকতার চিহ্ন রয়েছে। তাতে লিঙ্গস্বরূপ শিব ও যোনিস্বরূপা শক্তি

যথাক্রমে নারায়ণ ও রমাদেবী বলে অভিহিত এবং সহস্রদল উষ্ণীষ-কমলের গোকুলে কৃষ্ণের আবাস বলা হয়েছে। শ্রীহয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে উক্ত হয়েছে — পরমাত্মা হরিই প্রভু, শ্রী তাঁর শক্তি ; শ্রীদেবীই প্রকৃতি এবং কেশবই পুরুষ। বিষ্ণুপুরাণেও আছে — জগন্মাতা নিত্য ও বিষ্ণুর সঙ্গে অচ্ছেদ্য এবং বিষ্ণুর মতই সর্বগা। উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে কমলাকান্ত-রচিত 'সাধক-রঞ্জন'-এ যৌগিক কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে রাধার সঙ্গে অভিন্নভাবে গ্রহণ করে বৈষ্ণব-সাহিত্যের অনুরূপ ভাবে ও ভাষায় সহস্রারে অবস্থিত শিবের জন্য শক্তির অভিসার বর্ণনা করা হয়েছে। এইরূপ লোক-বিশ্বাসে রাধাকৃষ্ণ, শিবশক্তি ও পুরুষ-প্রকৃতির কল্পনা মিশে একাকার হয়ে গেছে। এই লৌকিক ধর্মবিশ্বাসই বৈষ্ণব সহিজয়াধর্মে নরনারীর মধ্যে রাধাকৃষ্ণের 'রূপ'-কল্পনার জন্য অংশত দায়ী। এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখতে হবে যে, মূল বৈষ্ণবমতে কোন ক্ষেত্রেই রাধাকৃষ্ণের এই নর-নারী রূপে 'রূপ'-কল্পনা প্রশ্রয় পায় নি।

বৈষ্ণব সহজিয়াদের মতে, সহজের আবাস এক আদর্শ বিশ্বাতিগ-ভূমি — নিত্যের দেশ — এটিই নিত্য বৃন্দাবন। তাঁরা আরো দুইটি বৃন্দাবনের কল্পনা করেছেন — (১) সাধকের যে-মনোভূমিতে সহজ বাস করে, তা মনবৃন্দাবন ; (২) ভৌগোলিক বৃন্দাবন বা নব বৃন্দাবন বা বন বৃন্দাবন। নিত্য বৃন্দাবনে (গুপ্ত চন্দ্রপুর) শুদ্ধ প্রেমময় সহজ বাস করে। এই 'রস বই বস্তু নাই, এ তিন ভুবনে'। এই ভূতজগতে তবে তার স্বরূপ অবগত হবার উপায় কি ? অধ্যাত্ম সাধনা ও অজ্ঞানতার বিনাশে এই বাহ্য জগৎ নিত্য বৃন্দাবনে রূপান্তরিত হয় এবং 'এদেশে-ওদেশে' পার্থক্য-বোধ লুপ্ত হয় —'শ্রীরূপ স্বরূপ হয়, স্বরূপ শ্রীরূপ'। চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত একটি পদে আছে — 'এদেশে সে দেশে অনেক অন্তর জানয়ে সকল লোকে। সে দেশে এদেশে মেশামেশি আছে, একথা কইও না কাকে ॥'

নিত্য বৃন্দবনে শুদ্ধপ্রেমময় সহজের দুইটি ধারা — রাধাকৃষ্ণরূপ ভোক্তা ও ভোগ্যের ধারা। সহজ মতে, এই দুইরূপ ভূতজগতে নরনারীর মধ্যে প্রবাহিত — 'পরমাত্মার দুইনাম ধরে দুইরূপ। এইমতে এক হয়্যা ধরয়ে স্বরূপ ॥ তাহে দুইভেদ হয় পুরুষ প্রকৃতি'। চণ্ডীদাসের ভণিতায় একটি পদে আছে — 'প্রেম সরোবরে দুটি ধারা, আস্বাদন করে রসিক যারা। দুই ধারা যখন একত্রে থাকে, তখন রসিক যুগল দেখে ॥" ব্যবহারিক জগতে নরনারীর মধ্যে এমনকি তাদের দৈহিক মিলনেও প্রেমের এই দুইটি ধারা (যা একমাত্র বৃন্দাবনেরই বস্তু) — নিম্নতর গ্রামে প্রবাহিত। সহজিয়া-সাহিত্যে এই দুইধারা, রস (ভোক্তার চরমানন্দ) ও রতি (রসবস্তু)— অথবা কাম (দয়িতাকে আকর্ষণকারী দয়িত) ও মদন (দয়িতের আকর্ষণের কারণ) নামেও অভিহিত। 'পরস্পর নায়ক-নায়িকা অনঙ্গ-রতি, স্বতঃসিদ্ধ ভাবে হয় ব্রজেতে বসতি'। মূল বৈষ্ণব ধর্মেও কৃষ্ণ ও রাধা কাম ও মদনরূপে কথিত। ব্যবহারিক জগতে স্বরূপ বিস্মৃত হয়ে নরনারীর মিলন চলছে প্রবৃত্তির পথে। সেজন্য নরনারীকে অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে তাদের স্থূল-রূপের ভিতরকার রসরতি-স্বরূপকে অনুভব করতে হবে (সহজিয়ামতে এর নাম 'আরোপ')। এইরূপে স্বরূপ-প্রতিষ্ঠিত নরনারীর পারস্পরিক প্রেম তুচ্ছ ইন্দ্রিয়ার্থের ঊর্ধ্বে উঠে ঐশী ভাবাপন্ন হয় — প্রেমের এই উপলব্ধিই সহজোপলব্ধি।

[খ] আরোপ-তত্ত্ব ॥ আরোপ-তত্ত্বই সহজিয়া বৈষ্ণবধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য। বলা হয়েছে— 'ছাড়ি জপতপ সাধহ আরোপ একতা করিয়া মনে'। পূর্বেই সহজিয়া সাধনে নরনারীর দুই প্রকার অস্তিত্ব 'রূপ ও স্বরূপ'-এর কথা বলা হয়েছে। সহজিয়া মতে, 'স্বরূপে আরোপ যার রসিক নাগর তার প্রাপ্তি হবে মদনমোহন'। কিন্তু রূপের এই স্বরূপে আরোপ অর্থে রূপকে

অস্বীকার করা নয়। সহজিয়াগণ এই মরদেহ ও মানুষী প্রেমকে কখনও তুচ্ছ করে দেখেন নি — পরন্তু স্বীকার করেছেন যে, এই দেহ-সৌন্দর্য ও প্রেমমাধুর্যই মরমানুষের চোখে ঐশী প্রেমের মোহাঞ্জন বুলিয়ে তাকে শাশ্বত প্রেমের আলোকে তুলে ধরে। মানবের এই বৃত্তি-সমূহ ঈশ্বর থেকেই আগত — জলদগ্নি থেকে বিস্ফুলিঙ্গের মতো স্বরূপ-অগ্নি থেকেই রূপ-স্ফুলিঙ্গ বিনির্গত হয়েছে। সুতরাং এই বৃত্তি-সমূহেরই সমধিক উন্নতির দ্বারা স্বরূপে পৌছান যায়—মানবের এই দেহই প্রেমস্বর্গ-যাত্রিকের পুণ্যতীর্থ-স্বরূপ। কামপঙ্কলীন এই মানুষী-প্রেমই অমর্ত-আলোকের অভিমুখে সহস্রদল বিস্তার করেছে। এখানেও বৈষ্ণব সহজিয়া ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মত-বৈষম্য লক্ষণীয়। চৈতন্যচরিতামৃতে কবিরাজ গোস্বামী স্পষ্টতই বলেছেন, কাম ও প্রেমের পার্থক্য লৌহ ও স্বর্ণের ন্যায় — 'আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম। কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম।' কিন্তু সহজিয়া মতে, প্রেম কামেরই বিশুদ্ধরূপ, কামের মধ্যেই প্রেমের মূল — 'কাম হৈতে জন্মে প্রেম, নহে কামসঙ্গ..... তৈছে কাম হৈতে প্রেম দেখ বিচারিয়া।' সহজিয়া মতে, কাম-ভিন্ন অথবা কামের উচ্ছেদে প্রেম সম্ভব নয় — কামকেই প্রেমে রূপান্তরিত করতে হবে। তাঁদের প্রেম ঈশ্বরের প্রতি ভক্তির আকুলতা নয় — স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত নরনারীর পরস্পরের জন্য প্রেম-ব্যাকুলতা। সেজন্যই চণ্ডীদাস বলেছেন — 'শুনহ মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।' অন্যত্র বলা হয়েছে — 'মানুষ দেবের সার, যার প্রেম জগতে প্রচার। জগতের শ্রেষ্ঠ মানুষ যারে বলি, প্রেম-প্রীতি-রসে মানুষ করে কেলি ॥' বৈষ্ণব সহজিয়া মতে, দেবদেবী নেই ; এমনকি রাধাকৃষ্ণও তাঁদের উপাস্য দেবতা নন — মানবতার মধ্যে নিহিত তত্ত্বমাত্র। তাই সহজিয়া মতে, মানুষই সবার উপরে।

তবে সহজিয়াদের আরোপের অর্থ কি? এটি মানুষের মধ্যে দৈহিক জৈবিক, মনস্তাত্ত্বিক— সর্বতত্ত্বের মধ্যেই পরমতত্ত্বের সন্ধান-প্রচেষ্টা। মানুষের দেহমনের সর্বপ্রকার স্থূল সত্যের মধ্যে শাশ্বত সত্যের আবিষ্কারে রূপস্বরূপের ভেদ বিলুপ্ত হয় — 'রূপেতে স্বরূপে দুই একু করি মিশুল করিয়া থুবে।' অন্যত্র আছে — 'স্বরূপ স্বরূপ অনেকে কয়, জীবলোক কভু স্বরূপ নয়।...পদ্মগন্ধ হয় তাহার গতি, তাহাকে চিনিতে কার শকতি।....স্বরূপ ভজিলে মানুষ পাবে, আরোপ ছাড়িলে নরকে যাবে।' রূপের মধ্যেই স্বরূপ নিহিত — রূপের মধ্য দিয়েই স্বরূপে যেতে হবে। রত্নসারে বলা হয়েছে — 'মানুষ বিগ্রহ ভজি ব্রজ প্রাপ্তি হবে।' প্রিয়তমার প্রেমশিখাতেই অন্তরের আলোক প্রজ্জ্বলিত হয়। চণ্ডীদাসের একটি পদে আছে — 'আপন অন্তর দেখিতে না পাই সদাই অন্তর জ্বলে।...মানুষ অভাবে মন মরীচিকা, তরাসে আছাড় খায়। আছাড় খাইয়া করে ছট্‌ফট্ জিয়ন্তে মরিয়া যায়।' এই প্রেমই ঐশী প্রেমে রূপান্তরিত হয় — 'সেই দেহরতি যায়্যা কৃষ্ণেতে বর্তয়, ক্রমে-ক্রমে রতি ষোলআনা হয়।' সহজিয়া মতে, প্রেমিকাই প্রেমের গুরু। তাই বলা হয়েছে — 'অগ্নিকুণ্ড বিনে নহে দুগ্ধ আর্বতন।...প্রকৃতির সঙ্গে এই অগ্নিকুণ্ড আছে। অতএব গোস্বামীরা তাহা যাচিয়াছে ।'

[গ] সহজ সাধনার দুষ্করতা ॥ বৈষ্ণব-সহজিয়া সাধনায় আরোপহীন প্রেম নরকেই পরিচালিত করে — 'যদি মন চড়ে আরোপ ছাড়ি, এ-ঘোর নরকে রহিবে পড়ি।' লোভ-আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি নিম্নতর প্রবৃত্তি-জর্জরিত সামান্য মানুষ বা রাগের মানুষের দ্বারা এটি সম্ভব নয় — তাকে জৈবিক সত্তার উর্ধ্বে উঠে, 'অযোনি' মানুষ ('নিত্যের মানুষ') হতে হবে। তেমনি সাধারণ নারী বা সামান্যা রতির পক্ষেও সহজলাভ অসম্ভব — তারও রাধাস্বরূপ

বিশেষ-রতি হওয়া প্রয়োজন। প্রেমের তপস্যায় নারীর চক্ষে পুরুষ রস বা কৃষ্ণ-স্বরূপ নিত্যমানুষ এবং নরের চক্ষে নারী রতি বা রাধাস্বরূপ শাশ্বত নারী। রূপগোস্বামীর 'উজ্জ্বলনীলমণি'তে তিনপ্রকার রতির বর্ণনা আছে — সমর্থা, সমঞ্জসা ও সাধারণী। যে-নারীর প্রেমে আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা নেই, প্রেমিকের নিকট সম্পূর্ণ আত্মনিবেদনেই যাঁর একমাত্র সুখ, তিনিই সমর্থা রতি — শ্রীকৃষ্ণের প্রেমিকাগণের মধ্যে একমাত্র রাধাই সমর্থা রতি। যিনি প্রেমের আনন্দকে দয়িতের সঙ্গে সমভাগে বন্টন করে নেন, তিনিই সমঞ্জসা — দৃষ্টান্ত, রুক্মিনী-প্রমুখ কৃষ্ণরমণীগণ। সাধারণী-রতির আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা কাম্য — যেমন কুব্জা। সহজিয়াগণ এই রতিবিভাগকে গ্রহণ করে, প্রেমের তপস্যায় একমাত্র সমর্থারতির শ্রেষ্ঠত্বই স্বীকার করেছেন।

সহজিয়াগণ তাঁদের প্রেম-সাধনার পথকে কঠিন কৃচ্ছ্রতার মধ্যে প্রসারিত করেছেন। তাঁদের মতে, প্রকৃত প্রেম লাভ করতে হলে ইন্দ্রিয়ার্থের নিম্নতর গ্রামে সম্পূর্ণ মৃত হয়ে পুরুষকে নারীভাবে ভাবিত হতে হবে। এখানেও নারীর প্রতি পুরুষের স্বাভাবিক ভাবের রূপান্তরের কথা রয়েছে। তাই অসংখ্য প্রহেলিকাময় পদে এ পথের পথিকের উদ্দেশে সতর্কতা-জ্ঞাপন করা হয়েছে — 'কলঙ্ক সাগরে সিনান করিবি এলাইয়া মাথার কেশ। নীরে না ভিজিবে জল না ছুইবি সম দুখ-সুখ-ক্লেশ।'....'সাপের মুখেতে ভেকেরে নাচাবি, তবে তো রসিকরাজ। যে জন চতুর সুমেরু শিখর সুতায় গাঁথিয়া পরে। মাকসার জালে মাতঙ্গ বান্ধিলে এ রস মিলয়ে তারে॥'

সহজ সাধনার জন্য দেহমনের কঠিন শৃঙ্খলার আবশ্যক। এই দুরূহতার জন্য সহজসাধনায় প্রবর্ত, সাধক ও সিদ্ধ — এ তিন পর্যায় এবং তার সঙ্গে সম্পৃক্ত নাম, মন্ত্র, ভাব, প্রেম ও রস—এই পঞ্চ আশ্রয়ের কল্পনা করা হয়েছে। নাম ও মন্ত্র প্রবর্ত-পর্যায়ের, ভাব সাধক পর্যায়ের এবং প্রেম ও রস সিদ্ধ-পর্যায়ের আশ্রয়। সাধক পর্যায় থেকেই সাধনায় নারীসঙ্গ গ্রহণ করা উচিত এবং একমাত্র সিদ্ধ পর্যায়েই প্রকৃত প্রেমের উপলব্ধি সম্ভব। সহজোপলব্ধির জন্য দেহ-মন উভয়েরই পরিপক্কতা প্রয়োজন। কারণ 'অপক্ক দেহেতে এ কাম সাধিলে ই-কূল উ-কূল যায়। বামন হইয়া বাহু পসারিয়া চাঁদ ধরিবারে চায়।' দেহের এই পরিপক্কতার জন্য বৌদ্ধ সহজিয়া মতের মতো বৈষ্ণব সহজিয়া মতেও 'কায়-সাধনা'র উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

পূর্বেই উক্ত হয়েছে, সকল গুহ্যযোগসাধনায় দেহই সকল-সত্যের মন্দির। চণ্ডীদাসের একটি পদে আছে—'বস্তু আছে দেহ বর্তমানে'। ভাণ্ড-সত্যের উপলব্ধি থেকেই ব্রহ্মাণ্ড-সত্যের উপলব্ধি হয়—'ভাণ্ডকে জানিলে জানি ব্রহ্মাণ্ডের তত্ত্ব।' রাধাকৃষ্ণের সমস্ত তত্ত্ব সহজরূপ দেহের মধ্যেই বিভিন্ন পদ্মে বিরাজমান।

বৈষ্ণব সহজিয়াদের মনস্তাত্ত্বিক আদর্শ তান্ত্রিক ও বৌদ্ধ সহজিয়াদের দেহতত্ত্বমূলক যোগসাধনা থেকেই আগত — সেজন্য তার মধ্যে যোগেরও প্রভাব আছে। যোগের গুহ্যতত্ত্বে অধিকার না থাকলে দেহযোগসাধনার প্রচেষ্টা যেমন মারাত্মক, প্রেমসাধনার জন্যও তেমনি দেহমনে সম্পূর্ণ পরিশুদ্ধ হয়ে বিশুদ্ধসত্ত্ব হতে হবে — প্রথমে তম-রজ-মুক্ত হয়ে সত্ত্বকে ক্রমে শুদ্ধসত্ত্বে এবং তৎপরে বিশুদ্ধসত্ত্বে পরিণত করতে হবে। এই অবস্থা প্রাকৃত-অপ্রাকৃতের ঊর্ধ্বে — 'সত্ত্বরজতমোপরে শুদ্ধসত্ত্ব নাম তৎপরে বিশুদ্ধসত্ত্ব প্রেমের আখ্যান। প্রাকৃত-অপ্রাকৃত তাকে কহিতে না পারি।'

প্রেম-স্বরূপের প্রতীতির জন্য প্রেমিক-প্রেমিকাকে দৈহিক-মানসিক-আধ্যাত্মিক একাত্মতা

লাভ করে দেহমন-আত্মার দ্বৈতসত্তা এক প্রেমস্রোতে মিলিত করতে হবে। এই প্রেমের স্বরূপ-লক্ষণ — 'পীরিতি উপরে পীরিতি বৈসয়ে, তাহার উপরে ভাব। ভাবের উপরে ভাবের বসতি, তাহার উপরে লাভ ॥ প্রেমের মাঝারে পুলকের স্থান, পুলক উপরে ধারা। ধারার উপরে ধারার বসতি. এ সুখ বুঝয়ে কারা ॥' এবং 'মৃত্তিকা উপরে জলের বসতি, তাহার উপরে ঢেউ। তাহার উপরে পীরিতি বসতি, তাহা কি জানয়ে কেউ ॥' চণ্ডীদাসও বলেছেন — 'রজকিনী প্রেম নিকষিত হেম, কামগন্ধ নাহি তায়।'

এইরূপ অসংখ্য বিরোধ ও অর্থান্তরন্যাস অলঙ্কারের ব্যবহারে সহজিয়া সাধনায় ভোগানন্দ থেকে আত্মানন্দে মগ্ন হবার আকাঙক্ষা ব্যক্ত হয়েছে। হৃদয়ে প্রকৃত প্রেমের উদয় হলে সাধকের চক্ষে প্রিয়তমা অনন্ত প্রেমের প্রতীক-রূপে প্রতীত হয় এবং সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড তার অনন্ত বৈচিত্র্য ও রহস্য নিয়ে তার দেহে আবির্ভূত হয় — এক কথায়, প্রিয়তমাই পরম সত্যের প্রতীক হয়ে দেখা দেয়। চণ্ডীদাসও তাঁর সাধন-সঙ্গিনী রামীর উদ্দেশে বলেছেন— 'শুন রজকিনী রামী, ও দুটি চরণ শীতল জানিয়া শরণ লইনু আমি। তুমি বেদমাতা হরের ঘরণী, তুমি নয়নের মণি ॥'

[ঘ] আত্ম ও অনাত্ম সহজজ্ঞান ॥ প্রেম-সাধনায় আত্মার সহজস্বরূপ উপলব্ধিতে ব্রহ্মাণ্ডেরও সহজতত্ত্ব অবগত হওয়া যায়। 'আপন জানয়ে যেই জগৎ জানয়, জগতের জন তার অন্ত নাহি পায়।' আত্মতত্ত্বের মূলে পরমসত্য প্রেমস্বরূপ যে সহজ রয়েছেন, সর্বভূতের মধ্যেও তিনি রয়েছেন গুহাহিত সত্যরূপে। আত্ম-অনাত্মের এই দ্বৈতজ্ঞানেব জন্য ভববিকল্পই দায়ী—'তুমি শুধু বস্তুজ্ঞানে দেখিতেছ ভ্রম। নতুবা সকলি হয় আত্মার এ ক্রম ॥ কোথা কীট কোথা ইট কোথায় বা কাঠ। মায়াবশে তুমি শুধু দেখ এ বিভ্রাট ॥' বর্হির্বস্তু ও ইন্দ্রিয়সমূহ একই বস্তু, মায়ার দ্বারা দ্বৈতরূপে প্রতিভাত — আত্মজ্ঞানের উদয়ে দ্বৈধতার অবসান হলে আত্মার প্রেমময় সহজস্বরূপের এবং ব্রহ্মাণ্ডেরও পরমতত্ত্বের উপলব্ধি হয়।

উপনিষদে উক্ত হয়েছে —'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি।' সহজিয়া মতেও — 'সহজেতে জীব জন্মে সহজে বিনাশে, সহজেতে খায় পিয়ে সহজেতে ভাসে। সহজেতে যায় জীব দেখহ ভাবিয়া। সহজ সন্ধান কেহ না পায় খুঁজিয়া ॥' প্রেমের তীব্রতম অনুভূতি এবং সর্বদেহের সার সহজ — 'সর্ববস্তু থাকে সেই রসিক নগরে।' এটিই কাম, যা হতে সর্বভূতের উৎপত্তি — 'পুরুষ প্রকৃতি কামেই উৎপত্তি কামেতে সবার জন্ম...কাম উপাসনা কাম সে সাধনা কামকেলি সব তন্ত্র...কাম হরিনাম-মন্ত্র।' তন্ত্র ও বৌদ্ধ সহজিয়া সম্প্রদায়ের মতো বৈষ্ণব সহজিয়াগণও সহজের দুইরূপ রস ও রতিকে বীজ ও শোণিতরূপে অভিহিত করেছেন — 'স্থাবর জঙ্গম আদি যত দেহ হয়, রতিকাম সর্বদেহে বিলাস করয়।' সহজ হতেই আত্ম ও অনাত্ম উভয়েরই উৎপত্তি— তাদের অন্তর্নিহিত গভীর ঐক্য-বশতই প্রেনসাধনায় সহজজ্ঞান লাভ হলে, অনাত্ম বস্তুরও পরমস্বরূপের উপলব্ধি হয়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সহজিয়া তত্ত্ব-সমূহের নিরপেক্ষ আলোচনা

১. মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ

বৈষ্ণব সহজিয়াগণ গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্মের পরকীয়া প্রেমের আদর্শের সঙ্গে মনস্তত্ত্বের অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়েছেন। সম্পূর্ণ মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যায়, দেহমনের কঠিন শৃঙ্খলার দ্বারা এই প্রেমই (নিম্নতর বৃত্তিসমূহের অবদমনের দ্বারা নয়) এমন একটি পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে, যা ঐশী প্রেমের ভাবোন্মাদের তুল্য। গভীর মানবীয় প্রেম — এমনকি যৌনাবেগও চিত্তবৃত্তি-নিরোধের দ্বারা মনোজগতে যে অনন্য ঐক্যের সৃষ্টি করে, তা সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার মধ্যে গণ্য। এ-ই গুহ্য যোগসাধনায় লক্ষ্য সমরস। বৌদ্ধ ও হিন্দুতন্ত্রে মৈথুন সাধনায় মহাসুখ-লাভ চিত্তের এমনই একটি অবস্থা — বৈষ্ণব সহজিয়াগণ তাতে প্রেমের আদর্শ যুক্ত করেছেন। সর্বত্রই লক্ষ্য চিত্তবৃত্তির নিরোধে চরমানন্দ লাভ — কখনও যৌগিক প্রক্রিয়ায়, কখনও তীব্রতম প্রেমের আবেগের মধ্যে।

গুহ্যসাধক-সম্প্রদায় মাত্রেরই মতে, মানুষের যৌনবৃত্তির সম্পূর্ণ অবদমন সম্ভব নয় — বরঞ্চ সমরস, মহাসুখ অথবা মহাভাব রূপে সেটিই আমাদের সমগ্র সত্তার স্বরূপ। সুতরাং দৈহিক ও মানসিক সংযমের দ্বারা তার স্থূলতা দূরীভূত করাই শ্রেয়। কামপঙ্ক-শয্যায় প্রেম-পঙ্কজের জন্ম হলেও, তা অনন্ত প্রেমস্বর্গের আলোকে ঊর্ধ্বমুখ।

যে কোন বিষয়ের তীব্রতম উপলব্ধিতে আত্মজ্ঞান অথবা ব্রহ্মজ্ঞানের অনুরূপ আনন্দোপলব্ধি হয় — ভারতের ধর্মনৈতিক চিন্তার ইতিহাসে এই ধারণা নূতন নয়। বৃহদারণ্যক উপনিষদে আত্মানুভূতির আনন্দকে নারীসঙ্গ-সুখের সহিত তুলনা করা হয়েছে। ভাগবতপুরাণে কথিত হয়েছে, গোপবালাগণ কৃষ্ণের প্রতি আত্যন্তিক অনুরাগবশে মোক্ষলাভ করেন এবং অন্যদিকে চেদীরাজ শিশুপাল কৃষ্ণের প্রতি আত্যন্তিক জুগুপ্সাবশেও মুক্তিলাভ করেন। যারা ভয়-ঘৃণা-শত্রুতা প্রভৃতি নীচবৃত্তিরও চরমতম অনুভূতির দ্বারা ঈশ্বরের উপাসনা করেন, তাঁরাও বৈকুণ্ঠ লাভ করেন — শুদ্ধাভক্তির তো কথাই নেই।

ভারতীয় আলঙ্কারিকগণ সৌন্দর্যানুভূতিকেও ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে তুলনা করেছেন। রসের স্বরূপ-নির্ণয়ে বিশ্বনাথ কবিরাজ বলেছেন —

সত্ত্বোদ্রেকাদ্ অখণ্ড-স্বপ্রকাশানন্দ-চিন্ময়ঃ।
বেদ্যান্তর-স্পর্শ-শূন্যো ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদরঃ ॥

কাব্যাস্বাদের অলৌকিক আনন্দে বহির্বস্তুর সঙ্গে সম্বন্ধজনিত ব্যক্তিত্ববোধের অবসানে রজস্তমগুণের আবরণ সরে গেলে মনে সত্ত্বগুণের উদ্বোধ হয় — এরূপে অন্য বেদ্যবিষয়ের সংস্পর্শমুক্ত চিৎ-স্বরূপের স্ফুরণে যে অপূর্ব আত্মানুভূতি বা পরমানন্দ লাভ হয়, তা ব্রহ্মাস্বাদের অনুরূপ — কারণ 'আত্ম-লাভান্ন পরং ন বিদ্যতে'। কাব্য ও শিল্পাস্বাদনে মনে ব্যবহারিক

জগতের আচ্ছাদন সরে গিয়ে অখণ্ড সত্তার উদ্বোধ ঘটে এবং বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় সত্তার বিকাশে সমগ্র পুরুষীয় সত্তা মুক্তিলাভ করে।

কাশ্মীরের শৈব-তান্ত্রিকগণও অনুভূতির এই অবস্থার সম্ভাব্যতা স্বীকার করেছেন। অভিনব গুপ্তের 'তন্ত্রালোকে' আছে, চিত্ত ভববিকল্প-মুক্ত হলে শিবরূপ অচঞ্চল আত্মোপলব্ধি হয়— এমনকি মানবেতর প্রাণিসমূহের মধ্যেও এইরূপ অবস্থার সৃষ্টি হলে শিবস্বরূপতা লাভ হয়। 'স্পন্দ-কারিকা'য় কথিত হয়েছে, আত্মার শিবস্বরূপতা উপলব্ধির জন্য মনের যে অচঞ্চল অবস্থার প্রয়োজন, তা মুক্তিরই নামান্তর। আমাদের প্রাত্যহিক অনুভূতিই গভীরতা প্রাপ্ত হলে মনের এমনই একটি ঐকতানতা আসে যে, নিশ্চল অক্ষররূপে আত্মোপলব্ধি হয়। কেউ অতিমাত্রায় ক্রুদ্ধ, হৃষ্ট বা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হলে মন বহির্জগতের অনুভূতিশূন্য হয়ে গভীর সুষুপ্তিরাজ্যে প্রবেশ করে — এইরূপ স্পন্দ অবস্থায় মনের জ্ঞাতা-জ্ঞেয় ভাব বিনষ্ট হলে যে বিশুদ্ধ সংবিত মাত্র বিদ্যমান থাকে, তাই আত্মার বিশুদ্ধস্বরূপ।

'বিজ্ঞান-ভৈরব'-এও এটি সমর্থিত হয়েছে। আত্মার পরমস্বরূপ উপলব্ধির অথবা ভৈরবতা লাভ করার জন্য অন্তর্জগৎ ও বহির্জগতের নিস্তরঙ্গ সংবিত-স্বরূপতার উপলব্ধি করা প্রয়োজন। প্রবল ঘণ্টাধ্বনির অবশেষে যেমন বিচিত্র শব্দ-ঝঙ্কারের সৃষ্টি হয়, তেমনই যৌনাবেগের মতো গভীর অনুভূতিও মনোজগতে তীব্র আন্দোলনের সৃষ্টি করে অসংখ্য অনির্বচনীয় অনুভূতির উৎস খুলে দেয়। এই আবেগময় মুহূর্তের অদ্ভুত মানসিক ঐক্যের ফলে সাধকের আত্মানুভূতির ন্যায় এক অজ্ঞাত সুখের প্রতীতি হয়। প্রিয়তমার চুম্বনাশ্লেষও প্রেমিকের অন্তর্নিহিত আনন্দের উৎস খুলে দিয়ে তাকে আত্মানুভূতির আনন্দরসে অভিষিক্ত করে। প্রিয়জনের সুদীর্ঘ বিরহের তৃষিত প্রতীক্ষার অবসানে, এমনকি ক্ষুধাতৃষ্ণার মতো সামান্য দৈহিক আকাঙ্ক্ষার দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর তৃপ্তিতেও আমাদের মনোজগতে 'তথতা' বা 'মহাসুখ'-এর মতো অপূর্ব অনুভূতি সঞ্চারিত হয়। মধুর সঙ্গীত অথবা তদনুরূপ বিষয়ের রসাস্বাদনে প্রবৃত্ত হয়েও ভাবুক ও যোগী নিজেকে তথতায় মগ্ন করতে পারেন। ক্ষুধা-তৃষ্ণা-ভয়-বিষাদের তীব্র অনুভূতিও মনোজগতে ব্রহ্মজ্ঞানের অনুরূপ ভাব সঞ্চারিত করে।

২. যৌগিক দৃষ্টিকোণ

যোগেও তীব্রতম অনুভূতিতে মনের নিরুদ্ধ অবস্থার সম্ভাব্যতা স্বীকার করা হয়েছে। যৌগিক সমাধি কিন্তু মনের এইরূপ ক্ষণিক নিরুদ্ধ অবস্থা নয় — এটি ভববিকল্প ও মূলবৃত্তিসমূহের বিনাশকারী শাশ্বত নিরুদ্ধ অবস্থা।

যোগসাধনায় পাঁচটি মানসিক স্তর বা চিত্তভূমির উল্লেখ আছে — ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র, নিরুদ্ধ। ক্ষিপ্ত, বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে নিত্য বিচরণশীল সাধারণ অবস্থা ; মূঢ়, কোনও প্রবল অনুভূতির আলোড়নে তমোগুণের আধিক্যযুক্ত মনের মূর্ছিত অবস্থা ; বিক্ষিপ্ত, নিত্য পরিবর্তনশীল মনের ক্ষণিক নিরুদ্ধ অবস্থা ; একাগ্র, কোন বিষয়ে গভীর মনোসন্নিবেশের দ্বারা মনের এক অখণ্ড অবস্থা ; নিরুদ্ধ, এই একগ্রতার অভ্যাসে মনের শাশ্বত নিরুদ্ধ অবস্থা।

উক্ত পাঁচটি ভূমির শেষ দুটি ভূমিই প্রকৃত যোগ। অন্যান্য ভূমিগুলি সমাধির সহায়কমাত্র। মূঢ় ও বিক্ষিপ্ত থেকে মন সহজেই সক্রিয় অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করে। ক্ষুধা-তৃষ্ণা-ভয়-জুগুপ্সা

অথবা যৌনাবেগের প্রবল সংঘাতে মনের সাধারণ ক্ষেত্রে অভিভূত হয়ে আমরা দৈহিক, জৈবিক ও মনস্তাত্ত্বিকতার ঊর্ধ্বে উঠলেও মন সহজেই সক্রিয় অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করে—সেজন্য এগুলি সমাধির সঙ্গে তুলনীয় নয়।

অতএব তান্ত্রিকদের সমরস, বৌদ্ধ সহজিয়াদের মহাসুখ এবং বৈষ্ণব সহজিয়াদের পরম প্রেম—সর্বত্রই এই চিত্তভূমির উপর দৃষ্টি রাখতে হবে। চিত্ত প্রথম তিনটি ভূমির ক্ষণিক মূর্ছিতে অবস্থায় থাকলে প্রকৃত যোগের অবস্থা বলে গণ্য হবে না। সেজন্য তান্ত্রিক ও সহজিয়াগণ গুহ্য সাধন প্রণালীর উপরে কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করে বলেছেন — নিম্নতর গ্রামে সাধনার অভ্যাস মর্মান্তিক ফলদায়ক এবং এ-পথ 'কোটিকে গোটিক'-এর পক্ষেই অনুসরণীয়।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বাঙ্‌লার বাউল সম্প্রদায়

১. বাউলগণের বৈশিষ্ট্য

শহরের কর্মকোলাহল থেকে সুদূর গ্রামোপান্তের আকাশে একদিন বাউল নামে অভিহিত গ্রাম্যকবিদের কণ্ঠে সুরের যে-মায়ালোক স্পন্দিত হয়েছিল — তা অনন্য সৌন্দর্য ও অভিনব ধর্মোপলব্ধিতে অতুলনীয়। এই অশিক্ষিত গ্রাম্যকবিদের অধিকাংশই হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের নিম্নশ্রেণীভুক্ত দরিদ্র ও ভিক্ষোপজীবী। হিন্দু বাউলগণ মুখ্যত বৈষ্ণবধর্ম এবং মুসলমানগণ সূফীধর্মের মধুকোষ থেকে এই ঐশী প্রেমের কল্পনা আহরণ করেছিলেন। বাঙলা 'বাউল' ও হিন্দী 'বাউর' সম্ভবত সংস্কৃত 'বাতুল' অথবা 'ব্যাকুল' শব্দ থেকে আগত। এই দুটি সংস্কৃত শব্দেই 'মনের মানুষ'-এর সঙ্গে আত্যন্তিক মিলনাকাঙক্ষা প্রচ্ছন্ন রয়েছে। 'বাউল' ও 'আউল' শব্দের আরবী 'আউলিয়ার' (একশ্রেণীর পূর্ণমানুষ সম্বন্ধে প্রযুক্ত) সঙ্গেও সাদৃশ্য আছে। 'বাউল' শব্দের সঙ্গে সূফী 'দিওয়ানা' (সর্বসংস্কার-মুক্ত পাগল) শব্দের ভাবসাদৃশ্যও লক্ষণীয়।

বিভিন্ন সাধক-সম্প্রদায় বিচিত্র সাধন-প্রণালী নিয়ে বাউল-সম্প্রদায়ে স্থান লাভ করেছে — কিন্তু সকলেরই সাধারণ বৈশিষ্ট্য সংস্কারহীনতা। বৈষ্ণব সহজিয়া ও তার সগোত্র অনেক গুহ্যসাধক-সম্প্রদায় বাউল নামে পরিচিত। বৈষ্ণব সহজিয়াদের সম্বন্ধে পূর্বে আলোচিত হয়েছে। বর্তমান অধ্যায়ে 'বাউল'-শব্দকে সংকীর্ণ অর্থে গ্রহণ করে হিন্দু ও মুসলমান মরমীয়া সাধক বাউলদের সম্বন্ধে আলোচনা করা হবে।

চিন্তার স্বাধীনতা ও সামাজিক বিধিনিষেধ-মুক্ত জীবনযাপনের আদর্শই বাউল-সম্প্রদায়ের সাধারণ বৈশিষ্ট্য। একদিকে আনুষ্ঠানিক ও প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম এবং অন্যদিকে কপটতা ও পাণ্ডিত্যাভিমানকে সর্বান্তঃকরণে পরিহার করে তাঁরা আত্মার স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশকেই বরণীয় করেছেন। সেজন্যই তাঁদের পথ উল্টাপথ এবং আধ্যাত্মিক আদর্শ উজান-সাধন নামে অভিহিত। নিম্নলিখিত গানটিতে বাউলদের খ্যাপা চরিত্রটি ফুটে উঠেছে —

"ভাবের ভাবুক প্রেমের প্রেমিক হয় রে যে জন।
ও তার বিপরীত রীতি পদ্ধতি, কে জানে কখন সে থাকে কেমন।
তার নাই আনন্দ নিরানন্দ, লভি নিত্য প্রেমানন্দ,
আনন্দ সলিলে যেন ভাসছে দু'নয়ন।
....
সে জ্বালাইয়ে প্রেমের বাতি বসে থাকে দিবারাতি,
ভাবের সাগরে অকূল পাথারে ডুবাইয়া মন।
ও তার হস্তগত সুখের চাবি, তবু করে না সুখ অন্বেষণ ॥'

স্মরণ রাখতে হবে, এই উল্টাপথ এবং ধর্মতাত্ত্বিক ও যৌগিক ব্যাখ্যা মধ্যযুগের সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই বর্তমান। নাথ ও সূফীগণের মধ্যেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়।

২. বাউল ও সহজিয়া সম্প্রদায়

সাধারণ অর্থে বাউলগণও সহজিয়া। সহজিয়াদের প্রথম বৈশিষ্ট্য পরমতত্ত্ব সহজের কল্পনায় — সর্বভূত ও জীবের স্বরূপ 'সহজ'ই অধ্যাত্ম-সাধনায় লক্ষ্য। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য জীবন ও ধর্মচরণে সত্যোপলব্ধির সহজ-সরল পথের অনুসরণে। এই ব্যাপক অর্থে উত্তর মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের সন্তকবি এবং শিখ ও সূফী কবিগণও সহজিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত — এই অর্থে বাঙলার বাউলগণও সহজিয়া ভাবধারার অবিচ্ছেদ্য অংশ। বাউল সঙ্গীতের আলোচনায়, এই সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য; সহজিয়াদের সঙ্গে পার্থক্য, সহজিয়া ও সূফী-প্রভাব স্পষ্টই বোঝা যায়।

প্রচীনতর সহজিয়া ধর্ম বলতে বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব সহজিয়া ধর্মকেই বোঝায়। বৈষ্ণব সহজিয়া আন্দোলনের উদ্ভব ও পরিণতির সঠিক সময় জানা না গেলেও, সহজিয়াগণ বাউলদের পূর্বসূরী বলেই মনে হয়! উভয় সম্প্রদায়ের আদর্শ-সাদৃশ্য তাদের একই বংশলক্ষণ সূচিত করে। প্রাচীনতর সহজিয়াধর্মের মতো বাউলমতেও মুর্শিদ বা গুরুবাদের আদর্শ, দেহভাণ্ডেই ব্রহ্মাণ্ডের কল্পনা, পরমতত্ত্ব ও সাধনায় সহজের আদর্শ এবং সর্ববিধ সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহাত্মক মনোভাব সুস্পষ্ট।

কিন্তু প্রাচীনতর সহজিয়া আদর্শ, সাধন-প্রণালী ও সহজের কল্পনায় বাউলগণ অনেক পরিবর্তন সাধন করেছেন। বৌদ্ধ সহজিয়া মতে, সহজজ্ঞান লাভের জন্য মৈথুন-সাধন-প্রণালী আবশ্যিকরূপে স্বীকৃত — তাতে প্রেমের আদর্শ যুক্ত করে বৈষ্ণব সহজিয়াগণ নরনারীর প্রেমকেই সহজরূপে আখ্যাত এবং তাকেই স্বর্গীয় প্রেমে রূপান্তরিত করার চেষ্টা করেছেন। এই প্রেম ঈশ্বরের জন্য চিরনির্বাসিত আত্মার করুণ ক্রন্দনধ্বনি নয় — এটি নরনারীর মরদেহেরই চিরন্তন মিলনতৃষ্ণা। কিন্তু বাউলগণ সহজের কল্পনায় অন্তরতম 'মনের মানুষ' এবং মিলন বলতে দেহমন্দিরে মানবের ব্যক্তিসত্তা ও অন্তরবাসী দেবতার মিলনকেই বুঝিয়েছেন। এই আদর্শের মূলে সূফীমতের প্রভাব সর্বাগ্রগণ্য হলেও, বৌদ্ধ সহজিয়াদের দোহা ও সঙ্গীতের সহজের কল্পনার মধ্যেই অনেক স্থলে এর বীজ রয়েছে। বৌদ্ধ গান ও দোহার অনেক স্থলে সহজের বর্ণনায় অন্তরবাসী পরমপুরুষের কল্পনা দেখা যায়। একটি দোহায় সরহপাদ বলছেন — 'আমাদের শরীরের মধ্যে যে অশরীরী রয়েছেন, তাঁকে জানতে পারলেই মুক্তি লাভ হয় ; গৃহের মধ্যে স্বামীকে রেখে প্রতিবেশীদের নিকট বৃথা অন্বেষণ করছ।' বৌদ্ধ সহজিয়াদের এই অশরীরীর কল্পনাই পরবর্তীকালে সূফীপ্রভাবে বাউলগণের 'মনের মানুষ' বা ব্যক্তিমানবের হৃদয়দেবতার কল্পনায় রূপান্তরিত হয়েছে।

উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের সন্ত-কাব্যসাহিত্যেও প্রাচীনতর সহজিয়া মতের সঙ্গে সূফীকল্পনার মিশ্রণ লক্ষিত হয়। এই হিসাবে বাঙলার বাউলগানের সঙ্গে মধ্যযুগের ভারতীয় ভাষাসাহিত্যগুলির আশ্চর্য সাদৃশ্য রয়েছে। সেজন্য ভারতের মধ্যযুগীয় ধর্মনৈতিক চিন্তাধারার ইতিহাসে সূফীমতের আলোচনাও অপরিহার্য।

৩. বাউল ও সূফীসম্প্রদায়

[ক] ভারতে ও বাঙলায় সূফীধর্মের ইতিহাস ॥ খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকেই সম্ভবত সূফীধর্ম ভারতে বিস্তার লাভ করে। এই সময়ে বাঙলায় শাহ্ সুলতান রুমী, দাক্ষিণাত্যে

সৈয়দ নাথর শাহ্ এবং লাহোরে মকদুম সৈয়দ আলি হুজুরী সূফীধর্মের প্রথম প্রবর্তক। কিন্তু দ্বাদশ শতকের শেষভাগে চিস্তি সুরাওয়ার্দি মতের বিস্তারের সঙ্গেই প্রকৃতপক্ষে সূফীধর্ম ভারতের হৃদয় আকৃষ্ট করে। এই সময়ে দিল্লির খাজা মইনুদ্দিন চিস্তি চিস্তি-মতের এবং শেখ বাহউদ্দিন মুলতানী সুরাওয়ার্দি মতের প্রবর্তন করেন। তৎপরে চতুর্দশ শতকে মাদারি মতের প্রবর্তক বদিউদ্দিন শাহ্, পঞ্চদশ শতকে কাদিরী মতের প্রবর্তক গিলনি এবং নকস্বন্দী মতের প্রবর্তক মুহম্মদ বিল্লা আবির্ভূত হন।

উপনিষদের একেশ্বরবাদ, বৈষ্ণবধর্মের ভক্তিবাদ এবং বৈষ্ণব সহজিয়া আন্দোলন ভারতে সূফীমতের বিস্তারে প্রভূত সাহায্য করে। তা ছাড়া দ্বাদশ শতকের ভারতের ইতিহাসে রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মনৈতিক চিন্তাধারার সমন্বয়ে সূফীমত একটি বিশিষ্ট মাধ্যমের কাজ করেছে।

সূফীমত বাঙ্লায় উত্তর ভারত থেকেই আগত। বাঙ্লার সাতটি সূফী-সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্ভবত জালালুদ্দিন তাব্রিজি (মৃত্যু ১১২৫ খ্রীঃ) প্রবর্তিত সুরাওয়ার্দি শাখাই প্রাচীনতম। চিস্তি-মত সম্ভবত উত্তর ভারতের সেখ ফরিদুদ্দিন (মৃত্যু ১২৬৯)-কর্তৃক আনীত। হুগলীর পাণ্ডুয়ার শাহ্ সফিউদ্দিন সাহীই সম্ভবত এই সময়ে কাদারি মতের প্রথম প্রবর্তক। বাঙ্লায় মাদারি মতের প্রবর্তক সম্ভবত শাহ্ মাদর স্বয়ং। আদমী অথবা ফিদোয়ারি মতও বাঙ্লায় বিস্তারলাভ করে। সপ্তদশ শতকে শাহ হামিদ দনিসমন্দ নকস্বন্দী মতের প্রবর্তন করেন। কাদিরি মতের প্রবর্তক ষোড়শ শতকের আবদুল কাদির গিলানী বলেই অনুমিত হয়। এইরূপে অসংখ্য সূফী আদর্শ সমসাময়িক সহজিয়া ধর্ম ও দর্শনের সঙ্গে মিলিত হয়ে বাঙ্লায় বাউল গানের উদ্ভবের সূচনা করে।

[খ] বাউলমতে সূফীপ্রভাব ॥ বাউল ধর্ম-সাধনায় সর্বশ্রেষ্ঠ অঙ্গ সঙ্গীতের মাধ্যমে উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগের অভিব্যক্তি।

(অ) সূফী 'সমা'র প্রভাব

এই সাধনায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্মের কীর্তন এবং সূফীধর্মের সমার (নৃত্যগীত) প্রভাব রয়েছে। সূফীগণের মতে, সঙ্গীতের মাধ্যমে ভক্ত ফানা বা ঈশ্বরের সঙ্গে অখণ্ড মিলনে উত্তীর্ণ হয়।

(আ) সূফী 'মুর্শিদ'-এর প্রভাব

গুরুবাদের প্রাধান্য সূফীধর্মেরও বৈশিষ্ট্য। বলা বাহুল্য, এটি ভারতের ধর্মসম্প্রদায়-মাত্রেরই বিশিষ্ট লক্ষণ। অনেক সম্প্রদায়ে ঈশ্বরের উপরেও গুরুর আসন প্রতিষ্ঠিত — সূফীমতে মুর্শিদ বা শেখের প্রাধান্যও সেইরূপ। বাউলের মুর্শিদা সঙ্গীতেও গুরু মুর্শিদের চরণে ভক্ত মুরিদের অকুণ্ঠ আত্মনিবেদনের পরিচয় পাওয়া যায়। 'উনুর ঝুনুর বাজে নাও আমার নিহাইলা বাতাসে, রে-মুর্শিদ, রইলাম তোর আশে। পশ্চিমে সাজিল মেঘ দেওয়ায় দিল ডাক ...আমার ছিঁড়িল হালের পানস নৌকায় খাইল পাক্। মুর্শিদ রইলাম তোর আশে। আগা বইয়া উঠে ঢেউ পাছা বাইয়া যায়রে, আমার হীরালাল মাণিক্যের বাড়া সোতে লইয়া যায়, মুর্শিদ রইলাম তোর আশে।'— বাউল কাব্য-সাহিত্যে মুর্শিদের কাছে এই আত্মনিবেদনের ভঙ্গীটি বড় চমৎকার।

(ই) বিদ্রোহাত্মক আদর্শ

সর্ববিধ আনুষ্ঠানিকতার বিরুদ্ধে বাউলের বিদ্রোহাত্মক মনোভাবের পশ্চাতে সহজিয়া চিন্তাধারার পটভূমিকা এবং সূফীধর্মের প্রভাব রয়েছে। বাউল গানে বলা হয়েছে — 'মোর যাইতে তো চাহে না রে মন মক্কা মদিনা। এই যে বন্ধু আমার আছে, আমি রই রে তারি কাছে ; আমি পাগল হইতাম দূরে

রইতাম, তারে চিনতাম রে যদি না।' প্রেমধর্ম হিসাবে বাউল সম্প্রদায় বাহ্যানুষ্ঠান ও কৃচ্ছ্রসাধনার পথ পরিত্যাগ করে হৃদয়-দেবতার মন্দিরে ভাষাহীন অন্তরের নীরব আকুতি ও অনুগত্য জ্ঞাপন করেছে।

অন্যান্য দেশের মরমীয়াগণের মত বাউলদের মতেও, শাস্ত্রীয় আচার-অনুষ্ঠান ও বর্হিমুখ পাণ্ডিত্যের পথে সত্যকে লাভ করা অসম্ভব — 'দুনিয়ার ভোজের বাজী, মোল্লা কাজী, ভাবলে পাগল পণ্ডিত জ্ঞানী।' প্রেমের সহজপথে নিভৃত অন্তর-দেউলে প্রাণের ঠাকুর আপনিই ধরা দেন। বাউল গানে বলা হয়েছে — 'তোমার পথ ঢাইক্যাছে মন্দিরে মস্‌জেদে তোমার ডাক শুনে স্বামী চলতে না পাই, রুইক্যা দাঁড়ায় গুরুতে মুর্সেদে।' অন্যত্র আছে — 'রীতে পথেই চলেন যারা, জ্যান্ত সহজ পান কি তারা? নিয়ম রীত ছাইড়া গেলে, মরম রসের দরশ মেলে।' সহজিয়া হিসাবে বাউলগণেরও আধ্যাত্মিক জীবনের নিঃশ্রেয়স্ সহজস্বরূপ — 'যদি ভেটিবে সে মানুষ, তবে সাধনে সহজ হবি, তোর যাইতে হইবে সহজ দেশে।'

সহজিয়ামতে, দেহের মধ্যেই ব্রহ্মাণ্ডের সকল তত্ত্ব এবং সহজরূপ পরমতত্ত্ব রয়েছে। সূফী ও বাউল গনের মতেও : প্রিয়তম এই দেহ-মন্দিরেই রয়েছেন। মিথ্যা মানুষ তীর্থ-তীর্থে মন্দিরে-মসজিদে সেই প্রিয়তমেব অনুসন্ধান করে বেড়ায়। 'সমঝে ভবে সাধন কর, নিকটে ধন পেতে পার, লালন কয় নিজ মোকাম ঢোর।' — ' আমার এ ঘর খানায় কে বিরাজ করে, তারে জনমভরে একবার দেখলাম নারে' — এইরূপ অসংখ্য বাউল সঙ্গীতে আধ্যত্মিক সাধনায় শাস্ত্রবিধি ও বাহ্যানুষ্ঠানের ব্যর্থতা এবং অন্তরের অন্তস্তলে ভাবের মানুষের সন্নিধ্য লাভ করবার আকাঙক্ষা ব্যক্ত হয়েছে।

(ঈ) ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিনিধি দেহভাণ্ড

বাউলের গানে দেহ-মন্দিরের হৃদয়পদ্মে 'ভাবের মানুষ'-এর মিলনের জন্য লাঞ্ছিত ভক্তের অবিশ্রান্ত গুঞ্জন ধ্বনিত হয়েছে। প্রেমের এই আর্তি নিঃসন্দেহে গৌড়ীয় বৈষ্ণব প্রভাব-প্রসূত। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে জীব ও ঈশ্বরেব সম্পর্ক অচিন্ত্য-ভেদাভেদ রূপে বর্ণিত হলেও, ধর্মশাস্ত্রে জীব ও ঈশ্বরের প্রেমকল্পনা দ্বৈতবাদেরই উপর প্রতিষ্ঠিত। অন্যদিকে বাউলের প্রেম-ভিত্তি অদ্বৈতবাদের উপর — দ্বৈধতা শুধু রূপক-অলঙ্কারের কাব্যরূপের মধ্যে।

(উ) 'মনের মানুষ'

বৈষ্ণব সহজিয়াদের প্রেম ব্যক্তি ও ঈশ্বরের প্রেম নয় — এ প্রেম রাধাকৃষ্ণরূপ নরনারীর। কিন্তু বাউলের প্রেম প্রত্যক্ষভাবে হৃদয়দেবতার সঙ্গে ব্যক্তির প্রেম। বাউলের এই আত্যন্তিক প্রেম-পিপাসার তৃপ্তিসাধনের জন্যই পরমপুরুষ ব্যক্তি-মানবের হৃদয়ে 'ভাবের মানুষ' হয়ে ধরা দিয়েছেন — এই ভাবের মানুষের সঙ্গে মিলনের অর্থই সহজোপলব্ধি বা আত্মোপলব্ধি।

উপনিষদের যুগ থেকে ভারতীয় ধর্মনৈতিক চিন্তাধারা আত্মজ্ঞান ও আত্মোপলব্ধিকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে। বিভিন্ন সহজিয়া ও সুফীসম্প্রদায়ের মত অপ্রধান শাখাগুলিও উপনিষদের এই আত্মদর্শনের আদর্শে অনুরঞ্জিত (যদিও প্রেমের উপাদান পরবর্তী কালের)। সুফীধর্মের এই আদর্শের সহিত ভারতের চির প্রবাহিত ধর্মনৈতিক চিন্তাধারার আশ্চর্য সাদৃশ্যের জন্যই ভারতের জনচিত্তে সুফীমত সহজেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

সূফী মতে, সর্বভূত ও জীবগজৎ এক অদ্বৈত পরমপুরুষ থেকে আগত। ' অনল-হগ্' (আমিই সত্য) মতের প্রবর্তক সূফীকবি হল্লজের মতে, ঈশ্বরের সার-স্বরূপ প্রেম। সৃষ্টির পূর্বে ঈশ্বর আপনার একৈক সত্তার প্রেমে আপনার নামবৃত্তি-সমন্বিত যে প্রতিকৃতি প্রকাশ করেন, সেই ঐশী মূর্তিই আদম। আলিরাজার 'জ্ঞান-সাগর'-এও সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে এইরূপ

সূফী-বিশ্বাসের সুন্দব চিত্র পাওয়া যায়।

'প্রথমে আছিল প্রভু এক নিরঞ্জন।
প্রেমরসে ডুবি কৈল যুগল সৃজন ॥
প্রেমরসে ভুলি প্রভু যাহাকে সৃজিল।
মোহাম্মদ বুলি নাম গৌরবে রাখিল ॥
... ...
যুগল না হইলে কেহ না পারে চলিতে।
যুগ বিনে প্রেমরস না পারে ভুজিতে ॥'

প্রেমের আকর্ষণেই সৃষ্টিচক্রের বিশৃঙ্খলতা সুশৃঙ্খল সামঞ্জস্য লাভ করেছে। চন্দ্রসূর্য-গ্রহ-নক্ষত্র ও আকাশে, সাগরে ও সলিলে, চন্দ্র ও নিশীথে, সূর্য ও দিবসে, পদ্ম ও ভ্রমরে, নর ও নারীতে অনন্তকাল এই প্রেমের অভিনয় চলছে। দেহ মনের এবং মন প্রাণবায়ুর প্রেমে স্পন্দমান। প্রেমের বশেই মাতা সন্তানকে গর্ভে ধারণ করেন, পৃথিবী বৃক্ষকে দৃঢ়রূপে আর্কষণ করেন এবং বৃক্ষ পত্রপুষ্পফল-সমষ্টিকে ধারণ করে অপূর্ব স্নেহরসে পরিপূর্ণ করে তোলে — এইরূপে সমগ্র সৃষ্টিচক্র প্রেমলোকেই বিধৃত।

সৃষ্টি-চক্রের আদিভূত কারণ-রূপে ঐশী প্রেমের কল্পনার সঙ্গে, ঈশ্বরের আত্মোপলব্ধির জন্য আত্মপ্রকাশের কথা এসে পড়ে। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সেই পরম পুরুষের প্রেম ও সৌন্দর্যের প্রতীক এবং মানবের মধ্যেই তার পরিপূর্ণতা। মানবের মধ্যে তাঁর এই বৃত্তিসমূহের পরিপূর্ণতার জন্য একমাত্র সেখানেই তিনি স্বীয় স্বরূপে জাগ্রত হয়ে পুনরায় আপনার পূর্ণস্বরূপে প্রত্যাবর্তন কবেন। পূর্ণ মানবের ভাবোন্মাদে স্বীয় বৃত্তিসমূহ ও চৈতন্যময় সত্তার পরিচয় লাভের উদ্দেশ্যেই তিনি মানব সৃষ্টি করেছেন।

মানুষ আপনার মধ্যে এই দৃশ্য ও অদৃশ্য, ব্যক্তি-পুরুষ ও ঐশীপুরুষের মিলন সাধন করছে। মানুষের এই ব্যক্তিসত্তা ও ঐশীসত্তা উপনিষদের জীবাত্মা ও পরমাত্মার কল্পনার অনুরূপ। তারা একই বৃক্ষে দুটি পক্ষীর ন্যায় — একটি (জীবাত্মা) বৃক্ষের মধুর ফল ভক্ষণ করে—অন্যটি (পরমাত্মা) করে না। অন্তরের এই ঐশী সত্তা আমাদের পুত্র এবং বিত্তের থেকেও প্রিয় — আমাদের বাক্যের বাক্য, চক্ষুর চক্ষু, মনের মন, প্রাণের প্রাণ।

মানবের মধ্যে এই তীব্র প্রেমের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হলে তার অহঙ্কার ও ভবনির্বাণের কল্পনা ভস্মীভূত হয়। এইরূপে 'আমি' ও 'সে' — এই পার্থকবোধ বিলুপ্ত হলে ব্যক্তি ও ঐশী পুরুষের পার্থক্যও বিলুপ্ত হয়। এই সত্য উপলব্ধি করেই মরমী কবি হল্লাজ বলতে পেরেছিলেন— 'আমিই সত্য'।

আমাদের এই ঐশী সত্তার মধ্যে আত্ম ও অনাত্ম উভয়েরই গুহাহিত সত্য রয়েছে — সেজন্য বহির্জগৎও ভক্তের নিকট ভগবানের বার্তাই বহন করে আনে। প্রেমের পথে যে-বিরহের শুরু, আত্মউপলব্ধির পথে সেই চিরদুঃখের অবসান হবে।

বাউল সম্প্রদায়ের 'ভাবের মানুষ'-এর কল্পনায় উপনিষদের পরমাত্মা, সহজিয়াদের সহজ ও সূফীগণের দয়িতের কল্পনার অপূর্ব মিশ্রণ ঘটেছে। বর্হিমুখ পাণ্ডিত্যের পথে নয়, শুদ্ধা প্রেমের পথেই মরদেহের অভ্যন্তরে সেই অচিন পুরুষের সান্নিধ্য লাভ সম্ভব। বাউল গানে বলা হয়েছে — 'দেহের মধ্যে আছে রে সোনার মানুষ ডাকলে কথা কয়। তোমার মনের মধ্যে আর এক মন আছে গো, তুমি মন মিশাও সেই মনের সাথে।' অন্যত্র — 'খাঁচার মধ্যে

অচিন পাখী কেমনে আসে যায়।' নিকটে — অতি নিকটে — এই মরদেহের অনুতে-পরমাণুতে অনন্তকাল সেই ঐশী পুরুষের লুকোচুরি চলছে। সবচেয়ে যা নিকটে তাঁরই বিরহে কাতর হয়ে কবি গাইছেন — 'আমায় দিয়ে ফাঁকি প্রেমের পাখী কোথায় লুকালো। আমি ঘুরে বেড়াই দেখা না পাই, উড়িয়ে যে পালালো।'... 'আমারে পাগল করে যে জন পালায় কোথা গেলে পাব তায়।' এই অচিন পাখীর অনুসন্ধানেই বাউল পাগল হয়ে বেড়ান। সেই অচিনের চকিত আর্বিভাব, সেই অনন্তের আহ্বান, সেই প্রিয়তমের গোপনস্পর্শ এই জাগতিক বিধিনিষেধের প্রতি বাউলকে অদ্ভুতভাবে উদাসীন করেছে। সকল রূপের অন্তরালেই সেই বিদেহী সৌন্দর্য লুক্কায়িত — 'লীলাতে নাইরে সীমা, কোন সময় কেমন রূপ ধরে।'

এই গোপনলীলা অনন্ত-পরিব্যাপ্ত হলেও, অন্তরের আকাশে পূর্ণচন্দ্রের প্রভায় তিনি ভাস্কর রয়েছেন — গুরুর উপদেশে অন্তরের মেঘপুঞ্জ অপসারিত করে তাঁরই আলোকে অভিষিক্ত হতে হবে। 'মেঘের আড়ে চাঁদ রয়েছে, মেঘ কেটে চাঁদ উদয় করা...।' ফকিরচাঁদ বলছেন — 'তোর মনের মানুষ হৃদয়ে আছে খুঁজে নে তারে ; কেন ঘুরে বেড়াস দেশ বিদেশে, এমন হাবা আর তো দেখি নাই।' কবি লালন বলছেন — 'এই মানুষে আছে রে মন, যারে বলে মানুষ-রতন।' — 'রূপের (ঐশীরূপের) দরজায় শ্রীরূপ (ব্যক্তিত্ব ও মরদেহ) মহাশয়, রূপের তালাচাবি তার হাতে সদা ; যে জন শ্রীরূপ গত হবে, তালা চাবি পাবে...।'

বাউল সঙ্গীতে যেমন একদিকে সান্তরূপের মধ্যে অনন্তের আত্মপ্রকাশের, তেমনই সান্ত মানুষের স্বতন্ত্রসত্তার ভূমায় প্রত্যাবর্তনের ইঙ্গিত রয়েছে। মানুষ এইরূপে সান্ত-অনন্তের মধ্যে অবস্থিত। প্রেমের পথে কোষোপাধি-বিনির্মুক্ত হয়ে সাধক পরম-পুরুষের সঙ্গে এক হয়ে বলতে পারেন — 'বিচার করিয়া দেখি সকলেই আমি... আমি হইতেই আল্লারসুল আমি হইতেই কূল ; আমি হইতেই আশমান জমিন, আমা হইতেই ভুল।' ... আপনি চিনিলে দেখ খোদা চেনা যায়।'

বাউল ও সূফীসাধনায় যোগের উপাদান যেটুকু আছে, তা চিত্তশুদ্ধি ও মনোসন্নিবেশের উপায় মাত্র।

৪. বাউল গানের সাহিত্যিক উৎকর্ষ

বাঙলার বাউলদের কথা আলোচনা করতে গিয়ে শুধু তাঁদের ধর্মমত বা সাধন-পদ্ধতির কথা আলোচনা করলেই চলবে না ; তাঁদের হৃদয়ের নিবিড় অনুভূতি তাঁরা প্রকাশ করেছেন যে গানগুলিতে সেই গানগুলির ভিতরে স্থানে-স্থানে যে সাহিতিক উৎকর্ষ লক্ষ্য করা যায় তা বাঙলা সাহিত্যের অন্যত্র খুব সুলভ নয়। তাঁরা তাঁদের মনের ভাব প্রকাশ করতে যে সকল উপমা-রূপকের ব্যবহার করেছেন সেগুলি একদিকে অতি সহজ, অন্যদিকে সেগুলি আশ্চর্যভাবে গূঢ়ভাব-ব্যঞ্জক। এত অল্পের মধ্যে ব্যঞ্জনায় এত গভীর এবং ব্যাপক অর্থ প্রকাশ পেয়েছে —প্রকাশভঙ্গি এত সংযত এবং সংহত যে অশিক্ষিত গ্রাম্য কবিগণ এই সব পদ রচনা করেছেন তা চট্ করে সকলে সহজে বিশ্বাস করতে চান না। এই জন্য এই সব পদগুলিই গ্রাম্য বাউলদের রচিত কিনা, শিক্ষিত অনুরাগী সংগ্রাহকগণের এর উপরে কোনও হস্তাবলেপ আছে কিনা, সে বিষয়েও মাঝে-মাঝে সংশয় দেখা দেয়। আমরা অল্প কয়েকটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করছি।

তর্কবুদ্ধি-দ্বারা সত্যকে কখনই যাচাই করে নেওয়া যায় না — বাউলগণ এ কথা বহুভাবে

বলে গেছেন। আমরা আমাদের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার-বুদ্ধি দিয়ে 'সহজ সত্য'কে যখন কঠিন করে বুঝবার প্রয়াস করি তখন আমাদের সেই প্রয়াস যে কত হাস্যকর, সে সম্বন্ধে একটি চমৎকার বাউলের পদ দেখিতে পাই। —

ফুলের বনে পশেছে রে
সোনার জহুরী।
তারা নিকষে কষয়ে কমল
আ মরি আ মরি!

সোনা কতখানি খাঁটি কি নয় তার বিচার কষ্টিপাথরে কষে — কিন্তু পদ্মের কোমল পাপড়ির উপরে কষ্টিপাথর ঘষে কখনও পদ্মের বর্ণগন্ধ-মাধুর্যের পরীক্ষা চলে না। ফুলের বনে তাই সোনার জহুরীর স্থান নেই — সেখানকার সত্যকারের সমজদার হল সেই লোক, যার ভিতরে ফুলের বর্ণ-গন্ধ-মাধুর্যকে গ্রহণ করবার সহজ-সুন্দর মনটি আছে। 'মনের মানুষ' হল জীবনের এই ফুলের বনে লুকান অনন্ত সৌন্দর্য-মাধুর্যেরই মতো — প্রেমবাসিত সহজ মন নিয়ে তাকে ধরতে না গেলে সে যে চিরকালের 'অ-ধরা'ই থেকে যায়। তর্কতাপিত দার্শনিক মন নিয়ে সত্যকে ধরতে যাওয়ার চেষ্টা আর কষ্টিপাথর-হাতে ফুলের বনে প্রবেশ একেবারে একই জিনিস।

এই যে 'মনের মানুষ' তার স্বরূপ হল ফুলের সমস্ত অঙ্গে ব্যাপ্ত অদৃশ্য গন্ধের মত — 'পদ্ম-গন্ধ হয় তাহার স্থিতি'। তাই সেই 'মনের মানুষ'কে আমাদের জীবনের মধ্যে ধরতে হলে জীবনকে আগে একটি ফুলের মতন পূর্ণ প্রস্ফুটিত করে তুলতে হবে। এই জীবনের ফুলকে পূর্ণ প্রস্ফুটিত করে তুলতে হলে নিরন্তর সাধনা এবং অসীম ধৈর্যের প্রয়োজন,— ব্যস্ততার দ্বারা আর যা করাই সম্ভব হোক না কেন, তাতে কখনও ফুল ফোটান সম্ভব নয়। আমরা জানি, আলোর স্পর্শ না পেলে ফুলের পাপড়ি খোলে না — সেই আলোর স্পর্শের পরিবর্তে যদি বৈজ্ঞানিক উপায়ে খানিকটা তাপ দেওয়া যায় তাতে ফুলের কুঁড়ি ফুটে ওঠে না, শুকিয়ে ঝরে পড়ে। এই কথাটিই প্রকাশ পেয়েছে অতি সংযতভাবে — অথচ অপূর্বগভীর ব্যঞ্জনায় একটি বাউলের গানে। —

ওরে নিঠুর গরজি,
তুই কি মানস-মুকুল ভাজবি আগুনে।
তুই কি ফুল ফুটাবি বাস ছুটাবি সবুর বিহনে ॥

অধৈর্য হয়ে গরজের আগুনে 'মানস-মুকুল'কে ভাজা যেতে পারে — ফুটান যায় না। অতন্দ্র দীর্ঘ সাধনার ফলেই সেই 'মানস-মুকুল'কে প্রস্ফুটিত করে তোলা সম্ভব। তার সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত আমাদের দুই চোখের সম্মুখেই। এই যে অন্তরালবাসী এক মালী বিরাট বিশ্বের ফুলটি ফুটিয়ে তুলছেন, তা ঠিক একদিনে ফুটে ওঠে নি —

ওই দেখ আমার পরমগুরু সাঁই —
সে যে যুগযুগান্তে ফুটায় রে ফুল তাড়াহুড়া নাই ॥

এই বিশ্বসৃষ্টিই জীবন্ত বেদ — বিরাট সৃষ্টিফুলের পাপড়িতে-পাপড়িতে লেখা সত্য— সেখান থেকেই করতে হবে সত্যের আবিষ্কার ; সেখান থেকেই বুঝতে হবে জীবনের ফুলকে কি করে আস্তে-আস্তে ফুটিয়ে তুলতে হয় — এবং তারপরে সেই পূর্ণবিকশিত চিত্তশতদল থেকে কি করে 'মনের মানুষ'-এর সন্ধান গ্রহণ করতে হয়।

পদ্মফুলের দৃষ্টান্ত বাউলদের গানের ভিতরে নানাভাবে দেখা দিয়েছে। পদ্মফুল ফোটে পৃথিবীর পঙ্কে — কিন্তু একনিষ্ঠ ধ্যান তার আলোর, দয়িত সূর্যের। সেই আলোর দেবতা প্রেমের কিরণ ছড়িয়ে না দেওয়া পর্যন্ত কমল তার চোখ খুলতে চায় না, — এইখানে তার প্রেমের একনিষ্ঠা। তাই আকাশে অরুণ আলোর ভিতর দিয়ে সূর্যের প্রকাশের পূর্বেই যদি কেউ কমলকে পাপড়ি মেলে চোখ খুলতে বলে, কমল মাথা নেড়ে জবাব দেয় —

আমি মেলব না মেলব না নয়ন —
যদি তারে না দেখি মোর প্রথম চাহনে ।

আমাদের বৈষ্ণব সাহিত্যেও দেখিতে পাই, কমলিনী রাধা বলেছে —

শুন লো মরম সই —
যখন আমার জনম হইল
নয়ন মুদিয়া রই ॥

জীবনে প্রথম চোখ খুলে যদি কৃষ্ণদর্শন না ঘটে তবে চোখই খুলবে না—এই ছিল 'কমলিনী' রাধারও সঙ্কল্প !

এই যেমন জীবনের প্রভাতে — জীবনের সন্ধ্যায় আবার —

আমার ডুবল নয়ন রসের তিমিরে ।
কমল যে তার দল গুটাল আঁধারের তীরে ॥

সারা জীবনের একনিষ্ঠ প্রেমসাধনায় রসে ভরে উঠেছে কমলের প্রতিটি অণু-পরমাণু — গভীর রসের তিমিরে তখন আস্তে-আস্তে গুটিয়ে আসে তার দলগুলি — মুদে আসে তার চোখ — তখন আসে শুধু অন্ধকারে রসে ডোবার পালা। এই কমল-জীবনই যথার্থ সাধক-জীবন ; সারা জীবন শুধু জীবনের যা কিছু বর্ণ-গন্ধ — সৌন্দর্য মাধুর্য — সকল উপহার নিয়ে তাকিয়ে থাকা এক পরম দয়িতের দিকে। পলে-পলে রসে ভরে যায় জীবন — তখন আর পাপড়ি মেলে চোখ খুলে থাকতে ইচ্ছা করে না — নিবিড় রসানুভূতির মধ্যে নিজেকে দিতে ইচ্ছা করে নিমজ্জিত করে — বিলীন করে — বলতে ইচ্ছা হয় —

আমার ডুবল নয়ন রসের তিমিরে ।

৫. বাউলসঙ্গীত ও রবীন্দ্রনাথ

মরমী কবি রবীন্দ্রনাথের মানস-বিবর্তনের ইতিহাসে বাউল গানের অপূর্ব সুরসম্পদ, তার অন্তর্নিহিত ত্যাগ ও বৈরাগ্যের আদর্শ এবং প্রেম ও ঈশ্বরের কল্পনার প্রভাব অপরিসীম। কৈশোরে কবিচিত্ত যখন উপনিষদের একেশ্বরবাদে পিপাসার বারি অনুসন্ধানের নিষ্ফল প্রচেষ্টায় মরছিলেন, তখন অকস্মাৎ একটি বাউলের গানে কবির যে-ভাবান্তর উপস্থিত হয়, কবি নিজেই তা বর্ণনা করছেন। —

'What, struck me in this simple song was a religious expression that was neither grossly concrete, full of crude details, nor metaphysical in its rarefied transcendentalism. At the same time it was alive with an emotional sincerity. It spoke of an intense yearning of the heart for the divine which is in Man and not in the temple or scriptures, in images or symbols.' (The Religion of Man)।

তাঁর রচনার অন্যান্য অনেক স্থলেও কবি বাউল গানের উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন। শিলাইদহে বাসকালে তিনি বাউলদের অনেকের সঙ্গে সাক্ষাত-আলোচনার সৌভাগ্য লাভ করেন এবং নিজের রচনাতেও তাদের ভাব-ভাষা-ভঙ্গি ও সুরের আদর্শ জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে অঙ্গীকার করেছেন।

যৌবনাগমের সঙ্গে-সঙ্গে বাউল কবির 'ভাবের মানুষ'-এর কল্পনা রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্তে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। বাল্যে ঠাকুর পরিবারের ঔপনিষদ আদর্শপুষ্ট রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচনায় উপনিষদ-আদর্শের সঙ্গে বাউল-কল্পনার মণিকাঞ্চন-যোগ ঘটিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর আজীবন কাব্যসাধনায় সেই পরমপুরুষের বন্দনা গান করেছেন, যিনি বারংবার আত্মপ্রকাশের পথে আত্মোপলব্ধি করছেন এবং মানবজীবনের মধ্যে যে ঐশীপুরুষের বিরহ-মিলন-লীলার অভিনয় চলছে। রবীন্দ্রকাব্যে এই ব্যক্তিসত্তা ও ঐশীসত্তা 'আমি' ও 'তুমি', 'প্রেমিক' ও 'প্রিয়' নামে অভিহিত। এই 'জীবনেশ্বর' অথবা 'জীবনদেবতা'র প্রেমহার রচনায় রবীন্দ্রনাথই নিঃসন্দেহে বাঙ্‌লার শ্রেষ্ঠ বাউল-কবি।

তৃতীয় পর্ব

নাথ সম্প্রদায়

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ইতিহাস ও ইতিবৃত্ত

সর্বভারতীয় ধর্ম-আন্দোলন হিসাবে নাথধর্মও প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙ্‌লা সাহিত্য তথা অন্যান্য ভারতীয় সাহিত্যের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশে যথেষ্ট সহায়তা করেছে। বাঙ্‌লার নাথধর্ম ও সাহিত্য ভারতের অন্যান্য প্রদেশ এবং নেপাল-তিবৃত-প্রভৃতি হিমালয়-সন্নিহিত প্রদেশের ইতিহাসের সঙ্গে সম্পৃক্ত। প্রধানত নাথগুরুদের রচিত এবং অধিকাংশ গোরক্ষনাথের রচিত বলে কথিত অনেক সংস্কৃত যোগগ্রন্থ আবিষ্কৃত হয়েছে। বাঙ্‌লা নাথসাহিত্য বলতে কয়েকটি গাথাকাব্য এবং কতকগুলি যোগমার্গীয় গানকেই বুঝায়।

বাঙলা নাথ-সাহিত্যে সাধারণত দুটি-উপাখ্যান পাওয়া যায়। একটি উপাখ্যান 'গোরক্ষ-বিজয়' নামে খ্যাত — এর প্রধান বিষয়বস্তু হল, 'কদলীর দেশ'-এর রমণীগণের মায়ায় আদিনাথ, গুরু মৎস্যেন্দ্রনাথ বা মীননাথের (নাথসাহিত্যে বহু স্থানে মৎস্যেন্দ্রনাথ এবং মীননাথকে অভিন্ন বলেও বর্ণনা করা হয়েছে — আবার পৃথক বলেও বর্ণনা করা হয়েছে) পতন এবং তদীয় শিষ্য মহাযোগী গোরক্ষনাথ-কর্তৃক তাঁর উদ্ধার। আত্ম-বিস্মৃত গুরু মীননাথকে আত্ম-সচেতন করে তোলবার জন্য নর্তকী সেজে যোগী গোরক্ষনাথ যে সমস্ত হেঁয়ালিপূর্ণ গান করেছেন (যাতে গুরু-ভিন্ন আর কেউই কিছু বুঝতে না পারে) সেই গানের মধ্য দিয়েই নাথ-সাধনার সকল গুহ্যতত্ত্বের আভাস দেওয়া হয়েছে। অন্য উপাখ্যানের বিষয়-বস্তুর অবলম্বন বাঙলার রাজা মাণিক্যচন্দ্র, তাঁর যোগিনী স্ত্রী ময়নামতী এবং তাঁদের পুত্র গোপীচাঁদ বা গোবিন্দচন্দ্র রাজা। যোগের শক্তিতে যমের উপরে — অর্থাৎ মৃত্যুর উপরেও যে কতখানি প্রভুত্ব লাভ করা যেতে পারে তাই-ই এই উপখ্যানের মূল কথা ; সেই মূল কথাই গ্রাম্য কবিগণের কল্পনায় বিচিত্ররূপে পল্লবিত হয়ে দেখা দিয়েছে। এই উপাখ্যানের বিভিন্ন অংশ নিয়ে বিশেষ করে রাজা গোপীচাঁদ বা গোবিন্দচন্দ্রের সন্ন্যাসকে অবলম্বন করে একাধিক কবির কাব্য পাওয়া যায়। ঐ কাহিনীটি শুধু বাঙলায় নয়, ভারতবর্ষের বহু অঞ্চলে যোগধর্মের মহিমার সঙ্গে একটি করুণ বিষাদের সুর মিশ্রিত করে বহু ভাষায় কাব্য ও নাট্যের রূপ লাভ করেছে। বাঙলায় গোপীচাঁদ বা গোবিন্দচন্দ্রকে অবলম্বন করে যে গাথাগুলি লিখিত হয়েছে তার রচয়িতাদের মধ্যে মুসলমান কবিও ছিলেন।

বাঙলা দেশের নাথ-সাহিত্যের মধ্যে আমরা যে-সকল নাথগুরুগণের উল্লেখ পাই তাঁদের মধ্যে প্রধান হচ্ছেন মীননাথ, গোরক্ষনাথ বা গোরখনাথ (বা গোর্খনাথ), জালন্ধরী বা হাড়ি-পা এবং কানু-পা, — মনুষ্য-গুরুগণের মধ্যে মীননাথ বা মৎস্যেন্দ্রনাথই প্রথম গুরু বলে কথিত। মীননাথকে কোনও ব্যক্তি-বিশেষ মনে না করে কখনও-কখনও তাকে একটা যোগের পরমাবস্থা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। গোরক্ষনাথকে যেমন অনেক উপাখ্যান ও কিংবদন্তীতে গোরুর সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে, মীননাথকে তেমনই মাছের সঙ্গে যুক্ত করতে দেখা যায়।

নেপালে মৎস্যেন্দ্রনাথ অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্বের সঙ্গে অভিন্নরূপে পূজিত। মীননাথ আদিগুরু হলেও নাথগুরু রূপে এবং পরমযোগী রূপে মীননাথ-শিষ্য গোরক্ষনাথের প্রসিদ্ধিই সমধিক। বহুস্থানে তিনি যোগীশ্বর মহাদেবের অবতার বলে বর্ণিত ও পূজিত। ভারতবর্ষের সর্বত্র তাঁর এত প্রসিদ্ধি বলেই বহুস্থানে তাঁর সম্বন্ধে লৌকিক-অলৌকিক অসংখ্য উপাখ্যান ও কিংবদন্তী গড়ে উঠেছে। গোপীচাঁদ-উপাখ্যানের মধ্যে আবার জালন্ধরী-পা বা হাড়ি-পার প্রাধান্যই পরিলক্ষিত হয়। তিব্বতী-প্রবাদ অনুসারে, জালন্ধরী-পা পূর্বে ছিলেন বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য বাল-পাদ — সিন্ধুদেশের এক শূদ্রপরিবারে তাঁর জন্ম। এই হাড়ি-পার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন রাণী ময়নামতীর পুত্র গোপীচাঁদ। হাড়ি-পার অন্যতম যোগ্য শিষ্য ছিলেন কানু-পা।

১. নাথধর্মের উদ্ভব

নাথধর্মের উৎপত্তি ও আন্দোলনের ইতিহাস আজও কাহিনী ও উপকথার রহস্যে আবৃত। তবুও ভারতের জনচিত্তে সুদীর্ঘকাল ধরে এর প্রভাবও বিস্ময়কর।

নাথধর্ম প্রধানত যোগধর্ম—এর প্রধানগণ নাথ নামে অভিহিত। প্রামাণ্য সংস্কৃত গ্রন্থে নাথ শব্দের অর্থ এক পরমস্বরূপ অবস্থা। নাথধর্মের উৎপত্তি ও প্রকৃতি সম্পর্কে অসংখ্য মত প্রচলিত। অনেকের মতে, এটি শৈবমতে রূপান্তরিত এক শ্রেণীর গুহ্য বৌদ্ধসম্প্রদায়। কারও মতে, এটি মুখ্যত শৈবধর্ম এবং পরবর্তীকালে গুহ্য বৌদ্ধধর্মের সংস্পর্শে উভয়ের মিলিতরূপ। কিন্তু নাথগণকে ভারতের এক সুপ্রাচীন সিদ্ধ সম্প্রদায়েরই উত্তরসূরী মনে হয় — যাদের আদর্শ ছিল কায়সাধন বা দেহসংস্কারের দ্বারা আধ্যাত্মিক জীবন লাভ।

এই সিদ্ধগণের চরম লক্ষ্য ছিল কায়সাধনের দ্বারা 'জীবন্মুক্তি'। তাঁরা কায়সাধনের দ্বারা এই পাঞ্চভৌতিক দেহকেই সংস্কার করে অমরত্ব লাভ করা অথবা এই দেহকেই নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় নির্বস্তুক করে অতীন্দ্রিয় 'দিব্যদেহ' লাভ করা সম্ভব বলে মনে করতেন। এই কায়সাধন রসায়ন-সাধনার সঙ্গে সম্পর্কান্বিত এবং অনেকাংশে তার উপরেই প্রতিষ্ঠিত বলে অনেকে অনুমান করেন। 'সর্বদর্শন-সংগ্রহ'-এ 'রসেশ্বর-দর্শন' নামে যে-একটি পৃথক দার্শনিক মতের অবতারণা করা হয়েছে, তার সূত্রসমূহ রসায়ন-গ্রন্থের আলোকেই আলোচিত হয়েছে। কিন্তু সেখানে একে শৈবমত বলা হয়েছে। খ্রীষ্টজন্মের বহুপূর্ব হতেই এই রসায়ন-বিজ্ঞান পৃথিবীর নানা দেশে পরিচিত ছিল। কিন্তু ভারতে এই বিজ্ঞানকে কেন্দ্র করে একটি ধর্ম-সম্প্রদায় গড়ে উঠেছে। ডাঃ রমন শাস্ত্রী বলেন, খ্রীষ্টপূর্ব যুগে চীন থেকে আগত 'তাও' মতাবলম্বী 'ভোগ' নামক এক সাধকের নিকটই এই সিদ্ধগণ সর্বতোভাবে ঋণী।

বিখ্যাত যোগদর্শনকার পতঞ্জলি (খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ শতক) তাঁর যোগসূত্রের 'কৈবল্যপাদ'-এ বলেছেন, রসায়ন-যৌগিগণ ওষধি-প্রয়োগে সিদ্ধি লাভ করতেন। রসায়ন-সম্প্রদায়ের এই রস নাথসিদ্ধদের দেহমধ্যস্থ সর্বোচ্চচক্র সহস্রারে অবস্থিত চন্দ্রক্ষরিত অমৃতধারায় পরিণত হয়ে হঠযোগে রূপান্তরিত হয়েছে। অতএব রসায়ন সাধনাই সিদ্ধমার্গের উৎস। বৃহৎ-জাবালোপনিষদে নাথসিদ্ধদের চন্দ্রসূর্য ও চন্দ্রক্ষরিত অমৃতধারা পানের কল্পনা আলোচিত হয়েছে ; আরও উক্ত হয়েছে যে, পতঞ্জলির বহুপূর্ব থেকেই একশ্রেণীর যোগিসম্প্রদায়ের রসায়ন-সাধনার দ্বারা দেহের অবিনশ্বরত্ব ও নানাবিধ আলৌকিক শক্তি লাভই ধর্মজীবনের আকাঙ্ক্ষিত ছিল। অতএব একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, নাথযোগিগণের ইতিহাস পতঞ্জলির বহুপূর্ব থেকেই আরম্ভ হয়েছে ।

সুতরাং নাথধর্ম শৈবমত-প্রভাবিত গুহ্য বৌদ্ধধর্ম নয়। পূর্ব ভারতে, বিশেষত নেপাল তিব্বত-প্রভৃতি হিমালয়-সন্নিহিত প্রদেশে নাথসিদ্ধদের অনেক আচার-অনুষ্ঠান বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণের ক্রিয়াকলাপ, আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে মিশে গেছে — তা থেকেই উক্ত ধারণার উদ্ভব মনে হয়। তান্ত্রিক, বৌদ্ধ, শাক্ত বা শৈব সকল গুহ্যসাধনার গভীরেই রয়েছে দুটি উপাদান—একটি, অহিন্দু-অবৌদ্ধ ভারতের সুপ্রাচীন লৌকিক আচার-অনুষ্ঠান ; অন্যটি, একই লক্ষণাক্রান্ত যৌগিক উপাদান। ভারতের ধর্ম-ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায়ে এই পরস্পর-বিরোধী লৌকিক অনুষ্ঠান ও যৌগিক প্রক্রিয়া হিন্দু ও বৌদ্ধ দর্শনের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিলিত হয়ে অসংখ্য গুহ্য সাধন-প্রণালীর জন্মদান করেছে।

হিন্দুতন্ত্রের মূলে যেমন শিবশক্তি ও সৃষ্টিতত্ত্ব, বৌদ্ধতন্ত্রের মূলে তেমনই প্রজ্ঞা ও উপায়তত্ত্ব। বৌদ্ধতন্ত্রে ভগবান বুদ্ধ (প্রভু বজ্রসত্ত্ব, হেবজ্র বা হেরুক) হিন্দুতন্ত্রের শিবের মতই গুহ্যযোগের আদিগুরু। নাথ-সম্প্রদায়ের আদিস্থানীয় আদিনাথই সর্বযোগের গুরু। এই আদিনাথ হিন্দুদের শিব অথবা বৌদ্ধদের বজ্রসত্ত্ব-ভিন্ন অপর কেউ নন — বৌদ্ধতন্ত্রের বজ্রসত্ত্ব বা হেবজ্র এবং হিন্দুতন্ত্রের শিব এইজন্যই আদিনাথ বা ভূতনাথ নামে আখ্যাত। অনেক হিন্দু ও বৌদ্ধতন্ত্র যেমন দেবদেবীর কথোপকথনের আকারে রচিত — নাথ-সাহিত্যেও তেমনই যোগের গূঢ়তত্ত্ব ক্ষীরোদ-সরোবরে দেবীর নিকট ব্যাখ্যাত হবার সময় গুরু মৎস্যেন্দ্রনাথকে শুনতে দেখা যায়। নাথসাহিত্যেও বৌদ্ধগণের চন্দ্রসূর্যতত্ত্ব ও বৌদ্ধসহজিয়া সম্প্রদায়ের সহজাবস্থা, সহজ-সমাধি বা শূন্যসমাধির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। 'অকুলবীরতন্ত্রে' (রচয়িতা মৎস্যেন্দ্রনাথ?) সহজাবস্থায় যে অদ্বয়বোধ বা অদ্বয়সত্ত্বা লাভ করা যায়, তার বর্ণনায় বলা হয়েছে — 'স্বয়ং দেবী, স্বয়ং দেব, স্বয়ং শিষ্য, স্বয়ং গুরু। স্বয়ং ধ্যান স্বয়ং ধ্যাতা স্বয়ং সর্বত্র দেবতা'। বৌদ্ধতন্ত্রে, দোহা ও গানে এবং নাথ ভাষা-সাহিত্যেও সহজের উক্তরূপ কল্পনা দৃষ্ট হয়। হঠযোগের প্রামাণ্য গ্রন্থ 'হঠযোগ দীপিকায়' যোগের চার পর্যায়ের সঙ্গে (শূন্য অতিশূন্য, মহাশূন্য ও সহজশূন্য বা সর্বশূন্য) চার নাদের কল্পনা রয়েছে। তা ছাড়া সংস্কৃত ও ভাষা নাথসাহিত্যে দেহাভ্যন্তরস্থ পীঠ, উপপীঠ, ক্ষেত্র, উপক্ষেত্র, সন্দোহ প্রভৃতি তীর্থের কল্পনাও তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্মের অনুরূপ। শুধু তাই নয়, এঁদের যৌগিক পরিভাষাও অন্যান্য গুহ্য যোগপন্থীদের সঙ্গে প্রায় অভিন্ন।

সকল গুহ্য সাধনারই উদ্দেশ্য হঠযোগ-প্রক্রিয়ায় কায়সাধনা। বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব সহজিয়াদের মহাসুখ অথবা পরম প্রেমের সহজ-স্বরূপোপলব্ধির পক্ষে কায়সাধনা অপরিহার্য।

বৌদ্ধ তান্ত্রিক ও নাথধর্মের এই সাদৃশ্য ও মিশ্রণের ফলেই উভয়ের কাহিনীর মধ্যে আশ্চর্য ঐক্য লক্ষিত হয়। কিন্তু কাহিনী, উপকথা ও ঐতিহ্যে নাথধর্ম শৈব-সম্প্রদায়ের কাছে ঋণী। নাথ-সম্প্রদায়ে গোরক্ষনাথ শিবের সঙ্গে অভিন্ন। দেবতাগণের মধ্যে শিবই তালিকার শীর্ষে অবস্থিত — শৈব তীর্থ এবং শিবলিঙ্গ বা শিববিগ্রহ-অধ্যুষিত মন্দিরই তাঁদের তীর্থ ; তাঁদের বহির্বেশ যোগিশ্রেষ্ঠ শিবেরই অনুরূপ। ভাষাসাহিত্যে নাথসিদ্ধগণের শিবের মতোই গঞ্জিকা ও সিদ্ধিতে আসক্তি এবং কণ্ঠে স্বতঃই 'বম্ বম্' শব্দ উচ্চারিত। 'বল্লাল-চরিত'-এ বাঙ্‌লার যোগিদের পুরোহিতগণকে 'রুদ্র-ব্রাহ্মণ' বলা হয়েছে এবং বর্তমান কালেও তাঁরা নিজেদের শিবগোত্র বলে থাকেন।

ধর্মাচরণে এই সাদৃশ্যের জন্যই নাথযোগি ও উত্তরকালের বৌদ্ধধর্মগুরুগণ অনেকস্থলে অভিন্ন হয়ে গেছেন। নাথ-সম্প্রদায়ের আদিগুরু মৎস্যেন্দ্রনাথ নেপালে অবলোকিতেশ্বর রূপে পূজিত হন এবং আজও সেখানে মৎস্যেন্দ্রনাথের সম্মানার্থে বাৎসরিক শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত

হয়। তিব্বতে মৎস্যেন্দ্রনাথ বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণের আদিস্থানীয় লুই-পার সঙ্গে অভিন্ন। ২১ সংখ্যক চর্যার সংস্কৃত টীকায় চর্যাপদের অনুরূপ ভাষায় একটি উদ্ধৃতির রচয়িতা মীননাথ বা মৎস্যেন্দ্রনাথ বলে উল্লিখিত — এ থেকে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী অনুমান করেন, নাথযোগিগণ (তাঁর মতে সিদ্ধাচার্যগণের কিছু পরবর্তীকালের) বৌদ্ধসিদ্ধাচার্যগণের অনুরূপ বাঙ্‌লা গান রচনা করতেন। কিন্তু অসংখ্য সংস্কৃত ও হিন্দি গ্রন্থ গোরক্ষনাথের রচনা বলে কথিত হলেও তাঁর নামে কোন বাঙ্‌লা গ্রন্থ পাওয়া যায় নি — অথবা কোথাও তাঁকে বাঙ্‌লা গ্রন্থের রচয়িতা বলা হয় নি। গোরক্ষনাথের নামে প্রচলিত গ্রন্থগুলি পরবর্তীকালের রচনা বলেই মনে হয়।

উত্তরকালের বৌদ্ধগণ ও শৈব গুহ্যযোগিগণের এই সাদৃশ্যের জন্যই এইরূপ ধারণার উৎপত্তি হয়েছে যে, নাথসিদ্ধগণ — এমনকি গোরক্ষনাথও — বৌদ্ধ-সম্প্রদায় সম্ভূত। তারনাথের মতে, বৌদ্ধ ধর্মে থাকা কালে গোরক্ষনাথের নাম ছিল অনঙ্গবজ্র — হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে, তাঁর বৌদ্ধ নাম রমণবজ্র। আরও কথিত আছে যে, নেপালী বৌদ্ধগণ গোরক্ষনাথকে ধর্মত্যাগী বলে ঘৃণা করেন। শ্রদ্ধেয় শরৎচন্দ্র দাস বলেন যে, গোচারক 'গৌরক্ষ' তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হয়ে গৌরক্ষমুনি নামে অভিহিত ও নাথ-উপাধি লাভ করেন এবং তৎসম্প্রদায় যোগিসম্প্রদায় নামে পরিচিত হয়। এই সকল জনশ্রুতির মধ্যে তেমন সত্য না থাকলেও, এটুকু অনস্বীকার্য যে, মীননাথ, মৎস্যেন্দ্রনাথ, গোরক্ষনাথ, জালন্ধরী, চৌরঙ্গিনাথ প্রভৃতি নাথধর্ম-প্রচারকগণ সকলেই সিদ্ধাচার্য ছিলেন — সম্ভবত গুহ্য বৌদ্ধধর্মের কতিপয় গ্রন্থ তাঁদের নামে প্রচারিত এবং পরবর্তীকালে তিব্বতীয় ভাষায় অনূদিত হয়েছিল।

ডক্টর বেণীমাধব বরুয়া বলেন — বাঙ্‌লা ও অন্যান্য স্থানের নাথধর্মের মধ্যে আজীবকগণের ধর্ম ও সাধন-প্রণালীর সূত্র পাওয়া যায়। তিনি আজীবক ও নাথগণের নিম্নরূপ সাদৃশ্য দেখিয়েছেন।—

(১) উভয় সম্প্রদায়েই তিনটি ব্যক্তি পূজিত হয়েছেন — আজীবক : নন্দ-বৎস, কৃষ্ণ-সাংকৃত্যায়ন ও মস্করিণ গোশাল। নাথ : মীননাথ, মৎস্যেন্দ্রনাথ ও গোরক্ষনাথ।

(২) উভয় সম্প্রদায়েই ধর্মভাবের প্রকাশে নৃত্যগীতের ব্যবহার দেখা যায়।

(৩) উভয় সম্প্রদায়ই বিশ্বাস করেন যে, মানবজন্ম লাভ করবার পূর্বে আত্মাকে চুরাশি-লক্ষ পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে আসতে হয়।

(৪) উভয় মতেই প্রাণায়ামের দ্বারা হঠযোগ-অভ্যাসে অনন্তমানসই চরম লক্ষ্য।

(৫) উভয়কেই 'পরম-তপস্‌সিতা', 'পরম-লুখতা', 'পরম-যেগুচ্ছিতা' ও 'পরম-পবিবিত্ততা'— এই চতুর্বিধ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়।

(৬) উভয়েই আত্মার পরম শুক্ল, অবধূত অথবা নিরঞ্জন রূপের উপাসক।

কিন্তু আজীবক ও নাথসিদ্ধগণের এই আপাত-সাদৃশ্য সত্ত্বেও, উভয় ধর্মের চিন্তাধারার সাজাত্য আছে বলে মনে হয় না। হঠযোগ ভারতের অসংখ্য ধর্মসাধনায় প্রচলিত — কোন বিশেষ সম্প্রদায়ে সীমাবদ্ধ নয়। অবশ্য উত্তর ও পূর্ববঙ্গের ত্রিনাথের কল্পনা, পূজাপদ্ধতি ও লোকগাথা ডাঃ বরুয়ার প্রথম সাদৃশ্য সমর্থন করে। ডাঃ বরুয়ার দ্বিতীয় সাদৃশ্য সম্বন্ধে বলা যায়, গোরক্ষনাথ কদলী দেশ থেকে স্বীয় গুরুকে উদ্ধার করবার কৌশল হিসাবেই যোগ-প্রভাবে নর্তকীবেশ ধারণ করেছিলেন — নৃত্যগীত নাথধর্মের অপরিহার্য অঙ্গ নয়। অনেক কানফট্ যোগী দ্বারে-দ্বারে গান করে ভিক্ষার্জন করেন, কিন্তু তা ভিক্ষাজীবীর সাধারণ কৌশলমাত্র। ডাঃ বরুয়ার তৃতীয় সাদৃশ্য সম্বন্ধে বলা যায়, চুরাশি একটি গুহ্যার্থক সংখ্যা — এইরূপ কল্পনা

শুধু নাথধর্মেরেই নয়, অন্যান্য সম্প্রদায়ের অসংখ্য সংস্কৃত ও ভাষা গ্রন্থেও দৃষ্ট হয়। বরুয়ার চতুর্থ ও পঞ্চম সাদৃশ্য লক্ষণীয় — কারণ, আজীবক ও নাথগণ উভয়েই হঠযোগে অভ্যস্ত ছিলেন। বরুয়ার ষষ্ঠ সাদৃশ্য অস্পষ্ট।

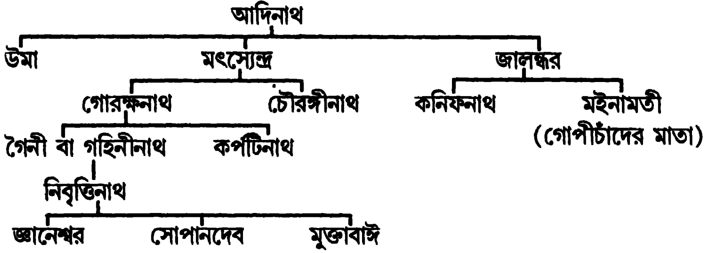
২. চুরাশি সিদ্ধ ও নবনাথের প্রবাদ

যে-সকল যোগী যোগসাধনায় পূর্ণতা লাভ করেছেন তাঁরাই সিদ্ধ (ভাষাগ্রন্থে সিদ্ধা) উপাধিতে ভূষিত হন। বৌদ্ধ সহজিয়া যোগী, সিদ্ধাচার্য ও নাথযোগিগণ সিদ্ধ নামে অভিহিত— সেজন্যই তাঁদের মিশ্রণ ঘটে গেছে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সিদ্ধগণের এইরূপ মিশ্রণের ফলেই চুরাশি সিদ্ধের কল্পনার উদ্ভব। 'হঠযোগ-প্রদীপিকা'য় মহাসিদ্ধ যোগিগণের যে-তালিকা আছে, 'বর্ণরত্নাকর'-এর তালিকায় অনেক প্রধান সিদ্ধের নাম তার সহিত অভিন্ন। তিব্বতীয় বৌদ্ধ সম্প্রদায়ে এবং দক্ষিণ ভারতে এই চুরাশি সিদ্ধের প্রবাদ বর্তমান।

চুরাশি সিদ্ধের কল্পনা বাঙলার নাথ সাহিত্যে এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতের সন্ত ও সূফী সাহিত্যেও বিরল নয়। সেজন্য অনেকে এই চুরাশি সংখ্যাকে একটি গুহ্যার্থক সংখ্যা বলে গ্রহণ করেছেন। আজীবকগণের বিশ্বাসে আত্মার চুরাশি লক্ষ জন্মের মধ্য দিয়ে মানবাত্মায় পরিণতি। মৈত্রায়নী উপনিষদে জন্মের চুরাশি সহস্র পর্যায়। তন্ত্রপুরাণে চুরাশি যোনি বা জন্মের বর্ণনা দৃষ্ট হয়। বৌদ্ধ ধর্মস্কন্ধও চুরাশি অথবা চুরাশি লক্ষ। পালি 'গন্ধবংশ'-এ কথিত হয়েছে, যিনি চুরাশি লক্ষ ধর্মস্কন্ধাত্মক পালি গ্রন্থের টীকা রচনা করবেন, অথবা অন্যকে রচনায় উৎসাহিত করবেন, তিনি চুরাশি সহস্র বুদ্ধ-বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠিত চুরাশি সহস্র মঠ-প্রতিষ্ঠার দ্বারা চুরাশি-সহস্র বৌদ্ধ-তীর্থ নিমার্ণের পুণ্য লাভ করবেন। উত্তরকালের বৌদ্ধগ্রন্থসমূহেও ঐরূপ বর্ণনার অভাব নেই। পালি 'অনাগত বংশ'-এ উক্ত হয়েছে, পরবর্তী বুদ্ধ মৈত্রেয় আবির্ভূত হয়ে যখন করুণার প্রবাহে পৃথিবী সিক্ত করবেন, তখন চুরাশি সহস্র অনুসঙ্গী রাজকুমার ও চুরাশি সহস্র বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ তাঁর অনুগমন করবেন। যোগ ও তন্ত্রে যোগাসন চুরাশি প্রকার, অনেকস্থলে চুরাশি লক্ষ — কারণ চুরাশি লক্ষ পর্যায়ের মধ্য দিয়েই জীবের বিবর্তন হয়। কানফট্ যোগিদের জপমালার গুটিকা চুরাশিটি। 'স্কন্দপুরাণের চুরাশি অধ্যায়ে চুরাশি শিবলিঙ্গের বর্ণনা আছে। অতএব দেখা যাচ্ছে, চুরাশি একটি গুহ্যার্থক বিশেষ সংখ্যা এবং চুরাশি সিদ্ধ সম্পর্কে জনশ্রুতির মধ্যে কোন ঐতিহাসিক সত্য নেই।

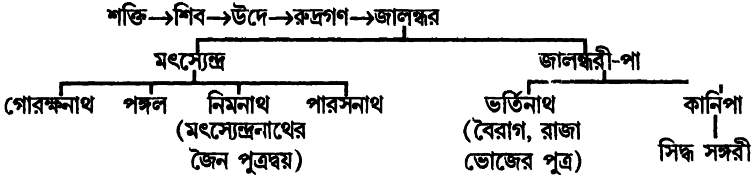
এই চুরাশি সিদ্ধের কল্পনার পাশাপাশি রয়েছে নবনাথের কল্পনা। কানফট্ যোগে দীক্ষিত হবার সময়ে চুরাশি সিদ্ধ ও নয়জন নাথের পূজা করা হয়। কিন্তু নবনাথের কাহিনী ও তালিকাও সর্বত্র একরূপ নয়। 'গোরক্ষ-সিদ্ধান্ত-সংগ্রহ'-এ বিভিন্ন যুগে তন্ত্রোপদেষ্টা নবনাথের উল্লেখ আছে—আবার বিভিন্ন দিকে তাঁদের অবস্থিতিও কল্পিত হয়েছে : পূর্বে গোরক্ষনাথ (জগন্নাথ অরণ্যে ?), উত্তরে জালন্ধর (উত্তরাপথে জ্বালামুখী অরণ্যে?), দক্ষিণে নাগার্জুন (গোদাবরী সন্নিহিত অরণ্যে ?), দত্তাত্রেয় (নদী সরস্বতীর নিকট ?), দেবদত্ত (দক্ষিণ-পশ্চিমে), জড়ভরত (উত্তর-পশ্চিমে?), আদিনাথ (মধ্যদেশ কুরুক্ষেত্রে), মৎস্যেন্দ্রনাথ (দক্ষিণ-পূর্ব সমুদ্রসৈকতে)। নাথ কাপালিকগণের মতে, এই দ্বাদশ পুরুষের নিকট আদি ধর্মসত্য উদঘাটিত হয় : আদিনাথ, অনাদি, কাল, বৈকালিকা, করাল, বিকরাল, মহাকাল, কালভৈরবনাথ, বটুক, ভূতনাথ, বীরনাথ ও শ্রীকণ্ঠ। দ্বাদশ ব্যক্তি এই মতের প্রতিষ্ঠা করেন : নাগার্জুন, জড়ভরত, হরিশ্চন্দ্র, সত্যনাথ, ভীমনাথ, গোরক্ষ, কর্পট, অদ্বয়, বৈরাগ্য, কন্থাধারী, জালন্ধর ও মলয়ার্জুন।

অন্যত্র নবনাথের উল্লেখ দেখা যায় : গোরক্ষনাথ, মৎস্যেন্দ্রনাথ, কর্পটিনাথ, মঙ্গলনাথ, যুগনাথ, গোপীনাথ, প্রাণনাথ, সুরথনাথ, কম্বনাথ। নাথগণের মতে এই অমর ধর্মাবতারগণ হিমালয়ের বিভিন্ন শৃঙ্গের অধীশ্বররূপে এখনও বিরাজ করছেন। নাথগুরুদের মারাঠী তালিকা এইরূপ :



বহিনা বাঁঈ-এর শাখার অনুক্রম এইরূপ : আদিনাথ থেকে মৎসেন্দ্রনাথ, মৎস্যেন্দ্রনাথ থেকে গোরক্ষ, গোরক্ষ থেকে গোহিনী, গোহিনী থেকে নিবৃত্তিনাথ, নিবৃত্তিনাথ থেকে জ্ঞানেশ্বর, জ্ঞানেশ্বর থেকে সচ্চিদানন্দ ও বিশ্বম্ভর, বিশ্বম্ভর থেকে রাঘবচৈতন্য, রাঘবচৈতন্য থেকে কেশবচৈতন্য, তাঁর থেকে বাবাজী চৈতন্য, বাবাজী চৈতন্য থেকে তুকারাম, তাঁর থেকে বহিনা বাঈ (১৭০০ খ্রীষ্টাব্দ) যোগের গূঢ়তত্ত্ব শিক্ষা লাভ করেন।

অপর একটি তালিকা এইরূপ :



সন্ত সাহিত্যেও এই নবনাথের নানাপ্রকার তালিকা পাওয়া যায়। এতে প্রমাণিত হয় যে, চুরাশি সিদ্ধ ও নাথ গুরুর এই প্রবাদের মধ্যে কোন ঐতিহাসিক সত্য নেই।

বাঙ্লা গ্রন্থের বিবরণ অনুযায়ী, মীননাথ বা মৎস্যেন্দ্রনাথ (বাঙ্লা গ্রন্থে তাঁরা অভিন্ন) এবং জালন্ধরী-পা (হাড়ি সিদ্ধা নামেই বেশি পরিচিত) আদিনাথ বা শিবের প্রত্যক্ষ শিষ্য ছিলেন। মীননাথের শিষ্য ছিলেন গোরক্ষনাথ এবং গোপীচাঁদের মাতা ময়নামতী ছিলেন গোরক্ষনাথের শিষ্যা। কাহ্ন বা কানু পা এবং রাজা গোপীচাঁদ জালন্ধরী বা হাড়িসিদ্ধার শিষ্য ছিলেন। কানু-পার শিষ্য ছিলেন বাইল ভাদাই। ধর্মমঙ্গল সাহিত্যেও নাথ সিদ্ধদের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। সহদেব চক্রবর্তী ধর্মসাহিত্য ও নাথ সাহিত্যের মিশ্রণ ঘটিয়ে কাহিনী রচনা করেন। অন্যান্য অনেক ধর্মমঙ্গলে ধর্মঠাকুরের পূজায় প্রধান নাথসিদ্ধগণ অবতীর্ণ হয়েছেন । ধর্মপূজাবিধানেও দেবতাগণের সঙ্গে ওই সকল নাথগণের পূজাবিধি উল্লিখিত হয়েছে। বাঙ্লা নাথসাহিত্যে প্রধান নাথগুরু মীননাথ, গোরক্ষনাথ, জালন্ধরী পা, কানু-পা, ময়নামতী, গোপীচাঁদ। নেপাল তিব্বত ও ভারতের নানা স্থানে এই নাথগুরুদের সম্বন্ধে বিচিত্র প্রবাদ-গল্প-কাহিনী বর্তমান আছে। বর্তমান পরিচ্ছেদে তারা আমাদের আলোচ্য নয়।

নবম পরিচ্ছেদ

নাথসিদ্ধদের ধর্মমত

. উপাদানের অপ্রাচুর্য ও বৈসাদৃশ্যে নাথসিদ্ধদের ধর্মমত এখনও গম্ভীর রহস্যাবৃত । কোন সংস্কৃত অথবা সংস্কৃতেতর গ্রন্থে তাঁদের ধর্মমত অথবা যোগপ্রণালীর বিস্তৃত বিবরণ নেই । তাঁদের সংস্কৃত গ্রন্থগুলি হঠযোগ-সম্বন্ধীয় ও ভাষাগ্রন্থগুলি কাহিনী-সর্বস্ব।

১. অতিপ্রাকৃত পরিবেশ

যোগের সাহায্যে গূঢ় শক্তির অধিকারী হওয়া যায় — এই বিশ্বাসের উপরেই নাথধর্মের ভিত্তি। কাহিনীর মধ্যে অন্য কোন অতিপ্রাকৃত পুরুষের অপেক্ষা নাথসিদ্ধদের যাদুবিদ্যারই প্রাধান্য। ভারতীয় ধর্মের ইতিহাসে অথর্ববেদের সময় থেকেই অতিপ্রাকৃতের আধিপত্য শুরু হয়ে তা পরবর্তীকালে হিন্দু, বৌদ্ধ ও অন্যান্য সকল গুহ্য সাধন-প্রণালীতেই অনুপ্রবেশ করেছে। পালি সাহিত্যে-ধর্মসাধনায় 'ইদ্ধি' (ঋদ্ধি) নামক গূঢ় শক্তির এবং দশবল ও ছয় অভিজ্ঞার বর্ণনা আছে। পাতঞ্জলি, যিনি মুখ্যত যোগের মনস্তাত্ত্বিক দিকই আলোচনা করেছেন — একাগ্রতা বা দেহের বিভিন্নস্থানে মনঃসংযোগের দ্বারা বিভিন্ন অতিপ্রাকৃত শক্তি (বিভূতি) লাভের সম্ভাব্যতা স্বীকার করেছেন। যোগশাস্ত্রে শিবের এই অষ্ট শক্তির বর্ণনা আছে : অনিমা (অনু-পরিমাণ ক্ষুদ্র হবার শক্তি), মহিমা (বৃহৎ হবার শক্তি), লঘিমা (লঘু হবার শক্তি), গরিমা (গুরু হবার শক্তি), প্রাপ্তি (ঈপ্সিত বস্তু লাভের শক্তি), প্রাকাম্য (বিলাস-বস্তু লাভের শক্তি), ঈশিত্ব (কর্তৃত্ব লাভের শক্তি) ও বশিত্ব (আকৃষ্ট ও অভিভূত করবার শক্তি)।

নাথসিদ্ধগণ অষ্টশক্তির অধিকারী ছিলেন। গোরক্ষবিজয়ে উক্ত হয়েছে : কোন রাজকন্যাকে শিব গোরক্ষনাথকে পতিরূপে লাভ করবার বর দান করলে, গোরক্ষ ছয় মাসের শিশু হয়ে রাজকন্যার স্তন্যপান করতে চান ; তাতেও রাজকন্যা নিবৃত্ত না হলে গোরক্ষ আপনার জীর্ণ বাস দান করে তা ধৌত করে পান করতে বলেন — এইরূপে রাজকন্যা সন্তানবতী হন। গোরক্ষের নিকট একদিন উড্ডীয়মান কাহ্নপার ছায়া পড়লে, তিনি তাঁকে দারুময় পাদুকা প্রেরণ করে বন্ধন করেন। গোরক্ষ যখন গুরুকে উদ্ধারের জন্য কদলীদেশে প্রবেশ করেন, তখন তাঁর দুই অনুচর লঙ্গ ও মহালঙ্গ বিশ্বকর্মার নিকট থেকে অঙ্গাভরণ আনয়ন করেন — কদলীদেশে নর্তকী-বেশ ধারণের ইচ্ছা করলেও বিশ্বকর্মার নিকট তিনি আভরণ লাভ করেন। মীননাথের মোহভঙ্গ করবার জন্যও তিনি অসংখ্য যোগশক্তি প্রকাশ করেন। ময়নামতী ও হাড়ি সিদ্ধাও অনেক অলৌকিক শক্তির ক্রীড়া প্রদর্শন করতেন। তাঁরা মহাজ্ঞান বা ধ্যানের দ্বারা সমস্ত জানতে পারতেন ; সামান্য হুংকারে তাঁরা অসাধ্য-সাধন করতেন। হাড়ি সিদ্ধার এইরূপ অলৌকিক শক্তির বর্ণনা পাওয়া যায় : তিনি সূর্যচন্দ্রের কর্ণকুণ্ডল ধারণ করেন, ইন্দ্র ও যমপুত্র মেঘনাল তাঁকে ব্যজন করেন, লক্ষ্মী তাঁর অন্নপ্রস্তুত করেন, ইন্দ্রের পঞ্চকন্যা তাঁর ভুক্তাবশেষ পরিষ্কৃত করেন, নাগকন্যাগণ তাঁর তাম্রকূট প্রস্তুত করেন। রাজা গোপীচাঁদ তাঁর নিকট দীক্ষা

গ্রহণের পূর্বে তাঁর অলৌকিক শক্তির পরীক্ষা গ্রহণে ইচ্ছুক হলে, তিনি আশি মণ ধূলির দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে আশি মণ রজ্জু কটিতে ধারণ করে, চুরাশি মণ লৌহমুকুট পরিধান ও তিরাশি মণ লৌহশলাকা ও বিরাশি মণ লৌহ পাদুকা ধারণ করে, বাইশ মণ ডাইল ভক্ষণ করে বাহুদ্বয় ঊর্ধ্বাকাশে, পদদ্বয় পাতালে ও মস্তক কৈলাসপর্বতে প্রসারিত করেন। নাথ সম্প্রদায়ের ভাষাসাহিত্যে নাথসিদ্ধগণের — মুখ্যত গোরক্ষ, হাড়িপা ও ময়নামতীর, এইরূপ অলৌকিক শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। এই সকল অতিপ্রাকৃত কাহিনীর বাস্তবানুগ বর্ণনা ও রাজা গোপীচাঁদের সন্ন্যাসের করুণ কাহিনী নাথ-সাহিত্যকে অপূর্ব কাব্য-সৌন্দর্যে মণ্ডিত করেছে।

বাঙ্লা নাথসাহিত্যের এই অলৌকিকতা তাকে বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব সহজিয়া, বাউল ও অন্যান্য গুহ্য মার্গের সাহিত্য থেকে পৃথক করেছে। বিভিন্ন সহজিয়া সম্প্রদায় ও সূফী কবিগণ ধর্মাচরণের বাহ্যানুষ্ঠানের প্রতি আন্তরিক ঘৃণা প্রকাশ করেছেন। কবীর ও তৎপরবর্তী নানক গোরক্ষযোগিগণের নিন্দা করেছেন।

কিন্তু এই অলৌকিকতা নাথধর্মের বহিরঙ্গের জিনিস। তাঁদের সকল সাহিত্যই এই অতিপ্রাকৃত-দুষ্ট নয়। হিন্দি 'গোরক্ষবোধ' ও অন্যান্য স্থানে প্রমাণিত হবে যে, নাথধর্ম ও সহজিয়া সম্প্রদায়গুলির মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির কোনই পার্থক্য নেই। গোরক্ষের নামে উদ্দিষ্ট বিভিন্ন সংস্কৃত গ্রন্থ, 'গোরক্ষসিদ্ধান্ত-সংগ্রহ' ও 'সিদ্ধসিদ্ধান্ত-পদ্ধতি'তে যোগসাধনায় পদ্ধতি, লক্ষ্য প্রভৃতি অন্যান্য যৌগিক গ্রন্থের আদর্শেই আলোচিত এবং সেখনে চিরাচবিত পদ্ধতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সুস্পষ্ট। এই সকল বর্ণনায় বৌদ্ধ সহজিয়াদের মত অদ্বয়াবস্থাই যোগসাধনাব আদর্শ। বাঙ্লা নাথসাহিত্যেও গোপীচাঁদের দীক্ষাকালে অনুরূপ আদর্শের মহিমা গান করা হয়েছে।

নাথধর্মের লক্ষ্য শুধু হঠযোগ-অভ্যাসের দ্বারা কতকগুলি গূঢ় শক্তির অধিকারী হওয়া— এইরূপ ধারণা ভ্রমাত্মক। নাথসাহিত্যের এই সকল কাহিনীর মূলে অনভিজ্ঞ গ্রাম্য কবির হৃদয়গ্রাহী কল্পনাই মুখ্য। লোকসাহিত্যের কাহিনীর মধ্যেও যেখানে স্থির আদর্শের অকম্পিত শিখা ঝলসিত হয়েছে, তার সাহায্যেই এর অন্তর্নিহিত সত্যের পরিচয় পাওয়া যাবে।

২. নাথসিদ্ধদের আদর্শ

এই মরণশীল দেহকে হঠযোগের সাহায্যে মৃত্যুঞ্জয় করে অমর শিবতনু বা বৈন্দবতনু লাভই নাথসিদ্ধদের সাধনার চরম লক্ষ্য। মন্ত্রযোগ, লয়যোগ, রাজযোগে যেমন চিত্তবৃত্তির নিরোধের দ্বারা ভবনির্বাণচক্র থেকে মুক্তি লাভের আদর্শবাদী দার্শনিকতার প্রাধান্য, হঠযোগ তেমন ক্ষয়, আময় ও মৃত্যু নিরোধের জন্য প্রযুক্ত এক দৈহিক ও দেহতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া। যোগের বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় নিরাময়, কালজয়ী ও মৃতুঞ্জয় হবার বিভিন্ন পথ নির্দিষ্ট হয়েছে। পতঞ্জলি হঠযোগকে অন্যান্য যোগের আনুষঙ্গিক সম্পূর্ণ দৈহিক প্রক্রিয়া হিসাবেই দেখেছেন। চিত্তবৃত্তির নিরোধই পূর্ণ মুক্তির সহায়ক — পূর্ণমুক্তিতে পুরুষ বা দ্রষ্টা তাঁর স্বয়ং-স্বরূপে অধিষ্ঠিত। প্রামাণ্য হঠযোগ গ্রন্থে মনের নিরোধই যোগসাধনার লক্ষ্য এবং হঠযোগ রাজযোগের অধীন বলা হয়েছে। সুতরাং অন্যান্য যৌগিক প্রক্রিয়া হতে হঠযোগের পদ্ধতি ও মুক্তির আদর্শ সম্পূর্ণ পৃথক। হঠযোগের লক্ষ্য প্রথমে সিদ্ধদেহ এবং তৎপরে দিব্যদেহ লাভ।

অন্যান্য সম্প্রদায়ের লক্ষ্য এই পাঞ্চভৌতিক দেহত্যাগের পর বিদেহ মুক্তি। কিন্তু নাথসিদ্ধদের লক্ষ্য জীবন্মুক্তি বা এই দেহকেই অমর করে সিদ্ধদেহ বা দিব্যদেহ লাভ। এটি অশুদ্ধমায়ামুক্ত অবিনশ্বর আধ্যাত্মিক দেহ এবং বিশুদ্ধ মায়াপ্রভাবে ছেদবন্ধনহীন, সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর পর্যায়ের

মধ্য দিয়ে পরামুক্তিতে পরিচালিত। বিশুদ্ধমায়া প্রভাবে পরোপকার প্রবৃত্তির জন্য ধর্মানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি সিদ্ধগণের কৃপালাভ করেন—সেই জন্যই নাথসিদ্ধগণ জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মগুরু। অশুদ্ধ মায়ার সর্বদোষ রহিত হওয়ায় তাঁদের কর্ম-প্রচেষ্টা জাগতিক দুঃখবন্ধনের অতীত। নাথসিদ্ধদের এই একাধারে পরামুক্তিতে পরিচালিত ধর্মাচরণে সক্রিয়তা, বৌদ্ধদের বিশ্বমানবের মুক্তি-কামনায় বুদ্ধত্বের পথে দশটি বোধিসত্ত্বভূমি অতিক্রমণে সক্রিয়তার সঙ্গে তুলনীয়।

'যোগবীজ'-এ বলা হয়েছে, 'দেহিগণ পক্ক-অপক্ক দুই প্রকারের — যোগহীন দেহীই অপক্ক দেহী, যোগযুক্ত দেহীই পক্ক দেহী। যোগাগ্নি-দ্বারা দগ্ধ বিশুদ্ধ যোগদেহ দেবতাগণের পক্ষেও দুর্লভ ; এরূপ দেহ সর্বপ্রকার ছেদ-বন্ধনহীন, বিমুক্ত, নানা শক্তিধর, আকাশের মত সূক্ষ্ম — কিন্তু আকাশ অপেক্ষাও নির্মল। পক্ক দেহ লাভ করে কায়সাধনের দ্বারা যোগী দেহের পঞ্চধাতুকেই পরিবর্তিত করে নিয়ে সিদ্ধতনু বা দিব্যতনু লাভ করেন। এই সিদ্ধতনু লাভ করে তাঁরা স্বেচ্ছামত জগতে বিচরণ করতে পারেন — তাঁদের আর মৃত্যু নেই।...এই জীবন্মুক্ত পুরুষের কোথাও কোন কর্তব্য নেই — আবার কাজ করলেও তাতে বন্ধন নেই। এঁরাই 'সদা স্বস্থ' এবং 'সর্বদোষ-বিবর্জিত'।

জীবমুক্তির মধ্য দিয়ে নাথগণের এই পরামুক্তি শিবত্ব বা মহেশ্বরত্ব লাভের অনুরূপ। সেজন্যই বোধ হয়, মৎস্যেন্দ্রনাথ, গোরক্ষনাথ-প্রমুখ নাথসিদ্ধগণ মহেশ্বরের সঙ্গে নানাভাবে যুক্ত হয়েছেন। তাই নাথগণকে মুখ্যত রসায়ন-সম্প্রদায় বলা যায় না।

নাথ সাহিত্যে ময়নামতী গোপীচাঁদ-প্রভৃতি সিদ্ধগণের জীবন ও কর্মচেষ্টায় মধ্যে নাথযোগিদের আদর্শ, দৃষ্টিভঙ্গি ও লক্ষ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। এই সমস্ত কাহিনী প্রবাদ ও গল্পের সর্বত্রই ক্ষয় ও মৃত্যুর অনিবার্য অধিকার হতে নিষ্কৃতি লাভের প্রচেষ্টা দেখা যায়। ক্ষয় ও মৃত্যু থেকে আত্মরক্ষা করার ক্ষমতা-লাভই এই সিদ্ধগণের বৈশিষ্ট্য। মৃত্যুর অধিপতি যম যখনই কোন সিদ্ধপুরুষের অঙ্গে হস্তক্ষেপণ করেছেন, এই সত্য তিনি মর্মে-মর্মে উপলব্ধি করেছেন। কদলীদেশে মীননাথ বন্দী হলে গোরক্ষ যমরাজ্য প্রবেশ ও যমকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করে মৃতের তালিকা থেকে মীননাথের নাম মুছে দিয়ে প্রত্যাবর্তন করেন।

মীননাথের আত্মবিস্মৃতি মানুষের মৃত্যুঞ্জয়-স্বরূপত্ব-বিস্মৃতি এবং কদলীরাজ্যের মায়া জীবনের ভোগসুখের মায়ারই প্রতীক। নর্তকীবেশে গোরক্ষ বারংবার তাঁর প্রহেলিকায়-সংগীতে আত্মবিস্মৃত গুরুকে এই কথাই বলেছেন : নারীর সঙ্গ-সুধারসসিক্ত জীবনের পরিণতি ক্ষয় ও মৃত্যুর অতলে — এ জীবনে অমরত্ব-লাভের পথ একমাত্র যোগের পথ। এই কায়সিদ্ধিই নাথযোগিদের চরম লক্ষ্য বা নিঃশ্রেয়স।

'গোরক্ষবিজয়'-এ দুর্গা (শক্তি বা বিকারময়ী প্রকৃতি) মৃত্যুঞ্জয় মহেশ্বরকে (পরম অব্যয় সত্য) এই প্রশ্নই করেছিলেন—"তুহ্মি কেন তর গোসাঞি আহ্মি কেনে মরি। হেন তত্ত্ব কহ দেব জোগে জোগে তরি ॥' প্রিয়তমার এই প্রশ্নের উত্তরেই শিব হঠযোগের গুহ্য-তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন এবং আদিসিদ্ধ মীননাথ মৎস্যরূপে তা শ্রবণ করে জগতে প্রকাশ করেন।

যোগের দ্বারা মৃত্যুঞ্জয়ত্ব লাভই মানিকচন্দ্র ও তৎপুত্র গোপীচাঁদের গল্পের আসল কথা। ময়নামতী তাঁর স্বামী মানিকচন্দ্রের আসন্ন-মৃত্যু অবগত হয়ে তাঁকে মহাজ্ঞান মন্ত্র দীক্ষা দিতে গিয়ে যমের চক্রান্তে বিফল হন। রাজার মৃত্যুর পরে প্রথমদিনে যমের অনুচরকে ঘোটকদানে, দ্বিতীয়দিনে পরিচারিকার জীবনদানে, চতুর্থ দিনে ভ্রাতার জীবনদানে তুষ্ট করেন। পঞ্চম দিনে গোদাযম অর্থ-উৎকোচে বশীভূত না-হওয়ায় ময়নামতী চণ্ডী ও কালীমূর্তি ধারণ করে তাঁকে

নির্দয়ভাবে প্রহার করেন। তৎপরে গোদাযম শিবের পরামর্শে ময়নার অনুপস্থিতিতে তাঁর স্বামীর জীবন নিয়ে পলায়ন করলে, ময়না যমপুরীতে প্রবেশ করে পুনরায় তাঁকে প্রহার করেন। তাতে গোদাযম ময়নাকে স্বামীর জীবনদানের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে যমপত্নীর নিকট লুকিয়ে থাকে। কিন্তু তাতেও নিষ্কৃতি না পেয়ে বিভিন্ন রূপ ধারণ করতে থাকলে ময়নাও নানারূপ ধারণ করে স্বামীর জীবন লাভে সক্ষম হন। এমন সময়ে ময়নার গুরু গোরক্ষনাথের সঙ্গে শিব এসে মধ্যস্থতা করেন।

স্বামীর মৃত্যুর পরে ময়না স্বামীর চিতায় আরোহণ করলে অগ্নি তাঁকে স্পর্শ করল না। তৎপর তিনি অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত , জলে নিমজ্জিত, তপ্ত কটাহে নিবিক্ত হলেন—কেশসেতু ও শাণিত ক্ষুরের উপর পদচারণা করলেন, তুষের নৌকায় ভাসমান হলেন — তাতেও তাঁর মৃত্যু হল না। অতঃপর তিনি পুত্র গোপীচাঁদকে বললেন, গুরু গোরক্ষের কৃপায় মহাজ্ঞান মন্ত্রের সাহায্যে তিনি চতুর্দশযুগ শূন্যে, ত্রয়োদশ যুগ সলিলে, দ্বাদশ যুগ অগ্নিতে অবস্থান করতে পারেন — প্রলয়পয়োধিজলে পৃথিবী ভাসমান হলে সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্র চির-অস্তমিত হলেও চিরকাল তিনি ভাসমান থাকবেন।

জালন্ধরী পা বা হাড়িপার সম্বন্ধেও এইরূপ নানাবিধ গল্প প্রচলিত আছে। রাজা গোপীচাঁদ তাঁর নিকট দীক্ষা নিয়ে রাজ-প্রাসাদ ত্যাগ করে তাঁর অনুগমন কালে বহু পশ্চাতে পতিত হলে যম তাঁর জীবন-হরণ করেন। হাড়িপা তৎক্ষণাৎ যমপুরীতে প্রবেশ ও সকলকে নিদারুণভাবে প্রহার করে গোপীচাঁদের জীবন উদ্ধার করেন। রানী ময়নামতী তাঁর একমাত্র পুত্রকে ক্ষয় ও মৃত্যু হতে রক্ষা করবার জন্যই তাঁর স্ফুটনোন্মুখ যৌবনে তাঁকে সন্ন্যাস-গ্রহণে বাধ্য করেছিলেন। ময়নামতী ও গোপীচাঁদ রাজার গানে মাতৃস্নেহ এই জন্যই অনন্য বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে।

উড়িষ্যায় ষোড়শ শতকের বৈষ্ণব সমাজেও সিদ্ধগণের এই জীবন্মুক্তির ছায়া পড়েছে। তাঁরা দৈহিক পরিপূর্ণতা, মৃত্যুঞ্জয়ত্ব ও যোগের দ্বারা চন্দ্রসূর্য-রোধের আদর্শও তাঁদের ভাগবত-গীতার আদর্শের মধ্যে গ্রহণ করেছেন।

বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব সহজিয়া তথা হিন্দি সাহিত্যের নির্গুণ সাধনার সঙ্গে নাথযোগিদের কায়সাধনার ঐক্য থাকলেও আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গিতে পার্থক্যও যথেষ্ট। বৌদ্ধ সহজিয়াদের 'মহাসুখ', বৈষ্ণব সহাজিয়াদের 'শুদ্ধ প্রেম' এবং উত্তর ও পশ্চিম ভারতের নির্গুণ সম্প্রদায়ের অচিন প্রেমিকের উপলব্ধিই সাধনার লক্ষ্য। কিন্তু নাথ যোগিদের যোগসাধনার লক্ষ্য শুধু অমরত্ব বা মহেশ্বরত্ব লাভ। পরে এ-বিষয়টি বিস্তৃত আলোচিত হবে।

৩. সাধনার পথ

[ক] উল্টা-সাধনা বা উজান পথ ॥ নাথসিদ্ধদের কায়সাধনা ভাষাসাহিত্যে উল্টা-সাধন-নামে অভিহিত। এই অভিধা দ্ব্যর্থসূচক। এই যোগসাধনা যেমন দৈহিক ও মনস্তাত্ত্বিক নিম্নগা স্রোতকে বিপরীত মুখে পরিচালিত করে, তেমনই এটি জন্মমৃত্যুর নিত্য-প্রবাহ থেকে সিদ্ধকে সিদ্ধদেহ বা দিব্যদেহে প্রতিষ্ঠিত করে। সর্বভূতের আদিভূত দুটি সত্য রয়েছে : বিশুদ্ধচৈতন্যময় নির্বিকার শিবতত্ত্ব এবং জন্মমৃত্যুস্রোতে বিকারময়ী শক্তিতত্ত্ব। অন্যান্য যোগশাস্ত্রের মত নাথমতেও ব্রহ্মাণ্ডের সকল তত্ত্ব দেহভাণ্ডেই বর্তমান — শিব ও শক্তিতত্ত্ব দেহভাণ্ডেই রয়েছে। এই প্রত্যক্ষ বিকারময়ী নিম্নগা শক্তিকে বিপরীত পথে পরিচালিত করে পরম অক্ষর শিবস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করাই যোগমার্গের উদ্দেশ্য। তন্ত্র ও হঠযোগের মতে,

শরীরের নাভিনিম্নস্থ অংশ শক্তি বা প্রবৃত্তির রাজ্য, তার উর্ধ্বে শিব বা নিবৃত্তির রাজ্য। তন্ত্রমতে, দেহের মধ্যস্থিত মেরুদণ্ডটিই মেরুপর্বতের ন্যায় দেহব্রহ্মাণ্ডের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান — এটির সর্বনিম্নে অবস্থিত মূলাধার-চক্রই দক্ষিণ মেরু এবং সর্বোর্ধ্ব সহস্রারই উত্তর মেরু। শক্তি এই মূলাধারে সার্ধ-ত্রিবলিত কুণ্ডলীর ভিতরে কুলকুণ্ডলিনী-শক্তিরূপে নিদ্রিতা। সর্বোর্ধ্ব-চক্র সহস্রদল পদ্মাকার সহস্রারই পরম শিবের আলয়। সর্বনিম্নের মূলাধারে নিদ্রিতা শক্তিকে জাগ্রত করে প্রবৃত্তি-মার্গ হতে নিবৃত্তি-মার্গ-গামিনী করে সহস্রারে অবস্থিত শিবের সহিত মিলন-সাধনই যোগের মূলকথা। শক্তি যতক্ষণ প্রবৃত্তির রাজ্যে বাস করে ততক্ষণই মানুষ পরিবর্তনশীল সংসার-স্রোতে ভাসমান হয়ে দুঃখভোগ করে — শক্তি নিবৃত্তি-মার্গগামিনী হয়ে শিবের সহিত মিলিত হলেই মানুষ অমৃতত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়ে জন্মমৃত্যুর অনিবার্য আকর্ষণ থেকে মুক্তি লাভ করে — এটিই তান্ত্রিক উল্টা-সাধনা। নাথযোগিগণ এই উল্টাধারার প্রকাশে উল্টাভাষা ব্যবহার করেছেন — সেজন্য তাঁদের সাধন-সংগীতগুলি নিরবচ্ছিন্ন বিরোধালঙ্কারের ব্যবহারে প্রহেলিকাময়।

একদিক থেকে সমস্ত আধ্যাত্মিক সাধনাই উল্টাসাধনা — কারণ তা নিম্নতর প্রবৃত্তিসমূহকে উর্ধ্ব-গামিনী করে। মহাযান মতের পঞ্চেন্দ্রিয়, মন ও মৈথুনের পরাবৃত্তির অর্থ উল্টা-সাধনেরই অনুরূপ বলেই মনে হয়। এতেও নিবৃত্তির রাজ্যে প্রবৃত্তির অনুপ্রবেশের কথা রয়েছে। উড়িষ্যার পঞ্চশাখা বৈষ্ণবগণও তাঁদের সাধনাকে উল্টাসাধন বা উজানসাধন বলেছেন। 'আলিরাজা'-র জ্ঞান-সাগরে আছে : 'পিরীতি উল্টা রীত না বুঝে চতুরে, যে না চিনে উল্টা সে না জিয়ে সংসারে। সমুখ বিমুখ হয় বিমুখ সমুখ, পাল্টা নিয়মে সব জগৎ সংযোগ। বিমুখে আগম পন্থ রাখিছে গোপতে, চলিলে বিমুখ পন্থে সিদ্ধি সর্বমতে।' এ যেন উপনিষদেরই প্রতিধ্বনি — 'পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূস্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্। কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যাগাত্মনমৈক্ষদ্ আবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্ ॥' প্রজাপতি ব্রহ্মা যেন হিংসাবশতই সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে বহির্মুখ করে দিয়েছেন — যাতে মানুষ অন্তরের গুহাহিত দুর্দর্শ সত্যকে দেখে ফেলতে না পারে। সাধারণ মানুষ তাই শুধু বাইরের পথেই ঘুরে বেড়ায় — আন্তর সত্যের পরিচয় পায় না। কিন্তু মানুষ চিরদিন ভুলে থাকবার জীব নয়। সংসারের খরস্রোতে ভাসতে-ভাসতে কেউ-কেউ বাইরের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে 'আবৃত্তচক্ষুঃ' হয়ে থেমে দাঁড়ান— তাঁরাই লাভ করেন অমৃতত্ব।

যোগসাধনার বিভিন্ন সংযম ও নিরোধের জন্য বাঙলা গ্রন্থে দেহাভ্যন্তরে কালজয়ী 'খেমাই' নামক প্রহরীর কল্পনা করা হয়েছে। অসংযত মনকে সে মাহুতের মতই পরিচালিত করে। কদলীদেশে গোরক্ষ গুরুকে উপদেশ দিয়েছিলেন, তাঁর রাজদণ্ড খেমাইয়ের হস্তে অর্পণ করতে।

হঠযোগ-সাধনায় আসন, ধৌতি, বন্ধ, মুদ্রা, প্রাণায়াম ও অন্যান্য উপায়ে পেশী, তন্তু, নাড়ী ও শিরার বিশুদ্ধতা ও সংযমের দ্বারা দেহের ধাত্বন্তরই সম্ভব। নাথসাহিত্যেও ভারতীয় দর্শনের আদর্শবাদের সুর বিরল নয়। যোগের প্রধান কথা মানসিক সংযম — প্রাণবায়ুই মানসিক প্রবাহকে অব্যাহত রাখে। কাজেই প্রাণায়ামের দ্বারা প্রাণবায়ুর নিরোধই মনঃসংযমের উপায়। অন্যান্য যোগপন্থীদের মতোই নাথযোগিগণ সেজন্য 'বায়ু'-সংযমের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

নাথসিদ্ধদের কায়সাধনের অর্থ, এই পঞ্চভৌতিক দেহকে যোগাগ্নির দ্বারা পুড়িয়ে ফেলে অবিনশ্বর দেহ লাভ। পরে দেখা যাবে যে, কায়সাধনের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ যোগপদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে ।

[খ] কায়-সাধন ॥ কায়সাধনের রহস্য বুঝতে হলে সূর্য ও চন্দ্রতত্ত্ব জানা প্রয়োজন।

তন্ত্র ও যোগশাস্ত্রে সূর্য ও চন্দ্রের অর্থ দক্ষিণ ও বামের দুটি নাড়ী এবং তাদের মিলনের অর্থ প্রাণ ও অপান অর্থাৎ শ্বাস-প্রশ্বাসের মিলন। 'সিদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পদ্ধতি'তে কথিত আছে : কর্ম, কাম, চন্দ্র, সূর্য ও অগ্নি — এই পঞ্চ উপাদানে শরীর গঠিত। প্রথম দুটি দেহ-পিণ্ডের অবস্থা মাত্র ; শেষের তিনটি মৌলিক — তন্মধ্যে সূর্য ও অগ্নি অভিন্ন। সুতরাং শরীরের দুইটি মৌলিক উপাদান — সূর্য ও চন্দ্র। এখানে চন্দ্র দেহস্থিত রস বা সোমের প্রতীক ; সূর্য অগ্নির প্রতীক। রস ভোগ্য এবং অগ্নি ভোক্তা।

(অ) সূর্য ও চন্দ্রতত্ত্ব

উভয়ের সুনিয়ন্ত্রিত মিলনেই সৃষ্টি সংরক্ষিত। এই সূর্য ও চন্দ্র পিতার বীজ ও মাতার শোণিত রূপে প্রত্যক্ষ জীবদেহের কারণ। চন্দ্রের ষোড়শ কলা ও অমৃতকলা তার ষোড়শরূপ ক্রিয়ার সহিত এবং সূর্যের দ্বাদশ কলা ও স্বপ্রকাশতা অগ্নির ত্রয়োদশ ক্রিয়ার সহিত উপমিত। 'বৃহৎ-জাবালোপনিষদ'-এও এইরূপে চন্দ্রসূর্য ও সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচিত হয়েছে ।

যোগশাস্ত্রে সূর্য ও চন্দ্র ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্নিহিত দুই সত্য — সৃষ্টি-স্থিতি ও ক্ষয়-সংহারের প্রতীক। নির্বিকার ও অমৃততত্ত্ব চন্দ্রের শিবলোকে এবং বিকার ও বিলয়তত্ত্ব সূর্যের শক্তিলোকে বাস। চন্দ্রই সুধাকর, সুধাই অমৃত — অমৃতপানেই অমরত্ব লাভ হয় ; এই চন্দ্রতত্ত্বই ব্রহ্মাণ্ডের অমৃততত্ত্ব। সূর্য কালাগ্নি, এটি-ই সংহারতত্ত্ব। এই সূর্য-চন্দ্রাত্মক বা অগ্নি-সোমাত্মক ব্রহ্মাণ্ড দেহভাণ্ডেও রয়েছে। দেহের মধ্যে ঊর্ধ্বে এই সহস্রদল চন্দ্র, আর নাভিদেশে অবস্থিত দহনাত্মক সূর্য। আরও কথিত হয় যে, দেহসার-বিন্দু দুই প্রকার — শ্বেত বিন্দু ও শোণিত বিন্দু · প্রথমটি শুক্র, দ্বিতীয়টি শোণিত বা মহারজ। এই শ্বেত বিন্দুই শিব এবং লোহিত বিন্দু শক্তি। শিবের বিপরীত সূর্য বা কালাগ্নি রুদ্র নামেও অভিহিত। ঊর্ধ্বদেশে সপ্তলোক স্বর্গ এবং নিম্নদেশে সপ্তলোক পাতাল অবস্থিত। কালাগ্নি নিম্নদেশে থাকলে সৃষ্টি বর্তমান থাকে। — ঊর্ধ্বদেশে প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠলেই প্রলয়ের আরম্ভ। বৌদ্ধতন্ত্র ও সহজিয়া গানে এই সূর্য ও চন্দ্র যথাক্রমে নির্মাণ-কায়ার অগ্নি ও উষ্ণীষকমলের বোধিচিত্ত। বৌদ্ধদের এই নির্মাণকায়ার অগ্নি নাভিদেশে অবস্থিত চণ্ডালী নামেও অভিহিত।

এই চন্দ্রসূর্যের উপর প্রভুত্বই হঠযোগের আসল কথা। সেজন্য হাড়িসিদ্ধার অলৌকিক শক্তির বর্ণনায় ময়নামতী বলেছেন — 'চন্দ্রসূর্য দুইজন কুণ্ডল কানের।' যোগে চন্দ্রসূর্য-সংযোগের অনেক অর্থ আছে : (১) নাভিপদ্মের কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করে ঊর্ধ্বতম চক্র সহস্রারে শিবের সহিত মিলন-সাধনের দ্বারা সৃষ্টিচক্রের এই বহির্বিকাশকে বিপরীত মুখে পরিচালিত করে পরম অক্ষর কেবলস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করা। (২) হঠযোগের সাহায্যে ক্ষরণমুখী জৈবিক ধারাকে বিপরীত পথে পরিচালিত করে মৈথুন-সাধনায় শিব-শক্তির যোগানন্দ লাভ করা। (৩) প্রাণায়ামের সাহায্যে প্রাণ ও অপান বায়ুর সংযমের দ্বারা ইড়া ও পিঙ্গলার সংযমন। এই ইড়া পিঙ্গলা ও সুষুম্না অর্থাৎ বাম, দক্ষিণ ও মধ্যস্থ নাড়ী যোগশাস্ত্রে যথাক্রমে চন্দ্র, সূর্য ও অগ্নি। নাথগণের সূর্যচন্দ্রতত্ত্বেব একটু গভীরতর অর্থ আছে। তাঁদের মতে, চন্দ্র থেকে ক্ষরিত অমৃতধারাকে নিম্নের দহনাত্মক সূর্যের গ্রাস থেকে রক্ষা করে এবং পান করে যোগী অমরত্ব লাভ করিতে — অর্থাৎ পাঞ্চভৌতিক দেহকে অবিনশ্বর দিব্যদেহে পরিবর্তিত করতে পারেন।

দেহের সারভূত সোম বা অমৃত চন্দ্রে সঞ্চিত হয় এবং সেখান হতে আবার নিম্নে ক্ষরিত হয়। সহস্রার থেকে মূলাধার পর্যন্ত বিস্তৃত বঙ্ক-নালের (যৌগিক নাম শঙ্খিনী) মধ্য দিয়ে চন্দ্রের অমৃতধারা মহারস বা সোমরস ক্ষরিত হচ্ছে এবং নিম্নের দহনাত্মক সূর্য সেই অমৃত গ্রাস

করছে। গোরক্ষবিজয়ে এই বঙ্ক-মৃণালকে 'দুই মুখা সাপ' বলা হয়েছে। শঙ্খিনীর যে-মুখে চন্দ্র হতে অমৃতধারা ক্ষরিত হচ্ছে, তাই 'দশম দ্বার'। যোগের সাহায্যে বঙ্ক-নালীর এই দশমী দ্বার রুদ্ধ করে সূর্যের দহনাত্মক শক্তি থেকে চন্দ্রের নিম্নগা অমৃতধারাকে রক্ষা করতে হবে। দেহের সারপদার্থ এইরূপে অবিরত কালাগ্নিতে পতিত হচ্ছে বলেই ক্ষয় ও মৃত্যু জীবের স্বাভাবিক পরিণাম। — 'দ্বার খান মুক্ত করি করিলা বসতি ॥ মুক্তদ্বার পাই চোর হৈল সতান্তর। সর্বধন হরি নিল শূন্য হৈল ঘর ॥' এবং — 'নগরে মনুষ্য নাহি ঘরে ঘরে চাল। আন্ধলে দোকান দিয়া খরিদ করে কাল ॥' অথবা — 'ওজনের তৈল মাপি লই যায়ে চোর।'

তন্ত্র ও হঠযোগে দেহের সারভূত এই অমৃতধারাকে রক্ষা করবার প্রক্রিয়া-সমূহের মধ্যে 'খেচরী-মুদ্রাই' প্রধান। 'খেচরী মুদ্রা'র অর্থ রসনাকে উর্ধ্বরন্ধ্রে আকৃষ্ট করে—'রাজদন্ত' বা 'শঙ্খিনী'র দশমীদ্বার রুদ্ধ করে দৃষ্টিকে ভ্রূ-মধ্যে সন্নিবিষ্ট করা। এই প্রক্রিয়ায় যোগী সর্ববিধ ক্ষরণ — এমনকি রমণীর আলিঙ্গনাবস্থায় বিন্দুকেও সংযত করতে পারেন। এই চন্দ্রক্ষরিত অমৃতধারা বা 'অমর বারুণী' পান করে যোগিগণ অমৃতপায়ী দেবতাগণের ন্যায় অমরত্ব লাভ করেন। তান্ত্রিক সাধনার অপরিহার্য অঙ্গ মদ্য ও মাংস নাথযোগিদের নিকট চন্দ্রক্ষরিত অমৃতধারা ও উর্ধ্বরন্ধ্রে আকৃষ্ট রসনার প্রতীক।

কোথাও-কোথাও সহস্রার থেকে মূলাধার পর্যন্ত বিস্তৃত নালীকে রাহুর সঙ্গে এবং কালাগ্নিতে সোমরসের ক্ষরণকে রাহু-কর্তৃক চন্দ্রকলা গ্রাসের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। রাহু-কর্তৃক চন্দ্রগ্রাস ও উদ্‌গারের ফলে বিভিন্ন তিথি—পূর্ণিমা, অমাবস্যা, শুক্লপক্ষ ও কৃষ্ণপক্ষের আর্বিভাবের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সাধনার বিভিন্ন পর্যায়ের কল্পনা করা হয়েছে।

নাথসিদ্ধ ও বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ যম (সংযম) ও নিয়ম (শৃঙ্খলা) ছাড়াও যোগের ছয়টি অঙ্গ স্বীকার করেছেন — আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি। পাতঞ্জল মতে : যম, নিয়ম ও আসন মনঃসংযমের উদ্দেশ্যে দৈহিক ও নৈতিক শৃঙ্খলা ; প্রাণায়াম মনের নিরোধের প্রধান প্রক্রিয়া এবং প্রত্যাহার ধারণা ও ধ্যান মনঃসংযোগের উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়া। অতএব এই সমস্ত প্রক্রিয়াই মনের নিরোধ ও সংযোগের উদ্দেশ্যেই নিয়োজিত। নাথসাধনার উদ্দেশ্য, এই সকল প্রক্রিয়ায় মহারসকে রক্ষা করে স্থূল দেহকে সূক্ষ্ম দিব্যদেহে পরিণত করা ।

সূর্য ও চন্দ্রতত্ত্বের আরও একটি অর্থ আছে। সূর্যই রজ, চন্দ্রই বিন্দু — সূর্য শক্তির সঙ্গে চন্দ্র শিবের সঙ্গে উপমিত। ধ্বংসাত্মক সূর্যের প্রভাব থেকে চন্দ্রকে আত্মরক্ষা করতে হবে। নাথসাহিত্যে নারী ব্যাঘ্রীর সঙ্গে উপমিত । নাথসিদ্ধগণ ছিলেন কঠিন ব্রহ্মাচর্যব্রতধারী — তাঁদের সকল ভাষাসাহিত্যে নারীকে যোগপথের চরম প্রতিবন্ধক বলা হয়েছে। কদলীদেশ বা সিংহলের রানীর মোহে আসক্ত মীননাথকে গোরক্ষের উদ্ধারের গল্পেই নারীর প্রতি নাথগণের

(আ) সূর্যচন্দ্ররূপে নরনারী

মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যাবে। নানা রূপকে-ব্যঞ্জনায় গোরক্ষ মীননাথের উদ্দেশ্যে বলেছেন—'নেতের অঞ্চলে চর্ম মণ্ডিত করিয়া ঘর-ঘর বাঘিনী পশে।' হিন্দি সাহিত্যেও গুরুর প্রতি গোরক্ষের উপদেশ এইরূপ। রাজপুতানার গোরক্ষপন্থীদের ছড়ায় আছে — 'সরব রস খোঈলা গুরু বাঘিনী চৈ কোলৈ।' নাথগণ নারীকে ঠগ, ডাকাত, উদ, ব্যাঘ্রী, মার্জার, সর্প-প্রভৃতি নামে অভিহিত করতেও দ্বিধা করেন নি। গোরক্ষ বলছেন — 'ঠগের হাতেত গুরু সঁপিলা ভাণ্ডার। ঢাঙ্গাতির হাতে ভরা সঁপিলা তোমার ॥ মাছের প্রহরী দিলা দারুণ যে উদ। বিড়াল প্রহরী দিলা ঘন আওটা দুধ ॥ মহাতেজ

কুড়াতে সমর্পিলা তরু। ব্যাঘ্রের সম্মুখে তুমি সমর্পিলা গরু॥... ধান্যের ভাণ্ডারে যেন উন্দুর পহরী। শ্রীকালের হাতে যেন হংস দিল্বা ধরি ॥' গোপীচাঁদের গানেও রানী ময়নামতী নানা রূপকে-অলঙ্কারে নিজ পুত্রবধূগণকে উপলক্ষ করে নারীজাতির প্রতি এইরূপ ঘৃণা প্রকাশ করেছেন। অতএব দেখা যাচ্ছে, স্থূল অর্থে মহারসের অর্থ বীর্য—তাকে রক্ষা করাই নাথ-সাধনার আসল কথা।

কবীর-প্রবর্তিত নির্গুণ-সম্প্রদায়ের হিন্দি-কাব্যেও নারীজাতির প্রতি এইরূপ দৃষ্টিভঙ্গী দেখা যায়। নাথগণের মত কবীর ও তাঁর অনুবর্তিগণও বলেছেন — 'দিন কা মোহিনী রাত কা বাঘিনী পলক-পলক লহু চোষে। দুনিয়া সব বাউরা হো কে ঘর ঘর বাঘিনী পোষে।" এটি নাথগণেরই প্রভাব-প্রসূত মনে হয়।

কবীর ও মধ্যযুগের অনেক হিন্দি কবির সঙ্গে দৃষ্টিভঙ্গি ও ধর্মাদর্শে প্রচুর পার্থক্য সত্ত্বেও কার্যকরী সাধন-পন্থায় নাথগণের আশ্চর্য সাদৃশ্য আছে। কবীর ও তৎ সম্প্রদায়ের

(ছ) নাথ ও অন্যান্য গুহ্য-যোগিগণ

ভক্তিধর্মের চিন্তার স্বাধীনতার মধ্যেও একটি যোগ-সাধনার কাঠামো রয়েছে। ডক্টর পি. ডি. বার্থওয়েল তাঁর Nirguna School of Hindi Poetry নামক গ্রন্থে কবীর-প্রবর্তিত নির্গুণ-সাধন প্রণালীর সঙ্গে পূর্বসূরি নাথগণের যোগসাধনার অনেক সাদৃশ্য দেখিয়েছেন। মধ্যযুগের সকল ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যেই এই চন্দ্রসূর্যতত্ত্বই প্রধান। কবীর ও গোরক্ষপন্থীদের সাধনার এই সাদৃশ্য থেকেই এইরূপ জনশ্রুতির উদ্ভব হয়েছে যে, গোরক্ষের সঙ্গে কবীরের সাক্ষাৎ হয়েছিল।

হঠযোগী হিসাবে নাথসিদ্ধ ও বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণের সাজাত্য থাকলেও উভয়ের লক্ষ্য ও সাধনায় পার্থক্য সুস্পষ্ট। নাথগণের লক্ষ্য অমরত্ব — বৌদ্ধ সহজিয়াদের আদর্শ মহাসুখ। নাথসিদ্ধগণ চেয়েছেন, এই স্থূলদেহকে সূক্ষ্ম দিব্যদেহে এবং তৎপরে বৈন্দবদেহে পরিণত করতে ; আর বৌদ্ধ সহজিয়াগণ চেয়েছেন, আত্ম-অনাত্ম-বস্তু ও সর্বধর্মের শূন্যতা উপলব্ধির দ্বারা এই ভবনির্বাণ-চক্র থেকে মুক্তিলাভ করে মহাসুখ লাভ করতে। নাথগণের লক্ষ্য যৌগিক প্রক্রিয়ায় এই মরদেহকে ক্ষয় ও মৃত্যুর অনায়ত্ত করা ; অন্যদিকে বৌদ্ধ সহজিয়াদের লক্ষ্য, মৈথুন-সাধনায় স্থূল ভোগানন্দকে ঊর্ধ্বে টেনে নিয়ে গিয়ে যোগানন্দরূপে উপলব্ধি করা। অবশ্য সিদ্ধাচার্যগণের দোহা ও গানে পঞ্চস্কন্ধাত্মক দেহকে অজর-অমর করবার জন্য অমৃত পানের কথাও রয়েছে। এতে মনে হয়, বৌদ্ধ সহজিয়া সাধনার মধ্যেও নাথগণের কায়সাধন-পদ্ধতি বর্তমান। চর্যাপদের মধ্যে যে বারুণীর কথা আছে, তা মহাসুখ অথবা বোধিচিত্ত-ধারা অপেক্ষা নাথগণের অমৃতধারার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। এতে অনুমিত হয় যে, নাথসিদ্ধ ও বৌদ্ধ সহজিয়াগণ একটি সাধনার দুটি ধারা অনুসরণ করেছেন।

নাথগণ যেখানে নারীকে অমরত্ব-লাভের নিকৃষ্ট প্রতিবন্ধক হিসাবে দেখেছেন, বৌদ্ধ সহজিয়াগণ সেখানে তাকে প্রজ্ঞা বা শূন্যতা-স্বরূপিণী ও আধ্যাত্মিক জীবনের অপরিহার্য সঙ্গিনী হিসাবে দেখেছেন। অবশ্য বৌদ্ধ সহজিয়াদের প্রজ্ঞা, যোগিনী বা মুদ্রা সর্বত্রই রক্ত-মাংসের নারী নন — তিনি শূন্যতা, নৈরাত্মা বা সহজসুন্দরী। তথাপি এই মুদ্রাকে সর্বক্ষেত্রে আদর্শবাদের আলোকে দেখে সহজসাধনায় নারীর সাহচর্য অস্বীকার করা ঠিক হবে না।

বৌদ্ধ সহজিয়াদের যৌনানন্দের সঙ্গে সম্পৃক্ত মহাসুখের মনস্তাত্ত্বিক উপাদান নাথসাধনায় অনুপস্থিত। এই মহাসুখ বৈষ্ণব সহজিয়াদের পরম প্রেমে পরিবর্তিত। সুনির্বাচিত সঙ্গিনী ভিন্ন এই মহাসুখ সম্ভব নয় — পরম প্রেমও সম্ভব নয়। এই কারণের জন্যই বৌদ্ধ সহজিয়াদের

নিকট নারী যেমন প্রজ্ঞা-স্বরূপিণী, বৈষ্ণব সহজিয়াদের নিকট তেমনই মহাভাব-স্বরূপিণী। নারীজাতির প্রতি বিরূপতা সত্ত্বেও নাথসিদ্ধগণ নারীসঙ্গে বজ্রৌলী অমরৌলী, সহজৌলী প্রভৃতি যোগসাধনায় অভ্যস্থ ছিলেন। কিন্তু তাও কয়েকটি যৌগিক প্রক্রিয়ামাত্র — সেখানেও নারীকে দার্শনিকতা অথবা আদর্শবাদের আলোকে দেখবার চেষ্টা দেখা যায় না।

৪. বৈদিক সোমযাগ ও যোগসাধনায় অমৃতপান

নাথসাধনায় চন্দ্রক্ষরিত সোমরস পানের সঙ্গে বৈদিক সোমযাগ বা সোমরস পানের তুলনা করা যায়। সোমলতার রস থেকে সোমরস প্রস্তুত হত। ভারত ও পারস্যের পার্বত্য প্রদেশে এটি নাকি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হত। বৈদিক সাহিত্যে ও আবেস্তায় বিবিধ ধর্মানুষ্ঠানে সোমরসের বহুল ব্যবহার দেখা যায়। সোমলতা ও সর্বপ্রকার ওষধিলতার সহিত চন্দ্রের রহস্যময় সম্পর্কের কথা শোনা যায়। বিষ্ণুপুরণে কথিত হয়েছে যে, প্রজাপতি ব্রহ্মা চন্দ্রকে গ্রহসমূহ, উদ্ভিদ, যাগযজ্ঞ ও তপস্যার অধিপতি নিযুক্ত করেন—সেজন্য চন্দ্রের অপর নাম ওষধিপতি বা ওষধীশ। চন্দ্র ও সোমলতার এই গভীর সম্পর্কের জন্যই বেদ ও তৎপরবর্তী সাহিত্যে চন্দ্রই সোমরূপে অভিহিত। ষোড়শকলা চন্দ্রের অনুরূপ সোমলতাও ষোড়শপত্র-সমন্বিত হত — শুক্লপক্ষে চন্দ্রের অনুরূপ তারও এক-একটি করে পত্রসংখ্যা বৃদ্ধি এবং কৃষ্ণপক্ষে ক্রমান্বয়ে পত্রসংখ্যার হ্রাস হত। পুরাণে এইরূপ কথিত হয়েছে যে, সর্বপ্রকার ওষধিলতা সমুদ্রে নিক্ষেপ করে সমুদ্রমন্থন করা হলে সোম (চন্দ্র), অমৃত ও সুরা উত্থিত হয়। অন্য-একটি কাহিনী অনুসারে, অমৃত চন্দ্রের মধ্যেই নিহিত ছিল। এটি থেকেই বোঝা যাবে, বৈদিক ও তৎপরবর্তী সাহিত্যের চন্দ্র-অমৃত-সোমের কল্পনা অমরত্বলাভের জন্য যোগিগণের সোমরসধারা পানের কল্পনায় কিরূপে পর্যবসিত হয়েছে।

৫. রসায়ন ও নাথ-সম্প্রদায়

নাথগণ বিশ্বাস করেন যে, আজও মৎস্যেন্দ্রনাথ, গোরক্ষনাথ-প্রমুখ নাথ-সিদ্ধগণ সূক্ষ্ম দিব্যশরীরে হিমালয় প্রদেশে বর্তমান আছেন। তাঁদের দেহ সূক্ষ্ম হতেও সূক্ষ্মতর, স্থূল হতেও স্থূলতর এবং ক্ষয় ও মৃত্যুর অতীত। রসায়ন মতেও, রসের ব্যবহারে এই দেহকেই অবিনশ্বর করে জীবন্মুক্তি লাভ করা যায়। নাগার্জুন ব্যাড়ি ব্যজপ্যায়ন-প্রমুখ দার্শনিকগণের মতবাদপুষ্ট এই রসায়ন-সম্প্রদায়ের মতে, রসের সাহায্যে জীবন্মুক্তি লাভ করে অবিনশ্বর দিব্যদেহের অধিকারী অসংখ্য দেবতা-উপদেবতা-ঋষি ও মানব রয়েছেন। 'রসার্ণব'-এ ভৈরব বলছেন — জীবন্মুক্তির গুহ্যতত্ত্ব দেবতাগণেরও অজ্ঞাত। এই পাঞ্চভৌতিক দেহকে বিনষ্ট করে যে মুক্তির কল্পনা, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই। শুধু তাই নয়, মৃত্যুর পরে জ্ঞাতার অভাবে মুক্তির কল্পনাও অর্থহীন। সুতরাং প্রকৃতমুক্তির জন্য এই পিণ্ডের সংরক্ষণ, সংস্কার ও পরিপুষ্টি প্রয়োজন। রসের (রসায়ন সম্প্রদায়ের মতে এটি মুখ্যত পারদ) ব্যবহারে ও প্রাণবায়ুর সংযমের দ্বারাই এ কাজ সম্ভব। রস বা পারদকে স্বর্ণে পরিবর্তিত করে নির্দিষ্টই প্রণালীতে ব্যবহার-দ্বারা যে কোন জীব, অমর হতে পারে। জগতের অন্য-পারে নিয়ে যায় বলেই রসের নাম পারদ। আরও কথিত হয় যে, রসই হরের বীজ, অভ্রই গৌরীর শোণিত — উভয়ের সংমিশ্রণে উৎপন্ন বস্তুই জীবকে অমর করে। ভারতীয় আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের প্রামাণ্য গ্রন্থেও রসের ব্যবহারে জীবন্মুক্তি লাভের সম্ভাব্যতা স্বীকার করা হয়েছে। রসার্ণবের মতে : স্থূলদেহের দুটি মৌলিক উপাদান—

রস ও প্রাণবায়ু ; এই দেহকে অমর করবার উপায় প্রাণবায়ুর সংযম ও রসের বৈজ্ঞানিক ব্যবহার। নাথসিদ্ধগণ রসায়নের এই আদর্শের অনুসরণ করে প্রাণবায়ুর সংযম ও চন্দ্রক্ষরিত অমৃতধারা পানকেই মুখ্য করেছেন।

এই পাঞ্চভৌতিক দেহকেই ক্ষয় ও মৃত্যুর অতীত ও অপরিমেয় শক্তির অধিকারী করা নাথসিদ্ধ ও রসসিদ্ধ উভয় সম্প্রদায়রই উদ্দেশ্য। কিন্তু শুদ্ধ মার্গের সঙ্গে তাঁদের মতের পার্থক্য আছে। এঁদের মতে, সর্বদোষ-বিবর্জিত দেহ দুইপ্রকার — জীবন্মুক্ত ও পরামুক্ত। জীবন্মুক্ত দেহ প্রণবতনু অথবা মন্ত্রতনু-নামধেয় অমর-অক্ষয়-দেহ শুদ্ধমায়া ; পরিশেষে এটিই পরামুক্ত বা সর্বভূতের উর্ধ্বস্থিত চিন্মাত্রতনু দিব্যদেহ বা জ্ঞানদেহ। তান্ত্রিক পরিভাষায় এই দুই দেহ যথাক্রমে বৈন্দবদেহ ও শাক্তদেহ। অন্যান্য গুহ্যসাধক সম্প্রদায়ের মতো নাথগণও যে অনেকস্থলে সিদ্ধদেহ বা দিব্যদেহের পার্থক্য স্বীকার করেছেন, তা তাঁদের আপেক্ষিক ও পূর্ণমুক্তি বোঝাতে 'অমর' ও 'অবিনাশী'-শব্দের ব্যবহার থেকেই বুঝা যায়। 'ভবিষ্যৎ-পুরাণ-প্রভু-লিঙ্গ-লীলা'য় গোরক্ষনাথ ও অল্লম প্রভুর কৌতুকপ্রদ আলোচনায় এই উভয় কায়সিদ্ধির পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়েছে ।

চতুর্থ পর্ব

ধর্মপূজা ও বাঙলা সাহিত্য

দশম পরিচ্ছেদ

ধর্ম-পূজার প্রকৃতি

হিন্দু ধর্মের পটভূমিকা, বৌদ্ধধর্মের লুপ্তাবশেষ, স্থানীয় আচার-অনুষ্ঠান ও ঐসলামিক বিশ্বাসের সমন্বয়ে অপর একটি লৌকিক ধর্মসম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। এঁরা ধর্ম-উপাসক নামে অভিহিত। এঁদের প্রধান দেবতা ধর্মঠাকুর। এই ধর্ম-উপাসক সম্প্রদায় ও তাঁদের সাহিত্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বাঙালী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

ধর্ম-উপাসনা পশ্চিমবঙ্গের স্থানীয় উপাসনা। ধর্মমঙ্গল সাহিত্য ও ধর্মপূজাগ্রন্থে পবিত্র স্থান ও নদনদীর উল্লেখ থেকে প্রমাণিত হয় যে, রাঢ়ের কয়েকটি স্থানে ধর্মপূজার উদ্ভব ও বিকাশ হয়। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে আজও ধর্মশিলার পূজা প্রচলিত। ধর্মমঙ্গল সাহিত্যের সমস্ত কবিই পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী। ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলির প্রারম্ভে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্নস্থানে পূজিত দেবদেবীই বন্দিত হয়েছেন। ধর্ম-উপাসনা হাড়ি, ডোম, বাগ্দী, মৎস্যজীবী, সূত্রধর প্রভৃতি নিম্নবর্ণের মধ্যেই প্রচলিত। ধর্মপূজকগণের অনুরূপ এক সম্প্রদায় উড়িষ্যায় ময়ুরভঞ্জ অঞ্চলেও বর্তমান আছে। উভয়ত্রই যে বৌদ্ধধর্মের লুপ্তাবশেষ, হিন্দু লৌকিক চিন্তাধারা ও অনার্য ধর্মবিশ্বাস ও অনুষ্ঠানের সমন্বয় ঘটেছে তা নিঃসন্দেহ।

এখানে আমাদের আলোচ্য, ধর্মমঙ্গল সাহিত্যের প্রেরণার উৎস — ধর্মপূজার আনুষ্ঠানিক দিক নয়। ধর্মপূজা অবিমিশ্র হিন্দু, বৌদ্ধ অথবা অনার্য অনুষ্ঠান নয়। এর প্রধান লক্ষণগুলি বৌদ্ধ মন্ত্রযান অথবা বজ্রযান সম্প্রদায় হতে আগত। শূন্যপুরাণ অথবা ধর্মপূজা-বিধানের স্তোত্রগুলি মন্ত্রযান অথবা বজ্রযান স্তোত্রমালার অনুরূপ — অবশ্য তার মধ্যে স্থানীয় ও দেশজ প্রভাবও আছে। 'শূন্যপুরাণ' ও 'ধর্ম পূজাবিধান'-এর (সৃষ্টিতত্ত্বের অংশগুলি ছাড়া) দেবদেবীর বিহার-নির্মাণ, কলস-স্থাপন, আহুতি, হোম-প্রভৃতি অনুষ্ঠান বজ্রযান বৌদ্ধগণের 'ক্রিয়া সংগ্রহ'-এর অনুরূপ। কিন্তু 'ক্রিয়াসংগ্রহ'-এ এই সকল ধর্মানুষ্ঠানে বৌদ্ধধর্মের সর্বজীবের কল্যাণের আদর্শকে উচ্চে ধারণ করা হলেও, অহিংসাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে আহুতি ও পশুবলির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। 'ক্রিয়া সংগ্রহ'-এ হারিতী দেবীর নিকট মৎস্য, জীবরক্ত ও মাংস দানের বিধান আছে — শূন্যপুরাণেও দেবীর নিকট জীবহত্যার নির্দেশ আছে।

কিন্তু তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম নামে পরিচিত এই সকল পরস্পর-বিরোধী আচার-অনুষ্ঠানকে অবিমিশ্র বৌদ্ধ বলে গ্রহণ করা সমীচীন হবে না। ধর্মপূজায় কতকগুলি নেপালী বৌদ্ধ অনুষ্ঠানের পরিচয় পাওয়া যায়, তা হিন্দুও নয়, বৌদ্ধও নয় — স্থানীয় অনুষ্ঠান মাত্র। যেমন ধর্মঠাকুর ও শীতলার (তান্ত্রিক বৌদ্ধগণের হারিতী?) পূজায় চূণের ব্যবহার। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় পশ্চিমবঙ্গের কূর্মাকৃতি ধর্মশিলার মধ্যে পঞ্চ-বোধিসত্ত্ব-সমন্বিত নেপালী বৌদ্ধ স্তূপের সাদৃশ্য দেখেছেন। কিন্তু সকল ধর্মশিলাই কূর্মাকৃতি নয়। ধর্মস্তোত্রে কূর্মপৃষ্ঠে ধর্মঠাকুরের দারুময় পাদুকা রক্ষণের ইঙ্গিত আছে। কিন্তু এই কূর্ম হিন্দু পুরাণেও সুপরিচিত। তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মে পরমপুরুষের কল্পনা প্রায় হিন্দু ধর্মতত্ত্বের অনুরূপ। ধর্মপূজকগণ তান্ত্রিক বৌদ্ধগণ অপেক্ষা আরও কিছুদূর অগ্রসর হয়ে উপনিষদের নিরাকার ব্রহ্ম, শৈব ও তান্ত্রিকগণের শিব, বৈষ্ণবের বিষ্ণু-কৃষ্ণ ও রাম সকলকেই ধর্মের কল্পনায় গ্রহণ করেছেন

— শুধু বুদ্ধকেই গ্রহণ করেন নি। ধর্মের উপাসনা গ্রন্থে ও ধর্মমঙ্গল সাহিত্যে সিংহলই ধর্মদেবতার আদি ও প্রিয়স্থান — এ ছাড়া বুদ্ধের সঙ্গে ধর্মদেবতার অন্য কোন সম্পর্ক নেই। দ্বিজ রামচন্দ্রের ধর্মমঙ্গলে এই সিংহলকে পশ্চিমবঙ্গেরই কোন স্থান বলা হয়েছে। কিন্তু এ-সম্বন্ধে ধর্ম-উপাসক ও ধর্মমঙ্গলের কবিগণ স্পষ্ট সচেতন ছিলেন বলে মনে হয় না।

সুতরাং ধর্মপূজার সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের সম্পর্ক অত্যন্ত ক্ষীণ। দ্বাদশ শতক পর্যন্ত বঙ্গদেশে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের লুপ্তাবশেষ বর্তমান ছিল। বাঙলায় সেনরাজত্বকাল থেকে হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান ও মুসলমান বিজয়ে বৌদ্ধধর্মের অবসান সূচিত হয়। বৌদ্ধবিহার ও ধর্মকেন্দ্রগুলি শত্রুদুর্গরূপে কল্পিত হয়ে মুসলমানগণ-কর্তৃক বিনষ্ট হয়। কিন্তু বহিরাগত কোন সংঘাতই কোন দেশের চিত্তলোক হতে দীর্ঘকাল-পোষিত কোন ধর্ম-সংস্কারকে অপসারিত করতে পারে না। তাই তৎকালীন তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মও হিন্দু ও মুসলিম ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে আত্মগোপন করতে থাকে। ধর্ম উপাসনাও এইরূপ একটি লৌকিক ধর্মসমন্বয়ের দৃষ্টান্ত। যে যৌগিক অনুষ্ঠানগুলি সহজিয়া বৌদ্ধধর্মের মুখ্য উপাদান, কয়েকটি রূপক ও বাক্যরীতি-ভিন্ন ধর্মপূজায় তার অন্য কোনও চিহ্ন নেই।

ত্রয়োদশ শতকে বাঙলায় মুসলমান বিজয়ের পরে, এদেশে ধীরে-ধীরে তাঁদের রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় প্রভাব বিস্তারলাভ করে। হিন্দু লোকবিশ্বাসে অসংখ্য দেবদেবীর কল্পনার পাশে ধর্মপূজকগণের নিরাকার ধর্মপূজার সঙ্গে মুসলিম একেশ্বরবাদের আদর্শের সাদৃশ্য স্পষ্ট। এই জন্যই পরবর্তীকালে ধর্মের কল্পনায় মুসলিম প্রভাব এসে পড়েছে। বাঙলার মুসলমান লোক সাহিত্যে আল্লাহ্-র কল্পনায় নাথ ও ধর্ম-উপাসক প্রভৃতি অপ্রধান সম্প্রদায়গুলির ভাবাদর্শ ও পরিভাষার প্রভাবও অনস্বীকার্য।

একথা অনুমান করা ভুল হবে না যে, ধর্মপূজকগণ তাঁদের ধর্মোপাসনা ও পূজাপদ্ধতির জন্য বর্ণহিন্দুদের হস্তে নির্যাতিত হতেন — মুসলমান আগমনে তাঁরা স্বীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হন। 'শূন্যপুরাণে' কথিত হয়েছে, যমের অনুচর হিন্দু অপদেবতার রূপ ধাবণ করে রামাই-এর পুরীতে প্রবেশ করে ও তাঁকে দৃঢ়রূপে বন্ধন করে ধর্মরাজ যমের নিকট উপস্থিত করে। ধর্মরাজের আদেশে রামাইকে দ্বিখণ্ডিত করা হয় — অগ্নি ও সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হয় । কিন্তু করতার ধ্যানে তিনি নিষ্কৃতি লাভ করেন। এই কাহিনীর মূলে সম্ভবত বর্ণহিন্দুদের হস্তে ধর্ম পূজকদের এক নির্যাতনের ইতিহাস প্রচ্ছন্ন আছে। এই জন্যই ধর্মমঙ্গল কাব্য-মাত্রেরই প্রারম্ভে একটি সামাজিক ভীতি ও সঙ্কোচের ভাব প্রকাশিত হতে দেখা যায়। ধর্মপূজা-বিধানে স্পষ্টই কথিত হয়েছে : সদ্ধর্মীদের উপর ব্রাহ্মণদের অত্যাচারে ক্রুদ্ধ হয়েই বৈকুণ্ঠে নিরঞ্জন খোদারূপ ধারণ করে 'যবন-অবতার'-রূপে হুগলীর জাজপুরে উপস্থিত হন—'জাজপুর দেহারা বন্দিব একমন। যেইখানে অবতার হইলা যবন ॥' ধর্মপূজাবিধানে 'নিরঞ্জনের রুষ্মা' অধ্যায়ে (রামাই পণ্ডিতের ভনিতায়) হিন্দুধর্মকে ধিক্কৃত করে মুসলমান ধর্মের মহিমা কীর্তন করা হয়েছে। ধর্মপূজার কয়েকটি নিয়ম মূলত ঐসলামিক। ধর্মপূজায় ছাগ, হংস, পায়রা প্রভৃতি মুসলমান প্রথানুযায়ী পশ্চিমমুখে রেখে জবাই করা হয়। অন্যান্য অনেক অনুষ্ঠানেও পশ্চিম দিকের প্রাধান্য দেখা যায়। দ্বার-সমূহের বর্ণনায় প্রথমে পশ্চিমের উল্লেখ এবং পশ্চিমদ্বার-কোটাল চন্দ্রের প্রাধান্য নিঃসন্দেহে মুসলমান-প্রভাবের পরিচায়ক। ধর্মমঙ্গলে লাউসেনের প্রার্থনায় সূর্য পশ্চিমদিকে উদিত হয়েছিলেন। তা ছাড়া ধর্মপূজায় শুক্রবারই প্রশস্ত দিবস। এই সকল ঐসলামিক আচার-অনুষ্ঠান ধর্মপূজায় অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালেই প্রবেশ করেছে মনে হয়।

একাদশ পরিচ্ছেদ

ধর্মদেবতার কল্পনা

১. ধর্মের হিন্দু-কল্পনা

লোকবিশ্বাসে উপনিষদের ব্রহ্ম যেমন সাংখ্যের পুরুষ, তন্ত্রের শিব ও বৈষ্ণবের বিষ্ণু, কৃষ্ণ ও রামের কল্পনার সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে, তেমনই ধর্মপূজায় ধর্মঠাকুরের কল্পনায় বিচিত্র হিন্দুদেবতা ও পরবর্তীকালের বৌদ্ধ-কল্পনার বেণীবন্ধন ঘটেছে।

হিন্দুশাস্ত্রে ধর্মের দেব-কল্পনা সুপ্রাচীন কালের। 'ধর্ম'-শব্দের সাধারণ অর্থ ধারণীয়, রক্ষণীয়, ধারক, রক্ষক, নিয়ম, ধর্মমত, ক্ষমা, সত্য, সুবিচার, ন্যায়-নিরপেক্ষতা, প্রকৃতি, চবিত্র এবং বিশেষত মূর্তিমান নিরপেক্ষতা। বৈদিক সাহিত্যে 'ধর্মন্' শব্দের অর্থ — পালক, ধারক, নিয়ামক, ন্যায়াধিপ, নিয়মাধীশ ও সর্বধর্মের কেন্দ্রস্থ পুরুষ। লোকবিশ্বাসে ইনিই ন্যায় ও নিয়ম-শৃঙ্খলার অধিকর্তা। আজও প্রতিজ্ঞা-গ্রহণ-কালে যে-ধর্মসাক্ষী করা অথবা দুঃখদুর্দশায় যে-ধর্মকে স্মরণ করা হয়, তিনি স্বয়ং ঈশ্বর ভিন্ন আর কেউ নন। বৈদিক যুগ থেকেই ধর্ম দেবতারূপে কল্পিত। শতপথ ব্রাহ্মণে দেবরাজ ইন্দ্র 'ধর্মইন্দ্র' বলে কথিত। পুরাণে ব্রহ্মার বক্ষ থেকে উৎপন্ন অন্য-এক ধর্মের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, — যিনি ন্যায় নিয়ম-শৃঙ্খলা ও সত্যেব প্রতীক। সংস্কৃত মহাকাব্যদ্বয়ে ও পুরাণে ন্যায় ও মৃত্যুর অধিপতি এক ধর্মরাজ রয়েছেন। বৌদ্ধ লোকসাহিত্যেও যম ধর্মরাজ নামে পরিচিত। ইনি সূর্য-দেবতার অনুচর, বিষ্ণুর সঙ্গে অভিন্ন এবং নিয়মাধিপতি প্রজাপতি ও দক্ষজামাতা। পৌরাণিক সাহিত্যে ধর্ম আরও অনেক গুণের প্রতীক — এদের মধ্যে মৃত্যু ও ন্যায়ের অধিপতি ধর্ম বা ধর্মরাজের কল্পনাই অধিক। মহাভারতে যমপুত্র যুধিষ্ঠির ধর্মপুত্র ও ধর্মরাজ। মহাভারতের বনপর্বে যুধিষ্ঠির যক্ষবেশী ধর্মের কয়েকটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে পরিতুষ্ট করেন। এই ধর্ম মহাপ্রস্থান পর্বে আরেকবার যুধিষ্ঠিরের সত্যপরতা পরীক্ষার জন্য এসেছিলেন সারমেয়রূপে। স্কন্দপুরাণে দেখা যায়, ধর্ম বা ধর্মরাজ-ঋষিরূপী সূর্যপুত্র যমের তপস্যায় ভীত হয়ে দেবতাগণ বর্ধিনী নামক অপ্সরাকে পাঠান — ধর্ম তাকে বলেন, তিনি দুষ্কৃতকারীর যম ও জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির ধর্ম। তিনি স্বেচ্ছায় বৃষভরূপ ধারণ করে শিবের বাহনে পরিণত হন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাণ্ডুলিপি-গ্রন্থাগারে গুণরাজ খানের 'ধর্ম-ইতিহাস' নামক একটি পাণ্ডুলিপিতে রামায়ণ-মহাভারতের বিবিধ গল্প উল্লেখ করে দেখান হয়েছে, ভক্তের বিপদে ধর্ম (এখানে পরম দেবতা) কেমন করে ভক্তকে রক্ষা করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের নানাস্থানে ধর্ম-পূজকদের মধ্যে ধর্ম ধর্মরাজ বা মহিষবাহন ধর্মরাজ যমের সহিত অভিন্ন এবং ধর্মের গাজনে ধর্মরাজ যমের নানাবিধ অনুষ্ঠান প্রচলিত। ধর্মরাজের পূজার মন্ত্র এইরূপ : 'নমস্তে বহুরূপায় যমায় ধর্মরাজায়'। শূন্যপুরাণে দেখা যায় : ধর্ম কর্ণধাররূপে ভক্তগণকে বৈতরণীপারে নিয়ে যাচ্ছেন—রামাই পণ্ডিত ভক্তদের নৌকায় উঠতে সাহায্য করছেন। হিন্দু শাস্ত্রে যমের সঙ্গে বৈতরণীর কল্পনা অবিচ্ছেদ্য — এ থেকেই বোঝা যায়, এই ধর্মরাজ ধর্মরাজ যম-ভিন্ন অপর

কেউ নন। 'ধর্মপূজা-বিধান'-এ ধর্মঠাকুর শৃঙ্খলহস্ত কাল-বিকাল ও চিত্রগুপ্ত-সমভিব্যাহারে মহিষবাহন যমের সঙ্গে অজ্ঞাতসারে এক হয়ে গেছেন।

ধর্মের উপাসনা-পুস্তকে যম অপেক্ষা শিব ও বিষ্ণুর সঙ্গে ধর্মের অভিন্নতা বেশী দেখা যায়। কিন্তু ধর্মমঙ্গল-সাহিত্যে ধর্ম শিব অপেক্ষা বিষ্ণু, কৃষ্ণ ও রামের সঙ্গেই মিলে গেছেন বেশী।

২. বৌদ্ধ-কল্পনায় 'ধর্ম'

সংস্কৃত 'অমরকোষ' অভিধানে 'ধর্মরাজ' বুদ্ধেরই অভিধা ; জাতকের গল্পে ধর্মরাজ অর্থে বুদ্ধকেই বুঝান হয়েছে। বুদ্ধের জন্মদিন 'বৈশাখী-পূর্ণিমা' এবং ধর্মচক্র-শিক্ষাদানের দিন 'আষাঢ়ি-পূর্ণিমা' ধর্মপূজকদেরও উৎসব-দিবস। কিন্তু এ থেকে ধর্মঠাকুরকে বুদ্ধের সহিত অভিন্ন করা ঠিক হবে না। হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় লোকবিশ্বাসের পরস্পর-বিরোধী লক্ষণ-সমন্বয়ে তাঁর সৃষ্টি।

মহাযান বৌদ্ধধর্ম তার উদার সর্বজনীনতা ও দৃষ্টির স্বাধীনতায় উপনিষদের অনুরূপ। নাগার্জুন ও তাঁর অনুবর্তিগণের মত যাই হোক, বিজ্ঞানবাদীগণের বিশুদ্ধ-চৈতন্য-রূপে পরমতত্ত্বের কল্পনা ভাবস্বভাব ছাড়া কিছুই নয়। অশ্বঘোষের তথতাবাদে তথতা-স্বভাব ধর্মের কল্পনা নিরাকার ও নির্গুণ হলেও শাশ্বত ও অপরিবর্তনীয় বলে ভাবস্বভাব। বিজ্ঞপ্তিমাত্রতা ও অভূতপরিকল্পও জ্ঞানাতীত ব্রহ্মের অনুরূপ। বিজ্ঞানবাদিগণের মতে, শূন্যতা নেতিবাদ নয় — এটি শুধু দ্বৈতভাবের অস্বীকার এবং অপরিবর্তনীয়, অজ্ঞেয় ও নিত্যবিশুদ্ধ-চৈতন্যের দ্যোতক।

আবার মহাযান ত্রিকায়ের কল্পনার মধ্যে ধর্মকায়ের কল্পনা এক পরম দেবতারূপে। ধর্মকায় আবার নীতিদেহরূপে কল্পিত — বুদ্ধ নিজ উপদেশাবলীকেই তাঁর নিত্যদেহ বলেছেন। মহাযান মতে, ধর্মকায় বস্তুর তথতারূপ, ধর্মধাতু অথবা সর্বভূতের আদিভূত গুহাহিত সত্য বা স্বভাবকায়। এই নিত্য অনন্তগুণান্বিত সত্তা সর্বভূতের মধ্যে থেকে নির্বাণের পথে পরিচালিত করছে।

বুদ্ধের ত্রিকায়ের কল্পনা থেকেই পরবর্তীকালে ব্যক্তি- ভগবানের উদ্ভব। ধর্মকায়-বুদ্ধ পরমপুরুষের, সম্ভোগকায়-বুদ্ধ বিরোচন-প্রমুখ ধ্যানিবুদ্ধগণের এবং নির্মাণকায়-বুদ্ধ মানুষীবুদ্ধগণের কল্পনায় রূপান্তরিত হয়।

বিভিন্ন বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের ত্রিকায়ের কল্পনা অথবা পরমতত্ত্বের সম্বন্ধে বিচিত্র বিশ্বাসই ব্যক্তির ভগবানের কল্পনায় পরিণত। তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্মে ইনিই প্রভু বজ্রসত্ত্ব। শূন্যতা বোধিচিত্ত, বিশুদ্ধ-চৈতন্য, মহাসুখ-প্রভৃতি সকল বৌদ্ধ আদর্শই উত্তরকালে এক পরমপুরুষের তত্ত্বব্যাখ্যা লাভ করে।

ধর্মের কল্পনার বিবর্তন-প্রসঙ্গে বৌদ্ধগণের বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘ — এই ত্রিরত্নের কথা এসে পড়ে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী-প্রমুখ অনেক পণ্ডিতের মতে, ত্রিরত্নের বুদ্ধ পরবর্তীকালে হিন্দু-পুনরুত্থানের যুগে হিন্দুধর্মের অঙ্গীভূত। সঙ্ঘ হিন্দুপূজার উপকরণ শঙ্খে এবং ধর্ম বৌদ্ধস্তূপের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে কূর্মাকৃতি ধর্মঠাকুরে পরিণত হয়। কিন্তু হিন্দু-পূজায় শঙ্খের ব্যবহার এত সাধারণ যে, শূন্যপুরাণে অসংখ্য পূজোপকরণের মধ্যে শঙ্খের উল্লেখ হতে 'সঙ্ঘের' শঙ্খে রূপান্তর

স্বীকার করা যায় না। বিশেষত, বিষ্ণুর শঙ্খাসুর-নিধনকথা হিন্দুগণের সুপরিচিত। ধর্মপূজাবিধানে অবশ্য শঙ্খের স্থান অনেক উচ্চে — ধর্মমঙ্গল কাব্যসমূহের প্রারম্ভে শঙ্খের বন্দনাও দেখা যায়। কিন্তু এ থেকে শঙ্খের সঙ্গে বৌদ্ধ সঙ্ঘের সম্পর্ক প্রমাণিত হয় না।

তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মে শূন্যতা ও করুণার রূপান্তর প্রজ্ঞা ও উপায় এবং প্রজ্ঞা ও উপায় আবার নারী ও পুরুষতত্ত্ব রূপে দেখা দিয়েছে। এইরূপে বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘ — এই ত্রিরত্ন যথাক্রমে উপায়, প্রজ্ঞা ও তাদের মিলনে উৎপন্ন ভূতজগতে পরিণত হয়। পুরীর জগন্নাথ, বলরাম ও তথাকথিত সুভদ্রা এই উপায় প্রজ্ঞা ও ভূতজগতে পরিবর্তিত বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘেরই সাক্ষ্য। গুহ্য বৌদ্ধ সাহিত্যে বুদ্ধকে বলা হয়েছে 'জগন্নাথ'। হিন্দুগণও পরমপুরুষকে একই অভিধায় আহ্বান করেছেন। শুধু এই অভিধার মাধ্যমেই প্রথম রত্ন 'বুদ্ধ' হিন্দু-কল্পনায় অনুপ্রবেশ করেছেন। বৈষ্ণব কবি জয়দেব বুদ্ধকে বিষ্ণুর নবম অবতার বলেছেন। 'ধর্মপূজাবিধান'-গোবিন্দবিজয় প্রভৃতি ধর্মোপাসনা পুস্তকে কথিত হয়েছে : নবম অবতারে ভগবান (যিনি বুদ্ধ অন্য কেউ নন) তাঁর সমুদ্রতীরবর্তী পুরীতে আবির্ভূত হয়ে প্রসাদ বিতরণ করেন — তিনি পুরীতে হিন্দু-মুসলমানের কাছে 'জগন্নাথ' এবং গৌড়ে ধর্মরাজরূপে পূজিত।

কিন্তু দার্শনিকতার দিক থেকে 'ত্রিরত্নের' অন্যতম 'বুদ্ধ' ভূতজগতের প্রতীক উপায় বা করুণার সঙ্গে অভিন্ন এবং 'ধর্ম' সর্বভূতের কারণভূত সত্যের প্রতীক প্রজ্ঞা বা শূন্যতার সঙ্গে অভিন্ন — সেজন্য লোকবিশ্বাসে 'বুদ্ধের' উপরে 'ধর্মের' আসন প্রতিষ্ঠিত। দ্বিতীয়ত, বৌদ্ধ ত্রিরত্নের সম্বন্ধে জনসাধারণের কোন স্পষ্ট ধারণা না-থাকায়, পরবর্তীকালে অখণ্ড নিয়ম-শৃঙ্খলার অধীশ্বর ধর্মই পরমপুরুষরূপে গৃহীত। বিশেষত, পরবর্তী হিন্দু পুনরুত্থানের যুগে ত্রিরত্নের মধ্যে একমাত্র 'ধর্ম' ভিন্ন অন্য কোন রত্নের পরমপুরুষরূপে গৃহীত হওয়া সম্ভব ছিল না।

ধর্মঠাকুরের সঙ্গে সাধারণত কোন নারীদেবতার সম্পর্ক দেখা যায় না। ধর্মপূজাবিধানে অবশ্য ধর্মপূজার পরে অন্যান্য দেবদেবীর সঙ্গে অন্ধত্ব ও কুষ্ঠরোগের দেবতা কামিন্যার পূজা দেখা যায়। কোথাও-কোথাও ইনি ধর্মঠাকুরের শক্তিরূপে কল্পিতা। তাঁর বর্ণনা হিন্দু ও বৌদ্ধ তন্ত্রের দেবীবর্ণনার অনুরূপ। ধর্মের উপাসনা-গ্রন্থে ধর্মদেবতা মহেশ্বর, মহাদেব, দেবদেব এবং কামিন্যা দেবী ভগবতী, আদিদেবী, আদিশক্তি, বাশুলী, চণ্ডী, দুর্গা, পার্বতী প্রভৃতি নামে অভিহিত। অনেক স্থানে ধর্মঠাকুর একেবারে শিবে পরিণত হয়েছেন এবং ধর্মের গাজন শিবের গাজনে পরিণত হয়েছে। ধর্মের গাজনের গান ও অনুষ্ঠানগুলি লক্ষ্য করলেই এর সত্যতা বোঝা যাবে। পূর্ববঙ্গে চৈত্রসংক্রান্তিতে যে-নীলপূজার প্রচলন আছে, তত্রস্থ অধিবাসিগণের কাছে তা শিবের সঙ্গে সম্পৃক্ত হিন্দু উৎসব। এর গানগুলির পশ্চিমবঙ্গের ধর্মের গাজন ও উপাসনা-পুস্তকের গানগুলির সঙ্গে শুধু ভাবেই নয়, অনেক স্থলে ভাষাতেও সাদৃশ্য আছে।

ধর্মপূজকদের সাহিত্যের সৃষ্টিতত্ত্বে শিব ও শক্তির প্রাধান্য দেখা যায়। বৌদ্ধতন্ত্রেই শিব ও শক্তি পরমতত্ত্বরূপে গৃহীত হয়েছেন। শূন্য-পুরাণের সৃষ্টিতত্ত্বে দেবী আদ্যা, দুর্গা বা পার্বতীর কামদেবের সাহায্যে বল্লুকাতীরে 'করতার' ধ্যানমগ্ন দেবতার ধ্যানভঙ্গ করবার দৃশ্যটিও হরপার্বতীর কাহিনীর অনুরূপ। কিন্তু এ সকল সাহিত্যে শিবের কল্পনায় উত্তরকালের বৌদ্ধ-কল্পনার প্রভাবও অস্বীকার করা যায় না।

উত্তরকালের বৌদ্ধধর্মের আদিদেবদেবী নেপালী বৌদ্ধধর্মে আদিবুদ্ধ ও আদিপ্রজ্ঞায় পরিণত হন। এই আদিবুদ্ধ 'স্বয়ম্ভূ-পুরাণের' স্বয়ম্ভূ এবং নেপালের গৌরীশৃঙ্গ পর্বতে সর্বদেব-যক্ষ-রক্ষ-পূজিত পরমদেব। ইনি ধর্মধাতু-স্বরূপ এবং চারি তথাগত-পরিবৃত প্রভু বিরোচনরূপেও কথিত।

ইনিই শাক্যমুনি এবং একাধারে জগন্নাথ ও ধর্মরাজ। ইনি স্বয়ম্ভু ও শম্ভু নামেও পরিচিত। আবার কোথাও ইনি ত্রিরত্নস্বরূপ। এতে মনে হয়, পরবর্তীকালে ত্রিরত্ন আদিবুদ্ধের ত্রিগুণে পর্যবসিত হয়েছে। এই গ্রন্থেই আবার মঞ্জুশ্রী পরম দেবতা ও ধর্মরাজ নামে অভিহিত। এতে আদিবুদ্ধ ও আদিপ্রজ্ঞা উপায় ও প্রজ্ঞা, করুণা ও শূন্যতা, শিব ও শক্তি বলে কথিত।

'ধর্মকোষ-সংগ্রহ'-এ বলা হয়েছে : তিনি সর্বজ্ঞানের আদি বলে তাঁর নাম আদিবুদ্ধ। তিনি আকাশের মত শূন্য ও অঞ্জনহীন বলে নিরঞ্জন। তিনি নিরাকার ও নিরাধার এবং উপায় ও মহাবিরোচন। এই আদিবুদ্ধই 'ধর্মরাজ' — কারণ তিনি 'ধর্মানাম্ রাজা' ; তিনি 'ধর্মাদ্ রাজতে সংসারে রাজতে' এবং 'ধর্ম রাজতে যস্মাদ্।' তিনিই 'ধর্মেশ' — কারণ, তিনি দশকৌশল ও অন্যান্য ঐশী-গুণান্বিত এবং এই সকল গুণে ভূষিত ব্যক্তিগণের প্রভু। তিনি 'ধর্মরাজ' ; কারণ তিনি ধর্মসমূহের পরম শুদ্ধ-জ্ঞানের সঙ্গে সম্পৃক্ত। ধর্মের অর্থ 'ধর্মধাতু ; তাই ধর্মধাতুর দ্বারা আলোকিত বলেও তিনি ধর্মরাজ। মহাসুখ-রূপেও তিনি ধর্মধাতু। তিনি সর্ব জীবের প্রভু প্রজাপতি। অতএব দেখা যাচ্ছে, নেপালী বৌদ্ধগণের আদিবুদ্ধ (উপায়স্বরূপ) ধর্মরাজ নামেও অভিহিত। এ থেকে প্রতীত হবে, উত্তরকালের বৌদ্ধগণের আদিদেবের কল্পনা পশ্চিমবঙ্গ ও উড়িষ্যার ধর্মঠাকুরের কল্পনায় প্রতিফলিত হয়েছে।

কাজেই ধর্মদেবতা কোন বিশেষ দেবতার প্রতিরূপ নন — তিনি দশম শতাব্দী থেকে বঙ্গ ও উড়িষ্যার লোককল্পনায় বিশ্ববিধাতারই এক সাধারণ প্রতিচ্ছবি। 'ধর্মপরীক্ষা'-নামে একটি হিন্দি গ্রন্থে জৈনদেরও প্রধান দেবতাকে জিনদেব বা 'ধর্ম' বলা হয়েছে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

ধর্ম-সাহিত্যে 'ধর্ম'

ধর্মের উপাসনা-পুস্তকের ধর্ম অপেক্ষা ধর্মমঙ্গল সাহিত্যে (অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের) ধর্মের কল্পনা অনেক সরল ও হিন্দু আদর্শ-মণ্ডিত। বৌদ্ধ সম্পর্ক একেবারে নেই বললেই চলে। ধর্মের শাস্ত্রগ্রন্থে শূন্যতাই ধর্মের স্বরূপ। ধর্মপূজকগণ বৌদ্ধগণের নিকট থেকে এই শূন্যতাকে দার্শনিকভাবে গ্রহণ করেন নি। ভারত ও ভারতের বাইরে বৌদ্ধদর্শন, ধর্ম ও সাহিত্যে পরমতত্ত্বরূপে শূন্যতার প্রাধান্য এবং মহাযান বৌদ্ধধর্মের মাধ্যমে এটি এত সুপরিচিত ছিল যে, পরমসত্য ও শূন্যতার কল্পনা এক অবিচ্ছেদ্য ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছিল। তান্ত্রিক অথবা বজ্রযান বৌদ্ধধর্মের পরস্পর-বিরোধী অবৌদ্ধ উপাদানগুলি শূন্যতা ও বজ্রশব্দের বারংবার ব্যবহারে বৌদ্ধ করবার চেষ্টা হয়েছে। বাঙ্‌লা ও উড়িষ্যার ধর্ম-উপাসনা,, ও বৈষ্ণবধর্ম এবং বাঙ্‌লার মুসলমান যোগসাহিত্যে এর পরিচয় পাওয়া যাবে। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ষোড়শ শতকে উড়িষ্যার অচ্যুতানন্দ দাস, বলরাম দাস, জগন্নাথ দাস, অনন্ত দাস, যশোবন্ত দাস, চৈতন্য দাস-প্রমুখ চৈতন্য-সমসাময়িক ও তাঁর অনুবর্তী বৈষ্ণব কবিগণও শূন্যপুরাণের মত কৃষ্ণকে শূন্যতা-স্বরূপ বলে বর্ণনা করেছেন।

ধর্মের আর-একটি সুপরিচিত নাম নিরঞ্জন। হিন্দু দর্শন ও ধর্মতত্ত্বে 'নিরঞ্জন' শব্দ অপরিচিত না হলেও, বৌদ্ধ শাস্ত্রেই নির্মলশূন্য সত্যের প্রতীকরূপে এটি সুপরিচিত। পরম সত্যের অথবা নিরাকার পরমপুরুষের অভিধা হিসাবে নিরঞ্জন-শব্দের ব্যবহাব নাথ, বাউল, সূফী, হিন্দি নির্গুণা সম্প্রদায়, শিখ কবিগণ ৎ ধর্মপূজকগণ — সকল সম্প্রদায়ের সকল ভাষা-. সাহিত্যেই দেখা যায়।

১. 'ধর্ম'-এর শাস্ত্রে 'ধর্ম'

'ধর্মপূজাবিধান-এব' ধ্যানমন্ত্রে ধর্মের এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায় :

"ওঁ যস্যান্তং নাদিমধ্যং ন চ করচরণং নাস্তি কায়ো নিনাদম্ ।
নাকারং নাদি-রূপং ন চ ভয়মরণং নাস্তি জন্মৈব যস্য।
যোগীন্দ্র-ধ্যান-গম্যং সকল-দল-গতং সর্ব-সঙ্কল্প-হীনং ।
তত্রৈ কোপি নিরঞ্জনো হমরবরদঃ পাতু মাং শূন্যমূর্তিঃ ॥"

আরও, তিনি সর্বসিদ্ধিদাতা, নিরাকার, সর্বমুদ্রাসুশোভিত এবং একাধারে সর্ববস্তুর অভাব ও আলয়স্বরূপ। ত্রিলোকের উদ্ধারের জন্য তিনি মর্তে অবতীর্ণ। বৌদ্ধতন্ত্রে পরমতত্ত্বের কল্পনাও এইরূপ। 'ধর্মপূজাবিধান'-এ তিনি আবার চৈতন্য-সমুদ্রোত্থিত পরমানন্দ-স্বরূপ, উল্লুকাধিষ্ঠিত ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের মিলিতস্বরূপ ; তিনি চতুর্দশলোক-বন্দিত শূন্যাকার, জ্ঞান

ও চৈতন্যস্বরূপ ; তিনি বিশুদ্ধ ও অব্যয়, নিষ্কল ও নিরাকার, 'ওম্' ও সর্বগুণাতীত — অব্যক্ত অথচ গুহাহিত সত্য, ব্রাহ্মণ ও দিকদেশকালাতীত। তিনি বল্লুকাতীরে (বর্ধমানে) উল্লুকাধিষ্ঠিত। তিনি পঞ্চম বেদ (ধর্ম-উপাসনা-শাস্ত্র) পাঠে জ্ঞেয়। তিনি দেবাদিদেব, দেবেশ, সর্বদেব, আদিদেব, জগন্নাথ, সিদ্ধিদাতা, যোগেশ্বর, অচিন্ত্যদেব ও শূন্যদেব। তিনি সনাতন, শুদ্ধসত্ত্ব, করুণাময়মূর্তি ও সন্তোষশীল।

'ধর্মপূজাবিধান'-এ ব্যবহৃত এই গুণগুলি অধিকাংশই বৌদ্ধতন্ত্রের — কোথাও-কোথাও হিন্দু শাস্ত্রের অনুরূপ। কিন্তু লক্ষণীয় এই যে, ধর্মবর্ণনায় ভাবস্বভাব অপেক্ষা অভাব-স্বভাব শব্দেরই প্রাধান্য। ধর্ম-বন্দনায় মহাশূন্য, পরমশূন্য-প্রভৃতি সর্বপ্রকার শূন্যতা-শব্দের ব্যবহারও বৌদ্ধকল্পনার ব্যাপক অনুকৃতির পরিচায়ক।

'শূন্যপুরাণ'-এও ধর্ম শূন্যরূপ, নিরাকার, বিপদবারণ ও দেবাদিদেব। তিনি দেবদেব করতার, শূন্যতাগত ও ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের মিলিত সত্তা। শূন্যতায় ভর করে মহাশূন্যতায় বিচরণশীল সেই প্রভুর ইচ্ছায় শূন্যতা থেকেই এই সৃষ্টির উদ্ভব। ব্রহ্মা তাঁর জন্য গভীর তপস্যায় মগ্ন, শিব হেঁটমুণ্ড-উর্ধ্বপাদে তাঁর মহিমা কীর্তন করেন, পুরন্দর নানাবিধ কৃচ্ছ্রব্রতে রত এবং যোগিঋষিগণ দুশ্চর তপে মগ্ন। তাঁর স্নানের জন্য হনুমান বজ্রনখে দীর্ঘিকা খনন, চতুষ্পার্শ্বে মণিময় ঘাট নির্মাণ ও ভোগবতী জলে পূর্ণ করেন। ধর্ম স্বর্ণময় শিবিকা আরোহণ করে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর ও বশিষ্ঠ-নারদ-সমভিব্যাহারে স্নান করতে যান।

এই সকল বর্ণনার সঙ্গে শিব, বিষ্ণু (বা নারায়ণ) অথবা কৃষ্ণের বর্ণনার কোন পার্থক্য নেই। শুধু তাই নয়, ধর্মের আলয় কোথাও বৈকুণ্ঠ, কোথাও কৈলাস। ধর্মের বর্ণনায় 'শূন্য' শব্দের প্রচুর ব্যবহার এবং নিরাকার ও নির্গুণ স্বরূপের প্রাধান্য লক্ষিত হলেও ধর্ম সর্বত্রই সাকার ও ব্যক্তি-দেবতা।

২. সূর্যদেবতারূপে ধর্ম

ধর্ম কোথাও সূর্যদেবতা। কারণ, প্রথমত, সূর্যের ন্যায় তিনি দ্যুতিমান। দ্বিতীয়ত, ধর্মের স্বরূপ শূন্যতা ; শূন্য ও সূর্য উভয়েই গোলাকার। আবার ধর্ম শূন্যতাচারী। শূন্যতার অর্থ আকাশ। সূর্যও আকাশচারী। সূর্যদেবতা সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কারণ এবং সত্ত্ব-রজ-তম তথা ব্রহ্মা-বিষ্ণু মহেশ্বরের প্রতীক। 'ধর্মপূজাবিধান'-এ সূর্যের সঙ্গে ধর্মের অভিন্নতা ও ধর্মপূজকদের সূর্যের পূজা করতে দেখা যায়। সূর্য এখানে চম্পানদীতীরে পূজিত গোসাঞি — সপ্তসমুদ্রতীরে তিনি শ্বেতশুভ্র সপ্তাশ্ব-যোজিত মণিমুক্তা-প্রবালাঞ্চিত রথে দ্বাদশ আদিত্য-সহ উদিত ; কণ্ঠে স্বর্ণপদ্মের মালা, মস্তকে ইন্দ্রধৃত ছত্র। ধর্মপূজাবিধানের এই বর্ণনা আমাদের ঋক্‌বেদের স্তোত্রগুলির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। শূন্যপুরাণেও দ্বাদশ আদিত্যের পূজা দেখা যায়। এর বর্ণনা এইরূপ : ধর্ম প্রত্যূষে নিদ্রাত্যাগ করেন, উল্লুক তাঁকে পূজা করে, এবং তিনি অষ্ট-শ্বেতাশ্ববাহিত স্বর্ণরথে আরোহণ করেন। পূর্বদিকে তাঁর স্বর্ণমন্দির। ভক্তগণ তাঁকে প্রত্যূষে নিদ্রাত্যাগ করে জগতের অন্ধকার দূরীভূত করতে প্রার্থনা করে। তাঁর আদেশে অবিলম্বে রথ সজ্জিত হয়। রথারূঢ় হলে তাঁর মুকুট গগন স্পর্শ করে — স্বর্গে ইন্দ্র ও পাতালে বাসুকি কম্পিত হয়। তিনি প্রভূত ঐশ্বর্য দান করে জগতের দুঃখ দূর করেন।

৩. ধর্মমঙ্গলে ধর্ম

[ক] বিষ্ণুরূপে ধর্ম ॥ ধর্মের শাস্ত্রে ও উপাসনা-পুস্তকে তাঁকে 'স্বরূপ-নারায়ণ', কমলবাহু, বৈকুণ্ঠপতি বলে আহ্বান ও তুলসীপত্র দান করা হয়েছে। ধর্মমঙ্গল-সাহিত্যে ধর্মের বিষ্ণুতে রূপান্তর প্রায় সম্পূর্ণ। অধুনা আবিষ্কৃত ধর্মমঙ্গল-সাহিত্য একান্ত পরবর্তীকালের — তাই রাম ও কৃষ্ণ-উপাসক বৈষ্ণবশাখার ছায়ায় পল্লবিত। সেজন্য ধর্মমঙ্গলের ধর্ম বিষ্ণুর সঙ্গে — বিশেষত, রাম ও কৃষ্ণের সহিত একাত্ম। শুধু সৃষ্টিতত্ত্ব-প্রভৃতি কয়েকটি স্থানে ধর্মের শূন্যমূর্তি ও নিরাকাররূপের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। ধর্মমঙ্গলে শিবের সহিত ধর্মের পূর্ববর্তী অভিন্নতার কল্পনা লুপ্তপ্রায়। কোন-কোন স্থানে ধর্মকে চণ্ডীপতি ও কৈলাসপতি বলে অভিহিত করা হয়েছে মাত্র। বিভিন্ন শাক্ত ও বৈষ্ণব শাখার উদ্ভবের সঙ্গে-সঙ্গে শৈবধর্মের দ্রুত-বিলোপের জন্য ধর্মমঙ্গল-সাহিত্যে শিবকে শুধু দেবীগণের সঙ্গে যুদ্ধে ধর্মকে সাহায্য করতে দেখা যায়।

বিভিন্ন ধর্মমঙ্গলে ধর্ম কোথাও উপনিষদের নির্গুণ ব্রহ্মের, কোথাও সাংখ্যের পুরুষের অনুরূপ ; কোথাও উভয়ের সঙ্গে পৌরাণিক বিষ্ণু ও তাঁর বিভিন্ন অবতারের কল্পনা মিশে গেছে। কোথাও আবার ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব-ইন্দ্র-বরুণ-পরিবৃত ধর্মদেবতাকে শক্তিপূজকগণের মধ্যে নিজ মহিমা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য মন্ত্রণা করতে দেখা যায়। মর্তে তাঁর পূজাপ্রচারের কোনো নির্দিষ্ট পন্থা ছিল না — শক্তিপূজকগণের হাতে ভক্ত লাউসেন বিপন্ন হলে তাঁকে উলূক অথবা হনুমানের নিকট সিংহাসন কম্পিত হবার কারণ জিজ্ঞাসা করতে দেখা যায় এবং অনেক সময় নিজ অসহায়তা বুঝে দেবসভা আহ্বান করতেও দেখা যায়।

ধর্মমঙ্গলে ধর্ম সাধারণত বিষ্ণুর মতই পীতাম্বর, নীলকান্তি, গরুড়বাহন ও কমললোচন— কর্ণকুণ্ডল ও শঙ্খ-পদ্ম-গদা-চক্রধারী। ভক্তের নিকট তিনি বিষ্ণুরূপে আবির্ভূত না হলে ভক্তগণ তাঁকে চিনতে পারে না। লাউসেনের প্রার্থনায় পশ্চিম উদয়ের জন্য হাকন্দ গমনকালে কোন সারমেয় তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে তাঁকে নবঘন-চতুর্ভুজ-রূপ ধারণ করতে হয়— এই সারমেয়ই অনন্তকাল তাঁর চরণস্পর্শ লাভ করবার জন্য তুলসীপত্র হবার বর লাভ করে। ধর্মপূজাবিধান ও কয়েকটি ধর্মমঙ্গলে বিষ্ণুর দশাবতার ধর্মেরই দশাবতার। ময়নাপুরের 'যাত্রাসিদ্ধি' (ধর্মঠাকুর) বিষ্ণুরূপে পরিচিত। 'যাত্রাসিদ্ধি-রায়ের পদ্ধতি' নামক পুস্তকে একটি সংস্কৃত শ্লোকে বল্লুকানদীতে গোববালাদের সঙ্গে ধর্মঠাকুরের জলকেলির বর্ণনা পাওয়া যায়। ধর্মমঙ্গলে ধর্মের স্তোত্রে তিনি প্রহ্লাদ, ধ্রুব, সুধন্বা, অজামিল-প্রভৃতির রক্ষক, পাণ্ডবদের আশ্রয়, অর্জুনের সারথি, ধার্তরাষ্ট্রদের হস্ত থেকে দ্রৌপদীর রক্ষাকর্তা, রাবণবধ ও সীতার উদ্ধার-কর্তা এবং বৃন্দাবনে গোপবালকরূপে ব্রহ্মার দণ্ডদাতা। মহাকাব্যদ্বয় ও পুরাণে বর্ণিত বিষ্ণুর বিভিন্ন অবতারের এইরূপ অসংখ্য গল্প ধর্মমঙ্গলে ধর্মঠাকুর সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয়েছে।

[খ] রামরূপে ধর্ম ॥ ধর্মমঙ্গলে রামের সঙ্গে ধর্মের একাত্মতা এসেছে হনুমানের মাধ্যমে। ধর্মের শাস্ত্রগ্রন্থে হনুমান ধর্মের চার কোটালের অন্যতম। কিন্তু ধর্মমঙ্গলে হনুমান একাধারে বাহন, পার্ষদ ও উপদেষ্টা। ঋক্‌বেদে উলূক ধর্মরাজ যমের বাহন। ধর্মরাজেরও বাহন ছিল উলূক (পেচক) — পরবর্তীকালে হনুমান সেই আসন গ্রহণ করে। ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে হনুমান অলৌকিক শক্তির অধিকারী ; সকল দেবদেবীই দুঃসাধ্য কর্মে তার সহায়তা গ্রহণ করেন। কোথাও সে বিশ্বকর্মারও সহকারী। হনুমান শুধু রামায়ণে রামেরই অনুচর নয়—চণ্ডীমঙ্গলে চণ্ডী, মনসামঙ্গলে মনসা, সকলেই তার বিরাট শক্তি ও দাস্যের

সাহায্য গ্রহণ করেন। ধর্মঠাকুরও সর্বদা তাকে কাছে রেখে যে-কোনো দুঃসাধ্য কার্য করেছেন। কিন্তু এইরূপে হনুমানের সাহচর্যে ধর্মঠাকুর নিজ স্বকীয়ত্ব বিসর্জন দিয়ে যেন রামেই পরিণত হয়েছেন। ধর্মদেবতা যখনই হনুমানকে কোনো কঠিন কার্যে নিয়োগ করেছেন, তখনই হনুমানের সকল পূর্বকীর্তি পুনরালোচনার দ্বারা ধর্মমঙ্গল যেন রামায়ণের নবতম সংস্করণে পরিণত হয়েছে। ধর্মমঙ্গলে হনুমানের রামায়ণ-বর্ণিত কীর্তিরই পূর্বানুবৃত্তি দেখা যায়। হনুমানের এই কীর্ত্তির আলোচনায় ঘনরাম, সীতারাম দাস, রামনারায়ণ ও অন্যান্য অনেক ধর্মমঙ্গল-রচয়িতার ভাবলোকের যে-পরিচয় পাওয়া যায়, তাতে তাঁদের রামভক্ত বলেই মনে হয়। ভণিতার অনেকস্থলে ঘনরাম বলেছেন, তিনি 'রামচন্দ্রচরণ-কমল-ভৃঙ্গ', অথবা 'ঘনরাম ভণে যার নাথ রঘুবীর।' সীতারাম ও অন্যান্য সকলে গ্রন্থারম্ভে ধর্মের বন্দনায় রামেরই বন্দনা করেছেন।

৪. সর্বশ্বেতরূপে ধর্ম

ধর্মঠাকুরের সম্বন্ধে একটি লক্ষণীয় তথ্য এই যে, স্থানে-স্থানে তিনি সর্বশ্বেত বলে বর্ণিত এবং তাঁর সঙ্গে সম্পর্কান্বিত সকল বস্তুই শ্বেত। 'ধর্মপূজাবিধান'-এ তিনি কুন্দ ও ইন্দুধবল ; তিনি শ্বেতবস্ত্র, শ্বেতছত্র, শ্বেতমাল্য, শ্বেতসূত্র ও শ্বেতচক্রধারী ; তিনি শ্বেতাশ্বযুত ও শুভ্রকেশ ; তিনি শ্বেতাসন ও শ্বেত-হংসবাহন। শূন্যপুরাণে তিনি শ্বেতধ্বজ বলেও কথিত। ঘনরামের বর্ণনায়, তিনি সর্বযুগে শ্বেতপুষ্পপূজিত ; পশ্চিম-উদয়ে তিনি লোহিতাভরণে সজ্জিত হয়েও শ্বেতছত্র পরিত্যাগ করেন নি। গাজনের খণ্ড-খণ্ড গানগুলিতেও তিনি সর্বশ্বেতরূপে বর্ণিত।

হিন্দুগণের শ্বেতকায় দেবতা শিব ; তিনি রজতগিরি-সন্নিভ। তন্ত্রে তিনি রক্তবিন্দু শক্তির বিপরীত শ্বেতবিন্দু — তুষার-শুভ্র কৈলাস পর্বতে তাঁর আলয়। সরস্বতীও হিন্দুগণের শ্বেতরূপা শ্বেতকমলবাসিনী, শ্বেতহংস-বাহিনী, শ্বেতবসনা দেবী। শ্বেতচন্দন, শ্বেতপুষ্প, শ্বেতশস্য, শ্বেত দধি ও লাজ তাঁর প্রিয় পূজোপচার।

শিব ও সরস্বতীর এই শ্বেতরূপের তাৎপর্য আছে — এটি প্রজ্ঞা ও পবিত্রতার প্রতীক। সম্ভবত, শিবের বিশুদ্ধ-চৈতন্য, বিশুদ্ধ-জ্ঞান ও বিশুদ্ধ-সত্ত্ব-স্বরূপের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই এই শ্বেতরূপ কল্পিত। দেবী সরস্বতী প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী ও প্রতীক। কয়েকটি পুরাণে সরস্বতী আদিদেবী আদ্যাশক্তি বা মহালক্ষ্মীর সত্ত্বগুণের প্রতীক এবং লক্ষ্মী ও মহাকালী যথাক্রমে রজ ও তমের প্রতীক। সাংখ্য-দর্শনে সত্ত্ব শ্বেতবর্ণ, রজ রক্তবর্ণ ও তম কৃষ্ণবর্ণ। এইজন্যই বোধ হয়, সরস্বতীর রূপকল্পনা ও পূজোপচারে শ্বেতবর্ণের ব্যবহার ।

বৌদ্ধশাস্ত্রেও বুদ্ধ বিশুদ্ধ প্রজ্ঞা ও পবিত্রতার প্রতীক — তিনি বিজ্ঞানধাতু বা বিজ্ঞপ্তিমাত্রতা— তিনি প্রকৃতি-প্রভাস্বর বা প্রজ্ঞালোক । ঐতিহাসিক বুদ্ধ সিদ্ধার্থ বা শাক্যসিংহের দেহে একটি আলোকপ্রভা ছিল। তাঁর জন্মের পূর্বে মাতা মায়ার গর্ভে শ্বেতহস্তী-প্রবেশের স্বপ্নের কথা শোনা যায়। বুদ্ধের পরম-স্বরূপ অথবা ভগবত-স্বরূপের এই প্রজ্ঞা ও পবিত্রতার কল্পনা পরবর্তী তান্ত্রিক সম্প্রদায়েও বর্তমান ছিল। সুতরাং এটি একান্ত অসম্ভব নয় যে, ধর্মঠাকুরের রূপ ও পূজোপকরণের মধ্যে শিব ও বুদ্ধের উক্ত শ্বেতরূপের আদর্শ মিশে গেছে ।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

পণ্ডিত, কোটাল ও আমিনীতত্ত্ব

পঞ্চযুগে ধর্মের পঞ্চ পণ্ডিত — সত্যযুগে সেতাই, ত্রেতায় নীলাই, দ্বাপরে কংসাই , কলিতে রামাই ও শূন্য অথবা অনাগতযুগে গোসাঞি । সেতাই শ্বেত, নীলাই নীল, কংসাই পীত, রামাই লোহিত এবং গোসঞি শ্যামকায় । এই পঞ্চ-পণ্ডিত ধর্মের পঞ্চযুগের যাজক। ধর্মপূজাকালে পঞ্চদিকস্থ পঞ্চদ্বারে অবস্থিত এই পঞ্চ পণ্ডিত ও পঞ্চযুগ পরস্পর মিলিত হয়। এখনও পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের গাজনে শিবের গানে বিভিন্ন দ্বারের দিকপালের কল্পনা বর্তমান। পশ্চিমবঙ্গের গানে দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর ও পূর্ব দিকের দেবতা যথাক্রমে জগন্নাথ, একাদশ ভীম, ভানু ও কামরূপের কামাখ্যা । পূর্ববঙ্গে পশ্চিম, দক্ষিণ, পূর্ব ও উত্তরের দেবতা যথাক্রমে জগন্নাথ, বৈদ্যনাথ, শ্রীমুণ্ডচক্রবাহিনী ও শ্রীসভালিঙ্গবাহিনী । আবার কোথাও জগন্নাথ, ক্ষীরনাদীসাগর সূর্যদিবাকর ও হিমালয় দিকপালরূপে কল্পিত ।

পঞ্চদ্বারের এই পঞ্চ পণ্ডিতের পঞ্চ কোটাল বা প্রহরী আছে। পশ্চিমে চন্দ্র, দক্ষিণে হনুমান, পূর্বে সূর্য, উত্তরে গরুড় ও শূন্যে উলূক। তারা দর্শকদের জন্য দ্বার উন্মুক্ত ও রুদ্ধ করে। সূর্য ও চন্দ্রের পূর্ব ও পশ্চিমের সঙ্গে সম্পর্ক সহজবোধ্য। হনুমানের কর্মক্ষেত্র সিংহল — সেজন্য সে দক্ষিণে অবস্থিত। গরুড় ও উলূক যথাক্রমে বিষ্ণু ও. ধর্মের বাহন। রামভক্ত হনুমান যেহেতু দক্ষিণের কোটাল, সেহেতু তারা অবশিষ্ট দুই দ্বারে স্থান পেয়েছে। 'ধর্মপূজাবিধান'-এ পণ্ডিত ও কোটাল-ভিন্ন দ্বারপাল ও তাদের অনুচর-পাত্রের কথাও আছে। চার দ্বারপাল (শূন্যদ্বারপালের কথা অনুল্লিখিত) — ঝর্ঝরী সুন্দর বা মহাকাল পশ্চিমে, জম্ভব বা তীক্ষ্ণদংষ্ট্রা দক্ষিণে, মহাকায় পূর্বে, নন্দীদেব উত্তরে অবস্থিত — পাত্রগণ যথাক্রমে পাড়িদ্বার হনুমান, ডামর্শাঞি ও কামদেব। পঞ্চযুগের পঞ্চপণ্ডিতের আমিনী বা ঘটদাসী নামে পরিচারিকার কল্পনাও আছে।

পঞ্চ পণ্ডিত, কোটাল ও আমিনীতত্ত্ব উত্তরকালের বৌদ্ধগণের পঞ্চতথাগত বা পঞ্চধ্যানীবুদ্ধের লৌকিক অনুকৃতি মাত্র। মহাযান বৌদ্ধধর্মে পঞ্চস্কন্ধ কালক্রমে পঞ্চদেবতায় রূপান্তরিত হয়। 'অদ্বয়-বজ্রসংগ্রহ'-এ দেখা যায়, পঞ্চতথাগতের কল্পনা বজ্রসত্ত্বের ধর্মকায়ের রূপান্তর মাত্র। পঞ্চতথাগত প্রথমে পঞ্চস্কন্ধের এবং তৎপরে ক্ষিতি-অপ্-তেজ-মরুৎ-ব্যোম ও রূপরস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দের দেবতা। পরবর্তী গুহ্য বৌদ্ধসাহিত্যে এদের বোধিসত্ত্ব, মানুষীবুদ্ধ, বাহন, শক্তি, মুদ্রা, কুল, চিহ্ন, বীজমন্ত্র প্রভৃতিও কল্পিত হয়েছে। তারাও আবার পঞ্চভূত, পঞ্চেন্দ্রিয় ও পঞ্চ ইন্দ্রিয়বোধের সহিত সম্পৃক্ত হয়ে মনুষ্যদেহের পঞ্চ কেন্দ্রে স্থান পেয়েছে।

ধর্মপূজকদের পঞ্চপণ্ডিতের কল্পনা বৌদ্ধগণের পঞ্চতথাগতেরই লৌকিক সংস্করণ। এই প্রসঙ্গে মুসলমানগণের পঞ্চপীরের কথাও মনে হয়। কবীরপন্থীগণের মতেও, চারযুগে সৎপুরুষ চার দূত প্রেরণ করেন : সত্যে সৎসুকৃত, ত্রেতায় মুনিন দর্জি, দ্বাপরে করুণাময় ঋষি ও কলিতে কবীর সাহেব।

ইতোপূর্বে হেবজ্রতন্ত্রেও প্রজ্ঞাদেবীর মণ্ডল বা চক্রের চর্তুদ্বারে চারি শক্তির কল্পনা আছে : গৌরী, চৌরী, বেতালী ও ঘাসমরী — উর্ধ্বে খেচরী ও অধে ভূরচী। এরা পঞ্চ ইন্দ্রিয়বোধেরও অধিষ্ঠাত্রী। পঞ্চস্কন্ধের বজ্র, গৌরী, চৌরী, বজ্রযোগিনী ও নৈরাত্মযোগিনীও পঞ্চদিকে অবস্থিত। অতএব বৌদ্ধতন্ত্রেই চতুর্দ্বারের কল্পনা বিদ্যমান। উত্তরদেশীয় গুহ্য বৌদ্ধগণের স্তূপ বা চৈত্যেও প্রধান বুদ্ধ ও চতুর্দ্বারে চারিবুদ্ধের অবস্থান লক্ষিত হয়। পরবর্তিকালের বৌদ্ধ চৈত্যের ভাস্কর্যেও এই পঞ্চবুদ্ধ বর্তমান। গুহ্য সাধনার মণ্ডলেও পঞ্চতথাগত ও তাদের শক্তিগণ অবস্থিত। এই সকল বৌদ্ধ-কল্পনা থেকেই পরবর্তীকালে ধর্মঠাকুরের মন্দিরের পঞ্চদ্বার পঞ্চদিক এবং পঞ্চদিকের পঞ্চ পণ্ডিতের কল্পনার উদ্ভব।

বিভিন্ন দিকপালগণের কল্পনা বৈদিক যুগ হতেই বর্তমান। অথর্ববেদ অনুসারে : পূর্বে অগ্নি, দক্ষিণে ইন্দ্র, পশ্চিমে বরুণ, উত্তরে সোম, ধ্রুবে বিষ্ণু এবং উর্ধ্বে বৃহস্পতি।

বৌদ্ধ পঞ্চতথাগত যেমন পঞ্চভূতের সহিত সম্পৃক্ত, হিন্দুতন্ত্রে তেমনই পঞ্চচক্র (ষট্চক্রের মধ্যে) পঞ্চভূতের প্রতীক : মূলাধার ক্ষিতির, স্বাধিষ্ঠান অপের, মণিপুর অগ্নির, অনাহত মরুতের ও বিশুদ্ধ ব্যোমের। এই পঞ্চচক্রের দেবতা যথাক্রমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশান ও মহাদেব — এঁদের শক্তি যথাক্রমে ডাকিনী, রাকিনী, লাকিনী, কাকিনী ও শাকিনী। এই পঞ্চচক্রের বীজমন্ত্র যথাক্রমে লং, বং, রং, যং, হং। পঞ্চ ধ্যানীবুদ্ধের বীজমন্ত্রও এইরূপ। দেবগণ যথাক্রমে লাল, নীল, ঘনলাল, শ্বেত ও শ্বেত। দেবীগণ যথাক্রমে লাল, ঘননীল, শ্যাম, ধূম্র ও শ্বেত।

বৌদ্ধ ও ধর্মপূজকদের কল্পনায় বর্ণসাদৃশ্যও বর্তমান। তন্ত্রের সঙ্গেও ক্ষীণ সাদৃশ্য আছে। পঞ্চচক্রের পঞ্চভূত যথাক্রমে পীত, শ্বেত, লোহিত, ধূম্র ও লাল। পুরাণে বিভিন্ন যুগে ঈশ্বরের বিভিন্ন বর্ণের কল্পনা বিদ্যমান : সত্যযুগে শ্বেত, ত্রেতায় রক্ত, দ্বাপরে পীত, কলিতে কৃষ্ণ। পালি 'অনাগত বংশ'-এ কেতুমতী-নগরের চতুর্দ্বারে নীল, পীত, রক্ত এ শ্বেত কল্পবৃক্ষের কল্পনা আছে। ছান্দোগ্য উপনিষদের মতে, ঋক্‌বেদ চক্ষুর শ্বেত অংশের বর্ণ, সামবেদ চক্ষু-তারকার বর্ণ। এতেই আবার তেজকে রক্ত, অপ্‌কে শ্বেত ও ক্ষিতিকে কৃষ্ণ বলা হয়েছে।

ধর্মপূজায় বিভিন্ন দ্বারের পণ্ডিতের বর্ণ-অনুসারে পূজোপকরণ ব্যবহৃত হয়। আবার পশ্চিমদ্বারের সত্য বা স্বর্ণযুগের দেবতা স্বর্ণধাতু। দক্ষিণদ্বারের রৌপ্যযুগের দেবতা রৌপ্যধাতু, পূর্বদ্বারের তাম্রযুগের দেবতা তাম্রধাতু, উত্তরদ্বারের লৌহযুগের দেবতা লৌহপ্রস্তরধাতু ও পঞ্চদ্বারের শূন্য বা অনাগতযুগের দেবতার পূজায় মাণিক্যের ব্যবহার দেখা যায়।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভাষা-সাহিত্যে সৃষ্টিতত্ত্ব

১. তত্ত্বগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয়

ভারতের প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভাষাসাহিত্যে সৃষ্টিতত্ত্বের অসংখ্য বর্ণনা পাওয়া যায় এবং তাদের মধ্যে মূলগত সাদৃশ্যও রয়েছে। এখানে ভারতীয় দর্শন, ইতিবৃত্ত ও উপকথার বিচিত্র ভাবধারার বেণীবন্ধন ঘটেছে। ভাষাসাহিত্যের অন্যান্য স্থানের বর্ণনা অপেক্ষা বাঙলার ধর্মপূজকদের সাহিত্যের সৃষ্টিতত্ত্বই বিশদ ও বিস্তৃত -- অন্যান্য সাহিত্যের সঙ্গে তার সাদৃশ্যও আছে।

শূন্যপুরাণে সৃষ্টিতত্ত্বের বর্ণনা এইরূপ : আদিতে চন্দ্রসূর্য, দিবসরাত্রি, জলস্থল, আকাশ পর্বত, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, স্থাবর-জঙ্গম কিছুই ছিল না। সেই সর্বব্যাপ্ত নিরন্ধ্র অন্ধকারের মধ্যে একা শূন্যাশ্রয়ী প্রভু অনন্তশূন্যে সঞ্চরণ করতেন। এই একাকিত্বের মধ্যে তাঁর সিসৃক্ষা থেকে যথাক্রমে প্রাণবায়ু শ্বাস-প্রশ্বাস, কারুণ্য ও মায়া-প্রপঞ্চের উদ্ভব হয়। তৎপরে উদ্ভূত এক জলবিম্বের উপর তিনি উপবেশন করেন। কিন্তু তা বিদীর্ণ হলে পুনরায় শূন্যাশ্রয় করেন। তাঁর কারুণ্য হতে হস্তপদহীন ধর্ম বা নিরঞ্জনের উদ্ভব হয় — কারুণ্য আশ্রয় করে তিনি চতুর্দশযুগ ধ্যান করেন। তাঁর প্রশ্বাস হতে উল্লুকের উৎপত্তি হলে তার পৃষ্ঠে আরোহণ করে পুনরায় চতুর্দশ যুগ তপস্যা করেন। উলূক অত্যন্ত ক্ষুধার্ত হলে তিনি মুখ থেকে কিছু তরল পদার্থ উদ্‌গীরণ করেন — তার কিয়দংশ শূন্যে পতিত হয়ে জলাশয়ের সৃষ্টি করলে তিনি উলূকের পৃষ্ঠে আরোহণ করে তাতে ভাসমান হন। উলূকের স্খলিত পক্ষ থেকে এক হংসের উদ্ভব হলে, তিনি তার উপরে উঠেও কয়েক যুগ তপস্যা করেন। তৎপর সেও পরিশ্রান্ত হলে ধর্মের পদ্মহস্তের স্পর্শে সলিলপৃষ্ঠে যে- কূর্মের উৎপত্তি হয়, তার উপরেও অনেক যুগ তিনি তপস্যা করেন। কিন্তু সেও পরিশ্রান্ত হলে উল্লুকের পরামর্শে নিজ স্বর্ণময় যজ্ঞসূত্র সলিলে নিক্ষেপ করে সহস্রশির বাসুকির সৃষ্টি করেন। তার মস্তকে নখরাগ্রের মৃত্তিকা স্থাপন করে তিনি মেদিনীর সৃষ্টি করেন। তৎপরে উল্লুকপৃষ্ঠে তিনি মেদিনীদর্শনে বর্হিগত হলে, তাঁর দ্রুতগতির সহিত মেদিনী বর্ধিত হয়। এইরূপে পরিশ্রান্ত ধর্মের স্বেদ থেকে আদ্যশক্তির উৎপত্তি হয়। তাঁকে স্বরচিত একটি গৃহে রেখে তিনি বল্লুকানদীর সৃষ্টি করে সেখানেও চতুর্দশযুগ তপস্যা করেন। ইতিমধ্যে দেবী আদ্যা যৌবনবতী হয়ে কামদেবকে ধর্মের নিকট প্রেরণ করেন। কামদেব তপোমগ্ন ধর্মের প্রতি শরসন্ধানে উদ্যত হলে তিনি একটি মৃৎপাত্রে তাঁকে আবদ্ধ করেন — তাতে কাম গরলে পরিণত হন। কিয়ৎকাল পরে অসহ যৌবনভারে আত্মহত্যার উদ্দেশ্যে আদ্যা বিষপান করলে তাঁর গর্ভ-লক্ষণ প্রকাশ পায়। তাঁর গর্ভে জন্মান্ধ ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবের জন্ম হয়। তাঁরা তৎক্ষণাৎ তপস্যায় বর্হিগত হলে ধর্ম তাঁদের পরীক্ষা-মানসে ভাসমান শবরূপে তাঁদের নিকট উপস্থিত হন। একমাত্র শিবই তাঁকে চিনতে পেরে ধর্মের নিকট থেকে ত্রিনয়ন লাভ করেন এবং শিবের

অনুরোধে অপর দুইজনও দৃষ্টিশক্তি লাভ করেন। ধর্মের আদেশে শিব সৃষ্টিরক্ষার উদ্দেশ্যে আদ্যাকে পত্নিত্বে গ্রহণ করেন। তৎপরে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবের উপর সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারের ভার অর্পণ করে পুনরায় ধর্ম উল্লুক-পৃষ্ঠে আরোহণ করেন।

· ধর্মপূজাবিধানের সৃষ্টি-তত্ত্বও শূন্যপুরাণের অনুরূপ। কিন্তু এখানে নিরাকার প্রভুর মধ্য হতে ধর্ম-নিরঞ্জন উদ্ভূত হয়ে তাঁর (ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব--এই ত্রিমূর্তির প্রতীক) সত্ত্ব-রজ-তম —এই ত্রিগুণের সাহায্যে বিশ্বসৃষ্টিতে নিয়োজিত।

ধর্মমঙ্গল-সাহিত্যের সৃষ্টিতত্ত্বও প্রায় শূন্যপুরাণের অনুরূপ। সহদেব চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গলে শূন্যপুরাণের অবিকল অনুকৃতি। সীতারাম দাসের ধর্মমঙ্গলে ব্যতিক্রম এই যে, বিশ্বসৃষ্টির পরে ধর্ম নিজেই নারীরূপ গ্রহণ করে নিজেব সঙ্গে মিলিত হয়ে ত্রিগুণাত্মক ত্রয়ী দেবতার জন্ম দান করেন।

রামদাস আদকের অনাদিমঙ্গলে দেখা যায় : ধর্মের বামাঙ্গ থেকে মহামায়া বা আদ্যাশক্তির জন্ম। আদ্যার যৌবনাগমে ধর্ম তাঁকে নিজ পত্নীত্ব গ্রহণ করতে বাধ্য করেন। তৎপরে ত্রিদেবতার জন্ম ও তাঁদের পরীক্ষা—শিবের কৃতকার্যতা ও সৃষ্টি কার্যে নিয়োগের কাহিনী। শিব তমোগুণের আধিক্যে যক্ষ-রক্ষ-ভূত-জিন-দৈত্যের সৃষ্টি করতে থাকলে প্রভু ব্রহ্মার উপর সৃষ্টির ভার অর্পণ করেন। তৎপরে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার জন্মতত্ত্ব, মনু-দিতি-অদিতির কাহিনী পুরাণের অনুরূপ।

ঘনরামের বর্ণনা এইরূপ : অনাদি অন্ধকারের মধ্যে নিরাকার-প্রভু সৃষ্টি-সম্ভাবনায় এক মূর্তিতে রূপান্তরিত হয়ে সৃষ্টির ইচ্ছা করে নারীরূপিণী প্রকৃতির সৃষ্টি করেন । প্রকৃতিকে দেখে তাঁর চিত্তচাঞ্চল্যের ফলে প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা হলে ত্রিদেবতার জন্ম হয়। তৎপরে তাঁদের পরীক্ষা, শিবের কৃতকার্যতা, সৃষ্টির কর্তৃত্বলাভ, তাঁর অপসৃষ্টি ও ব্রহ্মার কর্তৃত্বলাভ প্রভৃতি রামদাসের অনুরূপ। তৎপরে প্রজাপতি ব্রহ্মা হতে প্রথমে অহংকাব ও তৎপরে যথাক্রমে পঞ্চভূত ও সনকাদি পুত্রের জন্ম হয়।

মানিক গাঙ্গুলির বর্ণনায়, শক্তির সহিত নিরঞ্জনের মিলনে ত্রিগুণাত্মক ত্রিমূর্তির জন্ম— ত্রিদেবতার জন্য শক্তির ত্রিদেবীতে রূপান্তর, ধর্মের পরীক্ষায় তিনজনেরই কৃতকার্যতা এবং নিজ-নিজ শক্তি-সাহচর্যে যথাক্রমে সৃষ্টি-স্থিতি ও সংহারের কর্তৃত্বলাভ বর্ণিত হয়েছে।

নরসিংহ বসুর ধর্মায়নে ধর্মের মধ্য হতে প্রকৃতির উদ্ভব, উভয়ের মিলন, পুত্র মর্হতের জন্ম ও তাঁর মধ্য হতে ত্রিগুণাত্মক ত্রি-অহংকার এবং ত্রি-অহংকার হতে ত্রিমূর্তির জন্ম-প্রভৃতি সাংখ্য দর্শনের অনুরূপ। তৎপরে ত্রিমূর্তির পরীক্ষা, শিবের কৃতকার্যতা ও সৃষ্টিকার্যে নিয়োগ অন্যান্য স্থানের মত হলেও অনন্তনাগের উপর শিবের মায়ানিদ্রা, তাঁর নাভিপদ্ম হতে ব্রহ্মার আবির্ভাব এবং ব্রহ্মার সৃষ্টির আকাঙক্ষা হতে সনকাদি চার মানসপুত্রের জন্ম ও মনু-দিতি-অদিতির কথা পৌরাণিক সাহিত্যের অনুরূপ।

পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের গাজনের গানেও সৃষ্টিতত্ত্ব এইরূপ। হরিদাস পালিত-সম্পাদিত 'আদ্যের গম্ভীরা'র গানগুলিতে দেখা যায় : আদিতে সলিলে ভাসমান নিরাকার গোসাঞির আদেশে এক কর্কট-কর্তৃক জলতল থেকে মেদিনী আনীত হয়। কোথাও-কোথাও এই মৃত্তিকায় সৃজিত মেদিনী কূর্মপৃষ্ঠে স্থাপিত হয়। কোথাও উক্ত মৃৎকণা থেকে ডিম্বের উৎপত্তি ও তা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে অর্ধক্ষিতি-অর্ধাকাশে রূপান্তর ও ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবের সৃষ্টিতে নিয়োগের কাহিনী দেখা যায়। পূর্ববঙ্গেও চৈত্রমাসে নীলপূজার গানগুলিতে কোথাও প্রভুর স্বেদ থেকে ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি, কোথাও নারীর উদ্ভব ও প্রভুর চিত্ত-বৈকল্য বর্ণিত হয়েছে। নীলপূজায় শিবের বাজার-সন্ন্যাসের

গানগুলি এইরূপ : শূন্যতা একটি বাজার — সেখানে সন্ন্যাসী-তপস্বী-ঋষি-ব্রহ্মাণ্ড কিছুই ছিল না। শূন্যতায় ভাসমান শূন্যশরীর শিব গাত্রক্লেদ থেকে বিশ্ব-সৃষ্টি করেন।

চণ্ডীমঙ্গল-সাহিত্যের সৃষ্টিতত্ত্বও এইরূপ। চতুর্দশ শতক অথবা তৎপূর্বে রচিত মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গলে শূন্যপুরাণেরই প্রতিধ্বনি। ষোড়শ শতকের মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গলের বর্ণনা এইরূপ : শূন্যতায় আদিদেবের ইচ্ছা থেকে প্রকৃতি বা আদিদেবীর উদ্ভব ও আদিদেবীর মধ্যে স্বীয় শক্তি সঞ্চারিত করলে মহান বা মহতের জন্ম হয়। মহতের পুত্র অহংকার ও অহংকার হতে পঞ্চভূতের উৎপত্তি। তৎপরে আদিদেবের ত্রিগুণাত্মক ত্রিমূর্তিতে রূপান্তর, ব্রহ্মার চার মানসপুত্রের জন্ম, তাঁদের তপস্যায় গমন, ব্রহ্মার রোষ থেকে রুদ্রের জন্ম ও সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তাঁকে ছয় সঙ্গিনী দান, রুদ্রের উদ্ভট সৃষ্টি, ব্রহ্মার নিবারণ — সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ব্রহ্মার নিজ দেহ দ্বিধাবিভক্ত করণ ও একাংশে স্বয়ম্ভুব মনুর সৃষ্টি ও সৃষ্টির কর্তৃত্ব দান ; মনু-কর্তৃক স্থান প্রার্থনা, ব্রহ্মার নাসারন্ধ্র হতে বরাহের বহির্গমন, বরাহ-কর্তৃক পাতাল হতে পৃথিবী আনয়ন প্রভৃতি বর্ণনা অনেকাংশে পুরাণের অনুরূপ। মাধবাচার্যের চণ্ডীমঙ্গলে প্রভুর প্রশ্বাস থেকে দেবীর এবং নাভিপদ্ম থেকে ব্রহ্মার জন্ম, সৃষ্টির উদ্দেশ্যে শিবকে দেবী-দান প্রভৃতি বর্ণিত হয়েছে। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল ও জীবন মৈত্রের বিষহরি পদ্মাপুরাণের বর্ণনাও এইরূপ।

বাঙলার নাথসাহিত্যেও অনুরূপ সৃষ্টিতত্ত্বের কল্পনা। অনাদিপুরাণ, অনাদিচরিত্র, হাড়মালগ্রন্থ, যোগিতন্ত্রকাল-প্রভৃতির সৃষ্টিতত্ত্বে দেখা যায়, অলেকনাথ অথবা নিরঞ্জন গোসাঞি অনাদিধর্মনাথের সৃষ্টি করেন ; তিনি নিরঞ্জনের সুখ-সলিলে ভাসমান হন। তৎপরে নিরঞ্জন-কর্তৃক আদিদেবী বা কাকেতুকার সৃষ্টি, ধর্মের সহিত তাঁকে সৃষ্টি-কার্যে নিয়োগ, বাসুকির জন্ম, তাকে পাতালে প্রেরণ ও মস্তকে পৃথিবী স্থাপন, ধর্মের মণিবন্ধ থেকে ত্রিমূর্তির উদ্ভব ও তাঁদের পরীক্ষার কাহিনী।

গোরক্ষবিজয়ের সৃষ্টিতত্ত্বের অধিকাংশও উক্তরূপ। আদিতে করতার-ভিন্ন অন্য-কিছু ছিল না। করতারের আত্মজ্ঞান ও অবয়ব বিকাশ লাভ করলে তাঁর সৃষ্টির ইচ্ছা থেকে ধর্ম-নিরঞ্জনের উদ্ভব হয়। নিদ্রা থেকে জাগরিত হয়ে পার্শ্বে ছায়ারূপিণী আদ্যাকে দেখে তিনি বলপূর্বক তাঁর সঙ্গে মিলিত হলে সূর্যচন্দ্র-পৃথিবী-তারকার উৎপত্তি হয়। তাঁর হুংকার থেকে ব্রহ্মার, মুখ থেকে বিষ্ণুর, আদি-অনাদির পরস্পর আকর্ষণ থেকে স্বেদ, আত্মা, অহংকার এবং স্বেদ হতে পৃথিবী ও সলিলের উদ্ভব হয়। অনাদ্যের শরীরের বিভিন্ন অংশ হতে শিব, জগন্মাতা গৌরী ও সিদ্ধগণের উদ্ভব হয়। সিদ্ধগণ ও শিবের মধ্যে একা শিবই গৌরীকে গ্রহণ করতে ইচ্ছুক হলে তাঁকেই ধর্ম গৌরীদান করেন। হরগৌরী সিদ্ধগণসহ মর্তে অবতরণ করেন। অনাদ্য আদ্যার নিকট বলছেন : পরমতত্ত্বরূপে নিত্য অক্ষরস্বরূপে তিনি বীজের মধ্যে বৃক্ষ ও বৃক্ষের মধ্যে বীজের ন্যায় সর্বত্র বর্তমান আছেন। শুকুর মহম্মদের গোপীচাঁদের সন্ন্যাসেও এইরূপ সৃষ্টিতত্ত্বের বর্ণনা আছে।

কয়েকটি বৈষ্ণব সহজিয়া গ্রন্থেও অনুরূপ সৃষ্টিতত্ত্বের সঙ্গে বৈষ্ণব তত্ত্ব ও দর্শনের উদ্ভট মিশ্রণ দেখা যায়। আরও বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, দোম-আন্তোনিওর ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক-সম্বাদে জনৈক গোঁড়া ব্রাহ্মণ ও পর্তুগীজ খ্রীষ্টান মিশনারীর কথোপকথনেও ধর্মমঙ্গল-চণ্ডীমঙ্গল ও নাথ-সাহিত্যের সৃষ্টিতত্ত্বের প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। এ থেকেই অনুমিত হবে যে, এইরূপ সৃষ্টিতত্ত্বের কল্পনা কোন স্থান ও সম্প্রদায়-বিশেষের বস্তু নয়, স্থূল লোককল্পনার এক সাধারণ বস্তু।

ভারতেব অন্যান্য প্রদেশের সাহিত্যেও বাঙলা সাহিত্যের অনুরূপ সৃষ্টিতত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। ষোড়শ শতকের উড়িষ্যার বৈষ্ণব সাহিত্যের সৃষ্টিতত্ত্ব ধর্মমঙ্গলের অনুরূপ। হিন্দি সাহিত্যের সন্ত কবিদের বর্ণনাতেও আদিশূন্যতার মধ্যে পরম পুরুষের একৈক অবস্থিতির কল্পনা বর্তমান। কবীরের রচনায় সৃষ্টির পূর্বে একা সমরসের অস্তিত্ব, তাঁর আত্মজ্ঞান লাভ ও সৃষ্টির ইচ্ছা, ছয়ব্রহ্মার সৃষ্টি ; সৃষ্টিতে তাঁদের অকৃতকার্যতায় নিরঞ্জনের এবং তাঁর বীজখেত প্রার্থনায় মায়ার সৃষ্টি ; অনিচ্ছুক মায়ার সহিত নিরঞ্জনের মিলনে ত্রিগুণাত্মক ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের জন্ম বর্ণিত হয়েছে। দাদুর মতেও : নিরঞ্জন জলস্থল, স্থাবর-জঙ্গম, আকাশ-পৃথিবী, সূর্যচন্দ্র, দিবারাত্রি ও ক্ষুধাতৃষ্ণার অতীত। সুন্দরদাসও এইরূপ বর্ণনা করেছেন : নিরঞ্জন নিজের মধ্য হতে ভূতসমূহের পঞ্চতত্ত্ব, ত্রিগুণ এবং রজ হতে ব্রহ্মা, সত্ত্ব হতে বিষ্ণু ও তম হতে শঙ্করের সৃষ্টি করেন। তাঁরা যথাক্রমে ব্রহ্মাণী ঠাকুরানী ও ভবানীর সহিত সত্যলোক, বিকুণ্ঠ ও কৈলাসে বাস করেন। তুলসীদাসও এইরূপে সৃষ্টিতত্ত্বের বর্ণনা করেছেন।

২. ভাষাসাহিত্যের সৃষ্টিতত্ত্ব-কল্পনার বিশ্লেষণ

অনেক পণ্ডিতের মতে, এই সৃষ্টিতত্ত্ব বৌদ্ধ-কল্পনা-সঞ্জাত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের কোন সুস্পষ্ট চেহারা নেই—তারা বেদ, উপনিষদ, সাংখ্যদর্শন, পৌরাণিক সাহিত্য, হিন্দুতন্ত্র ও বৌদ্ধতন্ত্র-বর্ণিত মহাযান বৌদ্ধ-কল্পনার এক লৌকিক সংমিশ্রণ। তবু তাদের কোন গোষ্ঠীভুক্ত করতে হলে মূলত হিন্দুই বলতে হয়—বৌদ্ধ উপাদানও তার মধ্যে হিন্দুপ্রকৃতি লাভ করেছে।

[ক] আদি-শূন্যতা ॥ ভাষাসাহিত্যের সৃষ্টিতত্ত্বে সর্বত্রই অনাদি অন্ধকারে পরম শূন্যে একৈক নিরাকার পুরুষের কল্পনা দেখা যায়। ঋগ্বেদেই এইরূপ বর্ণনা কাছে (১০.১২৯.১৩) : সৎ-অসৎ, স্বর্গমর্ত কিছুই ছিল না—অতল সলিলে সকলে ভাসমান ছিল ; মৃত্যু ও অমৃতত্ব, দিবারাত্রি ছিল না ; গভীর অন্ধকারে দুর্নিরীক্ষ্য সেই অদ্বিতীয় পুরুষ নিবাত-নিঃশ্বাস গ্রহণ করতেন ; তাঁর তপের প্রভাবে একের উদ্ভব। উপনিষদেও একই ভাবের প্রতিধ্বনি। শ্বেতাশ্বেতরোপনিষদে উক্ত হয়েছে : রাত্রি-দিবা-অন্ধকার সৎ-অসৎ যখন কিছুই ছিল না, ছিলেন শুধু পরম অক্ষর কেবল পুরুষ — তাঁর প্রজ্ঞা হতে সৃষ্টি উদ্ভূত হয়। তৈত্তিরীয়োপনিষদের মতেও, অসৎ হতে সৎ এবং সৎ হতে স্বস্বরূপের স্বপ্রকাশ। ঐতরেয় উপনিষদে বলা হয়েছে : আদিতে আত্মা কেবল নিজেকে নিজে নিরীক্ষণ করছিলেন ; সৎ হতে অসৎ, অসতের বহু হবার ইচ্ছায় তেজ, তেজ থেকে অপ, অপ থেকে অন্নের উৎপত্তি। বৃহদারণ্যক উপনিষদের মতে : আদিতে কেবল ব্রহ্ম ছিলেন, ব্রহ্ম থেকে দেবতাগণ ও ব্রহ্মাণ্ডের উদ্ভব। আবার অনাদিসলিল থেকে সত্য, সত্য থেকে ব্রহ্ম, ব্রহ্ম থেকে প্রজাপতি, প্রজাপতি থেকে দেবতাগণের জন্ম কল্পিত হয়েছে। কোথাও অনাদি-সলিলে পদ্মপত্রে প্রজাপতির জন্ম, এবং তাঁর সৃষ্টির ইচ্ছা হতে ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি বর্ণিত হয়েছে। অনাদি-সলিলের কল্পনা বৈদিক যুগের — পৌরাণিক সাহিত্যেও তা সুপরিচিত। পুরাণের মতে, অনাদি সলিলে ভাসমান ছিলেন বলেই পরমপুরুষের নাম নারায়ণ। পরবর্তীকালের বৈষ্ণব সাহিত্যের মতে, তিনি যে-পয়োধিজলে শয়ান ছিলেন, তাই কারণবারি। মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গলের বর্ণনায়, অনাদি সলিলে পদ্মপত্র আশ্রয় করে প্রভু ভাসমান ছিলেন। শুক্লযজুর্বেদেও দেখা যায় : প্রজাপতি অনাদি সলিলে বায়ুরূপে পদ্মপত্র আশ্রয় করে আন্দোলিত হচ্ছিলেন। এই বর্ণনার সঙ্গে মঙ্গলকাব্য-সমূহের সৃষ্টিতত্ত্বের সাদৃশ্য রয়েছে।

(খ) নিরঞ্জনের কল্পনা : প্রজাপতি ব্রহ্মা ॥ ভাষাসাহিত্যের সৃষ্টিতত্ত্বে তৎপরে দেখা যায়, পরমপুরুষ পরমস্বরূপে এই ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা নন। তাঁর সৃষ্ট ধর্ম বা নিরঞ্জন থেকেই সৃষ্টির উদ্ভব। এতে ভাষাসাহিত্যের সকল কবিই একমত। এর মূলেও বেদ ও উপনিষদের প্রভাব রয়েছে। নির্গুণ, নির্বিকল্প পরমপুরুষ সাকার-নিরাকার সদসৎ কিছুই নন, প্রজাপতি ব্রহ্মা অথবা বিশ্বকর্মাই সৃষ্টির হেতুভূত। প্রজাপতি বা ব্রহ্মা কোথাও-কোথাও দেবদেব অথবা পরমদেবরূপে বন্দিত হলেও, কোথাও তিনি পরমব্রহ্ম নন। বৈদিক সাহিত্যে দেবতা ও ভূতসমূহের পশ্চাতে সর্বশক্তির মূলীভূত হিরণ্যগর্ভের কল্পনা রয়েছে। ঋগ্বেদে (১০.১২১) আদিতে হিরণ্যগর্ভ ও তৎপরে দেবতা ও জীবগণের উৎপত্তি বর্ণিত হয়েছে। ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদসমূহে দেবতা ও জীবগণের পূর্বে ব্রহ্মার (কোথাও হিরণ্যগর্ভ) সৃষ্টির উল্লেখ আছে। ব্রাহ্মণ ও উপনিষদে সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রজাপতি ব্রহ্মাকে তপোনিরত দেখা যায়। ব্রহ্মাকেও হিরণ্যগর্ভ বলার কারণ সম্ভবত এই যে, আদিদেব-কর্তৃক সলিল-নিষিক্ত বীজ থেকে উৎপন্ন স্বর্ণডিম্বে তাঁর উৎপত্তি। শতপথ ব্রাহ্মণেও স্বর্ণডিম্ব হতে ব্রহ্মার উৎপত্তি বর্ণিত হয়েছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে, অসৎ হতে সৎ, সৎ হতে ডিম্ব ও তার অর্ধাংশে ঊর্ধ্ব ও অর্ধাংশে অধোদেশ সৃষ্টির কাহিনী আছে। মনুসংহিতাতেও হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মার এইরূপ কাহিনী ও সাংখ্যের অনুরূপ সৃষ্টিতত্ত্বের বর্ণনা আছে। অতএব দেখা যায়, ভাষাসাহিত্যের সৃষ্টিতত্ত্বে নিরঞ্জনের যে-পরিচয় পাওয়া যায়, তা প্রজাপতি ব্রহ্মার লৌকিক সংস্করণ মাত্র। এই প্রসঙ্গে বেদান্তের মায়াতীত ব্রহ্ম ও মায়াধীন ঈশ্বরের পার্থক্যও স্মরণীয়।

[গ] আদি-দেবী ॥ পরবর্তী লক্ষণীয় বিষয় এই যে, পরমপুরুষের সৃষ্টিশক্তিস্বরূপ নিরঞ্জনের সৃষ্টির ইচ্ছা হতে আদ্যা আদ্যাশক্তি, প্রকৃতি বা আদিদেবীর উদ্ভব। বৃহদারণ্যক উপনিষদেই দেখা যায় : আদিতে ছিলেন আত্মন্ — তাঁর আত্মচেতনা হতে অহংকারের উদ্ভব ; তিনি ভোগের জন্য নিজেকে দ্বিধাবিভক্ত করে নরনারীরূপে সৃষ্টির সূচনা করেন। উপনিষদে ব্রহ্মের এই দুইরূপের কল্পনা অনেক প্রকার। বৃহদারণ্যকেই মনকে আত্মা, বাক্যকে জায়া এবং প্রাণকে জাতক বলা হয়েছে। প্রশ্নোপনিষদে দেখা যায় : প্রজাপতি তপের প্রভাবে প্রাণরূপ সূর্য ও বস্তুরূপ চন্দ্র সৃষ্টি করেন।

সৃষ্টিতত্ত্বে শক্তির কল্পনা উপনিষদের যুগ হতে দেখা গেলেও, পৌরাণিক সাহিত্য ও ভাষাসাহিত্যের শক্তির কল্পনা অধিকাংশ সাংখ্য-প্রভাবিত। সাংখ্য পুরুষ-প্রকৃতির দার্শনিক বিশ্লেষণ ছেড়ে দিলে, চৈতন্যময় পুরুষের সান্নিধ্যে প্রকৃতি থেকেই সৃষ্টির উদ্ভব। প্রকৃতির সত্ত্ব, রজ, তম — এই ত্রিগুণের চাঞ্চল্যে যথাক্রমে মহৎ, মহৎ হতে অহংকার, অহংকার হতে একাদশবোধ ও পঞ্চতন্মাত্র এবং পঞ্চতন্মাত্র হতে পঞ্চভূতের সৃষ্টি। পুরুষের সান্নিধ্যে ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির মধ্য থেকে ভূতজগতের সৃষ্টি — এই লোকবিশ্বাসে নরনারীর কল্পনায় পরিণত।

ভারতের সর্বজনপ্রিয় দার্শনিক ধর্মগ্রন্থ গীতার সৃষ্টিতত্ত্বও সাংখ্যের অনুরূপ। নির্গুণ পুরুষোত্তম সগুণ ভগবানরূপে প্রকৃতির সাহায্যে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন। গীতায় পুরুষ ও প্রকৃতি ক্ষেত্রজ্ঞ ও ক্ষেত্র নামে অভিহিত। শৈব, বৈষ্ণব ও তন্ত্রসাহিত্যের সৃষ্টিতত্ত্বেও দেবদেবীর কল্পনা বর্তমান।

পুরাণের সৃষ্টিতত্ত্বে উপনিষদ ও সাংখ্যমতের অদ্ভুত মিশ্রণ দেখা যায়। পঞ্চভূতের উৎপত্তি পর্যন্ত সাংখ্যমত ও তৎপরে প্রজাসৃষ্টির ক্ষেত্রে মনুসংহিতার আদর্শ গৃহীত হয়েছে। কোথাও-কোথাও তন্ত্রের প্রভাবও আছে।

ভাষাসাহিত্যে সাংখ্য পুরুষ-প্রকৃতির আদর্শ এসেছে পুরাণের মাধ্যমে পরিবর্তিত

আকারে। নিরঞ্জন, ধর্ম অথবা আদিদেবের স্বেদ থেকে অথবা হাস্য থেকে আদিদেবীর জন্ম। সাংখ্যমতে প্রকৃতির ত্রিগুণের চাঞ্চল্যে সৃষ্টির উদ্ভব ; ভাষা-সাহিত্যে আদিদেবীর ত্রিগুণাত্মক পুত্র ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবের উপর সৃষ্টি-কার্যের ভার ন্যস্ত হতে দেখা যায়। কোনো-কোনো ধর্মমঙ্গল অথবা চণ্ডীমঙ্গলে নিরঞ্জনের ঔরসে প্রকৃতির গর্ভে মহৎ, অহংকার-প্রভৃতির জন্মবৃত্তান্ত অবিকল সাংখ্যের অনুরূপ।

পূর্বে দেখা গেছে, আদিদেবী আদিদেব হতে উদ্ভূত। ভাষাসাহিত্যে কোথাও-কোথাও আদিদেব ও আদিদেবী আদি ও অনাদি বলে কথিত। আদিদেবী হতে সৃষ্টির উদ্ভব— আদিদেবীর জন্মের পরে আদিদেব তপস্যায় গমন করেন। ভাষাসাহিত্যের এই কাহিনী সাংখ্য-কল্পনা অপেক্ষা শৈব ও শক্ত আদর্শের অনুসারী।

তন্ত্র, শৈব ও শাক্ত সাহিত্যে আদিদেব-আদিদেবী অথবা শিব-শক্তি দুইটি পৃথক তত্ত্ব নন। তাঁরা একই পরমতত্ত্বের দুইরূপ — সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয়, সগুণ ও নির্গুণ, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি। পরমস্বরূপে তাঁরা অদ্বৈতরূপে বিরাজিত — তন্ত্রমতে এই রূপই মৈথুন বা কামকলা। 'কামকলা বিলাসে' এজন্য শিব বা মহেশকে 'অন্তর্লীন-বিমর্ষ প্রকাশমাত্র-তনু' এবং শক্তিকে 'ভাবিচরাচরবীজম্ ক্রিয়া-শক্তি' বলা হয়েছে। শক্তির মধ্যেই শিবের আত্মোপলব্ধি — তাই শক্তি নির্মল মুকুরের সহিত উপমিত। দার্শনিক দিক থেকে ক্রিয়ারূপ পরিগ্রহ না করলে বিদেহ-কল্পনার আত্মদর্শন ঘটে না। শিব নিজের মধ্যে নিজে প্রত্যাবৃত হলে অহংকার বা মৈথুন পিণ্ড বলে। শিব সিতবিন্দু ও শক্তি সোনবিন্দু — আমিত্ব বা অহংকার তাদের সন্তান। ভূতজগতের মূলে অঙ্গাঙ্গী-সম্পৃক্ত দুইটি সত্তা রয়েছে, বস্তু ও শক্তি — একের পক্ষে অন্যে অপরিহার্য। শক্তিহীন শিব শবমাত্র। শিব ও শক্তি পরমতত্ত্বের দুইরূপই হন অথবা শক্তি শিব-নিহিত ভাবিচরাচরবীজই হন — তিনিই ক্রিয়াশক্তি অথবা বেদান্তের মায়ারূপে সর্বসৃষ্টির কারণ। পুরাণ ও তন্ত্রের শিবের মধ্য হতে নারীরূপা শক্তির উদ্ভবের কল্পনা ভাষাসাহিত্যে গৃহীত হয়েছে। ঋগ্বেদে পিতার পুত্রীতে উপগমন-কাহিনী (সায়ন যাকে প্রজাপতির উষার সহিত মিলন বলেছেন) আছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, তাণ্ড-মহাব্রাহ্মণ ও শতপথ ব্রাহ্মণেও এইরূপ কাহিনী আছে ।

সাংখ্যের ত্রিগুণাত্মিকা-প্রকৃতি তন্ত্রের ত্রিগুণাত্মিকা শক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে । শক্তির ৬ান সৃষ্টি-স্থিতি-পালন-কর্তা ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব যথাক্রমে সত্ত্ব-রজ-তমাশ্রিত। মহাভাগবত অনুসারে : আদিতে পরমতত্ত্বরূপে ছিলেন শুধু নিরাকাব প্রকৃতি । সৃষ্টির ইচ্ছায় কায়ারূপ গ্রহণ ও নিজ ত্রিগুণের সাহায্যে পুরুষের সৃষ্টি করে তিনি তাঁতে ক্রিয়াশক্তি সঞ্চারিত করেন— এতে পুরুষ ত্রিগুণাত্মক ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবের সৃষ্টিতে সক্ষম হন। তন্ত্রানুসারে, আদিশক্তি হতে ত্রিশক্তির উদ্ভব ও সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ত্রিদেবতার সহিত নিয়োজিত। শৈব ও শাক্ত তন্ত্রে আদিশক্তি ইচ্ছা জ্ঞান ও ক্রিয়াময়ী। গোরক্ষসংহিতায় এই ত্রিশক্তি গৌরী, ব্রহ্মাণী ও বৈষ্ণবী এবং তাঁরাই প্রণবের অ, উ, ম। ত্রিদেবতার তপস্যা ও দেবীকে শিবের পত্নীরূপে লাভ মহাভাগবতেও বর্ণিত হয়েছে। ভাষাসাহিত্যেও এই সকল কাহিনী অল্প-বিস্তর পরিবর্তিত আকারে এসেছে। আদিদেব অথবা আদিদেবীর ত্রিদেবতার পরীক্ষার জন্য শবরূপ-গ্রহণের কাহিনী বৃহৎধর্মপুরাণে পাওয়া যায়। কিন্তু অনেকে মনে করেন, এটি ভাষাসাহিত্যের নিজস্ব এবং ভাষাসাহিত্য হতেই বৃহদ্ধর্মপুরাণে এই কাহিনী গৃহীত হয়েছে।

৩. ভাষাসাহিত্যের সৃষ্টিতত্ত্বে বৌদ্ধ উপাদান

অতএব দেখা যাচ্ছে, ভাষাসাহিত্যের সৃষ্টিতত্ত্ব হিন্দুদর্শন, ধর্মতত্ত্ব, উপকথা ও জনশ্রুতির উপরেই প্রতিষ্ঠিত। বৌদ্ধ প্রভাব যেটুকু আছে সে-সম্বন্ধে মনে রাখতে হবে যে, বৌদ্ধতন্ত্র ও নেপালী বৌদ্ধগণের মধ্যে যে-সৃষ্টিতত্ত্বের কল্পনা, তা বৌদ্ধ-আবরণে হিন্দু-কল্পনা মাত্র। মহাযান চিন্তাধারায় যে-হিন্দু-আদর্শমুখিনতা দেখা যায়, সৃষ্টিতত্ত্বেও তার ব্যতিক্রম ঘটে নি।

পূর্বে দেখা গেছে, বিজ্ঞানবাদ বৌদ্ধধর্মে আদিতত্ত্বরূপে কল্পিত শূন্যতার আদর্শ ভাষাসাহিত্যে দার্শনিক আদর্শে গৃহীত না-হয়ে সমসাময়িক লৌকিক অর্থেই গৃহীত হয়েছে। ভাষাসাহিত্যে তাই শূন্যচারী শূন্যতার অধীশ্বরকে শূন্যতা হতেই বিশ্বসৃষ্টি করতে দেখা যায়। ভাষাসাহিত্যে ধর্মের কল্পনা মহাযান মতের ধর্মকায় অথবা সর্বভূতের আদিভূত তথতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। বুদ্ধের ধর্মকায়ের মত ভাষাসাহিত্যেও ধর্ম থেকেই সৃষ্টিচক্রের উদ্ভব।

'কারণ্ড-ব্যূহের' বর্ণনায় দেখা যায় : আদিবুদ্ধ বিশ্বসৃষ্টির জন্য বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরের সৃষ্টি করেন । অবলোকিতেশ্বরের চক্ষু থেকে চন্দ্রসূর্য, ললাট থেকে মহেশ্বর, স্কন্ধ থেকে ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ, হৃদয় থেকে নারায়ণ, দন্ত থেকে সরস্বতীর উদ্ভব হয়। মহেশ্বরকে তিনি কলিযুগের আদিদেবরূপে সৃষ্টি-কার্যে নিযুক্ত করেন। এর মধ্যে বৌদ্ধভাব দুষ্প্রাপ্য।

ভাষাসাহিত্যের আদিদেব ও আদিদেবীর কল্পনাতেই বৌদ্ধ আদিবুদ্ধ, আদিদেব, আদিপ্রজ্ঞা বা প্রজ্ঞার ছায়া পড়েছে। পূর্বেই দেখা গেছে, এই আদিবুদ্ধ ও আদিপ্রজ্ঞা মহাযান মতের শূন্যতা ও করুণার রূপান্তর পুরুষ ও প্রকৃতি অথবা শিব ও শক্তি ভিন্ন কিছুই নন। আদিদেব ও আদিদেবীর কল্পনা সম্যক বুঝতে গেলে, বৌদ্ধতন্ত্রে শূন্যতা ও করুণার তাৎপর্য জানা প্রয়োজন।

বৌদ্ধতন্ত্র-বর্ণিত মহাযান মতে, বোধিচিত্ত সর্বভূতের আদিভূত পরমতত্ত্ব। এই আদিতত্ত্বের দু'টি দিক — শূন্যতা ও করুণা অথবা প্রজ্ঞা ও উপায়। সৃষ্টিতত্ত্বে প্রজ্ঞা নিষ্ক্রিয় বিশুদ্ধচৈতন্য, করুণাই তাতে চাঞ্চল্য এনে সর্বভূতের অস্তিত্বের কারণ হয়। বৌদ্ধ-উপায়ের সঙ্গে হিন্দু শিব-শক্তির পার্থক্য এই যে, হিন্দুমতে পরমতত্ত্বের অভাবাত্মক দিক দেবতরূপে ও বৌদ্ধমতে দেবীরূপে কল্পিত। হিন্দুমতে সক্রিয় স্বভাবাত্মক দিক দেবীরূপে, বৌদ্ধমতে দেবতরূপে কল্পিত। কিন্তু উভয়ত্রই এই প্রজ্ঞা উপায় অথবা শিবশক্তি অঙ্গাঙ্গী সম্পৃক্ত একই পরমতত্ত্বের দুই দিক — কোথাও প্রজ্ঞা বা শিব হতে উপায় বা শক্তির, আবার কোথাও উপায় বা শক্তি হতে প্রজ্ঞা বা শিবের উদ্ভব।

নেপালী বৌদ্ধগণের চারটি শাখার সৃষ্টিতত্ত্বেও উক্ত প্রজ্ঞা-উপায়ের আদর্শ বর্তমান। স্বাভাবিক সম্প্রদায়ের মতেও, অমর আত্মারূপে কোন পরমতত্ত্ব নেই। সৃষ্টির আদিভূত বস্তু। পরমতত্ত্বরূপে বস্তুর দুটি ধারা—প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, স্থাবর ও জঙ্গম। বস্তু ও শক্তি শাশ্বত। বস্তুর এই শক্তি নিবৃত্তির স্থিরতা হতে প্রবৃত্তির সাময়িক সক্রিয়তায় রূপান্তরিত হলে ভূতজগৎ অস্তিত্বময় হয়ে উঠে—শক্তি নিবৃত্তিমার্গে এলে ভূতজগৎ বিনষ্ট হয়। এই নিবৃত্তিই প্রজ্ঞা, প্রবৃত্তিই উপায়। প্রজ্ঞা ও উপায় আদিবুদ্ধ ও আদিপ্রজ্ঞা-রূপে পূজিত। শক্তিরূপে বুদ্ধ প্রজ্ঞা হতে উদ্ভূত ও তাঁর সহিত মিলিত হয়ে দৃশ্য- জগতের সৃষ্টি করেন। বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘ কোথাও-কোথাও উপায় (বুদ্ধ) প্রজ্ঞা (ধর্ম) ও তাঁদের মিলনজাত বিশ্ব (সঙ্ঘ) রূপে বর্ণিত। হিন্দুতন্ত্রের অনেকস্থানে যেমন শিব শক্তি হতে উদ্ভূত, নেপালী বৌদ্ধগণের মতেও তেমন বুদ্ধ প্রজ্ঞারূপী ধর্ম হতে উদ্ভূত। কয়েকটি তন্ত্রগ্রন্থে আদিদেব যে-সলিলে শয়ান ছিলেন, তা শক্তি-ভিন্ন কিছুই নয়। নেপালী বৌদ্ধগণের মতেও, আদিপ্রজ্ঞা আদিসলিলরূপে কল্পিত। 'স্বয়ম্ভুপুরাণ'-এর মতে, প্রজ্ঞা শিবের

শক্তি—বুদ্ধগণ দেবগণ ও ত্রিলোকের মাতা ও শূন্য-সমূহের শূন্যতা। আবার নারী প্রজ্ঞার ও পুরুষ বুদ্ধ বা উপায়ের প্রতীক এবং তাদের মিলনে উৎপন্ন বোধিচিত্ত হতেই সৃষ্টির উদ্ভব। আবার কোথাও প্রজ্ঞা রজ বা গর্ভ এবং উপায় বিন্দু বা বীজ। হিন্দুতন্ত্রের মত এখানেও আদিপ্রজ্ঞা বা আদিশক্তিকে 'ত্রিকোণাকার' বলা হয়েছে।

অতএব দেখা যাচ্ছে, ভাষাসাহিত্যের আদিদেব ও আদিদেবী (নাথ সাহিত্যের আদি ও অনাদি), সাংখ্য-মতের পুরুষ-প্রকৃতি, তন্ত্রমতের শিব-শক্তি এবং উত্তরকালের বৌদ্ধগণের আদিবুদ্ধ ও আদি প্রজ্ঞার লৌকিক সংস্করণ মাত্র। চৈনিক তাও-বাদীগণের মধ্যেও আদি জনক-জননী তাও ও তাই অথবা ঘ্যান ও ঘিন থেকে সৃষ্টির উদ্ভব কল্পিত হয়েছে।

৪. ভাষা-সাহিত্যের সৃষ্টিতত্ত্বের সঙ্গে অন্যান্য সাহিত্যের সৃষ্টিতত্ত্বের সাদৃশ্য

ভাষাসাহিত্যের সৃষ্টিতত্ত্বের অনুরূপ কল্পনা পৃথিবীর অন্যান্য সাহিত্যেও দুষ্প্রাপ্য নয়। গ্রীক ঈজিপ্ট ও টিউটন সাহিত্যে আদি সলিলের কল্পনা এবং অন্যান্য অনেক দেশে আদিডিম্বের কল্পনা বর্তমান। ইজিপ্টের এলিফ্যান্টাইনে লোকবিশ্বাস এইরূপ যে, দেবতা খাম নীলনদের মৃত্তিকা থেকে আদিডিম্ব সৃষ্টি করেন।

পরিশিষ্ট

মধ্যযুগের অবাঙালি সহজিয়াগণ

আমরা দেখেছি যে, মধ্যযুগের অধিকাংশ সাধক যারা বিভিন্ন ভাষা-সাহিত্যে ধর্মমত প্রকাশ করেছেন, তাঁরা সকলেই সাধারণ অর্থে সহজিয়া। আর এও দেখেছি, মধ্যযুগের সহজিয়াবাদের মধ্যে সুফী-সাহিত্য সবচেয়ে উগ্র। সুফীমতের প্রভাব অন্যান্য সহজিয়া ও ভক্তিমূলক সম্প্রদায়ের মধ্যে কি ভাবে কাজ করেছে তা আমরা বাউলদের ক্ষেত্রে দেখতে পাই। উত্তর ও মধ্যভারতে সন্ত-কবিগণ বাঙলার বাউলগণের আগেই আবির্ভূত হন — তাদের মধ্যে অনেকে বাংলার বৈষ্ণব সহজিয়াগণের অগ্রগামী না হলেও সমসাময়িক তো বটেই। কাজেই যখন আমরা এই মধ্যযুগের অবাঙালি কবিদের সহজিয়া পটভূমিকার কথা বলি, তখন আমরা বিশেষভাবে বৌদ্ধ-সহজিয়া আন্দোলনকে লক্ষ্য করি। মধ্যযুগের কবিদের কবিতা, (যার মধ্যে কবীরের কবিতাই প্রধান) পাঠে দেখা যায়, বৌদ্ধ সহজিয়া কাব্যের সঙ্গে মধ্যযুগীয় কবিতার ধারাবাহিকতা। কিন্তু আদিযুগের সম্প্রদায়গুলির সঙ্গে মধ্যযুগের পার্থক্য তাদের প্রেম ও ভক্তির উপাদানে — বৌদ্ধ সহজিয়া সম্প্রদায়ে যা বিশেষভাবে অনুপস্থিত। এই প্রেম ও ভক্তির উপাদান মধ্যযুগের সম্প্রদায়গুলির মধ্যে সংক্রামিত হয় — বিভিন্ন ভক্তি-আন্দোলন ও সূফী-মতের দ্বারা। যদিও পরবর্তীকালে মহাযানী-বৌদ্ধমতের মধ্যে ভক্তির লক্ষণ দেখা যায় — বৌদ্ধ সহজিয়া মতে, (যা মূলত একটি গূঢ় যৌগিক-সাধনা) তেমন দেখা যায় না। কিন্তু এই পার্থক্য-সত্ত্বেও একটি সাধারণ সাদৃশ্য রয়েছে তার ভাবে, সাহিত্যিক প্রকাশে এবং কখনও-বা ভাষার মধ্যেও। এখন আমরা দেখব, আমাদের এই সিদ্ধান্ত কতদূর সত্য। যদিও আমরা মধ্যযুগের সন্তকবিগণের ধর্ম ও সাহিত্যের সমগ্র পবিচয়ে যাচ্ছি না, তবু বাংলা সাহিত্যের যে বিষয়গুলি প্রাসঙ্গিকভাবে আসে সেই বিষয়গুলি এখানে আলোচনা করব।

১. বিদ্রোহ ও সমালোচনা

আমরা দেখেছি, বৌদ্ধ-সহজিয়া ধর্মমত ও সাহিত্যে কী বিদ্রোহ ও সমালোচনা রয়েছে। আবার এও দেখেছি, সেই একই বিরূপতা সূফীগণের ধর্মে ও সাহিত্যে। এই লক্ষণ মধ্যযুগের সন্তকবিগণের সাধারণ বৈশিষ্ট্য। ভারতীয় ধর্ম-ইতিহাসে প্রেম ও ভক্তি প্রায়শই একটি বিরুদ্ধতার সঞ্চার করেছে এবং তার ফলে মধ্যযুগীয় সন্তকবিগণের মধ্যে একটি বিশেষ বৈপ্লবিক শক্তির সঞ্চার করেছে। প্রথমত, আমরা কবীরের কবিতা, গান ও দোঁহাগুলির ধর্মমত প্রত্যক্ষ করব। তাঁর অন্তত এক-তৃতীয়াংশ সাহিত্যের মধ্যে প্রাচীনপন্থী হিন্দু ও মুসলমানগণের সমালোচনা। ধর্মীয় সাধক হিসাবে কবীর না ছিলেন হিন্দু, না মুসলমান — তিনি নিরপেক্ষভাবে উভয়েরই সমালোচক। তিনি বলেন : হিন্দুরা মরে পূজা করে, তুর্করা মরে তীর্থযাত্রায় ; যোগী মরে কেশবর্ধনে — সত্যকে কেউ পায় নি। জাতিভেদ সম্বন্ধে কবীর বলেন : যদি ভাব, ব্রাহ্মণীর কোলে জন্মালেই ব্রাহ্মণ হওয়া যায় তবে অন্যপথে আস নি কেন ; তুর্কিমাতার কোলে জন্ম হলে যদি তুর্ক হওয়া যেত তবে মাতৃগর্ভেই তোমার সুন্নত হয় নি কেন ; কৃষ্ণ ও হরিদ্রা রঙের

গাভী একত্র দোহন করলে তাদের দুগ্ধের মধ্যে কি কোনো পার্থক্য থাকে। শাস্ত্র-পুরাণের বিধি ও পবিত্র ধর্মগ্রন্থ পাঠের সম্বন্ধেও তিনি এমনই কঠোর। তিনি বলেন : লোকে চর্তুবেদ পাঠ করে, কিন্তু প্রভুর সন্ধান করে না ; সত্যকে পেয়েছেন তিনি — পণ্ডিতেরা তাকে বৃথাই সন্ধান করছেন। আরো বলেন : ভ্রাতা, ষড়দর্শনে বিশ্বাস করে ভ্রান্তপথে চলেছ ; চর্তুবেদ যদিও বিজ্ঞ ও চতুর — তারা নির্বাক ; জৈনেরা ধর্মের রহস্য জানে না : তারা পত্র চয়ন করে ঈশ্বরের মন্দিরে যায়, ঐশীজ্ঞান সে পথের বাইরে।

কবীর বলেন যে, তীর্থ-পর্যটন অথবা পবিত্র নদীতে অবগাহন নিতান্তই ব্যর্থ — যতক্ষণ না প্রভুর প্রেমে মন শুদ্ধ হয় ; লোকে বারাণসীতে বাস করে স্বচ্ছসলিল পান করে — কিন্তু হরি বিনা মুক্তি লাভ ঘটে না ; কেউ যায় মথুরায়, কেউ বা দ্বারকায়, কেউ যায় পুরীতে জগন্নাথ-দর্শনে — কিন্তু সাধুসঙ্গ ও ভক্তি-বিনা কিছুই লাভ হয় না। যোগীর বেশধারণ নিতান্তই ভ্রান্ত, তা ভণ্ডামি ছাড়া কিছু নয়। ভক্তি, ত্যাগ, দয়া, তীর্থদর্শন, উপবাস, এবং ভিক্ষা সমস্তই মিথ্যাচার। মন সংযত না হলে মালা জপে কি ফল ; মস্তক-মুণ্ডনে কি ফল যদি মন থেকে সংস্কার ও তৃষ্ণা দূর না হয় ; বৈষ্ণব হয়ে ফল কি যদি প্রকৃত চৈতন্য না হয় — তিলকসেবা শুধু লোক-ঠকানো ; সকলেই দৈহিক যোগাভ্যাসে প্রবৃত্ত, মানসিক যোগে নয়।

কবীরের এরূপ উক্তিগুলির সঙ্গে পূর্বতন সহজিয়াগণের ঐক্য দেখা যায় — সে ঐক্য শুধু ভাবে নয়, তা প্রায়ই ভাষা ও রূপকল্পেও। সরহপাদের মতো কবীরও বলেন : নগ্নতায় ফল কি, শারীরিক কৃচ্ছ্রতাই বা কি — যদি কেউ তার প্রকৃতস্বরূপ না জানে ? নগ্নভাবে বিচরণ করলেই যদি যোগী হওয়া যায়, তবে অরণ্যমৃগ কেন মুক্তিলাভ করবে না। মস্তক-মুণ্ডনে পূর্ণতা লাভ করলে মেষের স্বর্গলাভ হবে না কেন? পণ্ডিতেরা জানেন তন্ত্র-মন্ত্র-ভেষজ — তবু তার পরিণতি মৃত্যু ; তারা জগতের নানা সমস্যায় অভিনিবিষ্ট — তবু তাদের রক্ষা নেই। কবীর বলেন : প্রভুর শরণ নাও, জন্ম ও মৃত্যুর অন্ত হবে ; শিলা-পূজনে ঈশ্বর-লাভ ঘটলে আমি তো পর্বতের পূজা করতে রাজি ; স্নানে মুক্তিলাভ ঘটলে ভেক তা সর্বদাই করছে — তবু তারই মতো মানুষও বারংবার গর্ভে প্রবিষ্ট হয়।

মধ্যযুগের আদিতে কবীরের এই বিদ্রোহ ভাষা-সাহিত্যের অসংখ্য কবিদল বহন করে চলেছিলেন এবং তা এখনও প্রবাহিত। ষোড়শশতকের দাদুকে বলা যায় কবীরের সার্থক উত্তরসূরি। তিনি বলেন : পণ্ডিতেরা এ জগতকে ছলনাজালে বেঁধেছেন, কর্মজালেও—প্রকৃত গুরু দুর্লভ ; কেউ প্রকৃত নিরঞ্জনকে দেখায় না—তিনি আছেন আমাদেরই নিকটে ; প্রেমই আসল পূজা—এবং আসল প্রার্থনা ; এই প্রেম প্রকৃত কোনো কর্মে বাঁধে না—তার কোন নির্দিষ্ট স্থান বা সময় নেই ; সমস্ত জীবন প্রতি-মুহূর্তে অনন্ত প্রেমধারায় চলতে পারে প্রভুর পূজা। দাদু বলেন : লোকে (মুসলমান) শিষ্টাচারে অন্যকে প্রার্থনায় আহ্বান করে—দাদুর প্রয়োজন সাহিবকে ; দাদু তাঁর সম্মুখে প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে দণ্ডায়মান ; তোমার আজান সেখানে আসুক, যেখানে তিনি প্রকৃত স্বরূপে অবস্থিত ; মুসলমানেরা অন্যের কণ্ঠচ্ছেদ করে নিজধর্মে দীক্ষিত করতে চায় ; তারা প্রার্থনা করে পাঁচবার—কিন্তু তাদের অন্তরে প্রকৃত সত্যের বিশ্বাস নেই ; তারা অন্যকে হত্যা করে, কিন্তু নিজ অহংকে হত্যা করে না ; আত্মবিলোপ না করলে কি খুদাকে লাভ করা যায় ? যিনি নিজের দেহ-মন বিলোপ করে প্রভুর সঙ্গে মিলিত হন এবং ঐশিক উপলব্ধিতে আত্মসংযত, তিনিই প্রকৃত আউলিয়া, পীর। কবীরের মতো দাদুও প্রচণ্ডভাবে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধবাদী। তিনি বলেন : হিন্দু — তুর্ক

সকলেই বলে আমার পথ সত্য — কিন্তু অলখ্-এর পথ কোথায়? অসংখ্য সম্প্রদায়ের সেই পরমপুরুষ বহুধা বিভক্ত। জল-বায়ু, দিন-রাত্রি, চন্দ্র-সূর্য সকলেই কোনো সম্প্রদায়ভুক্ত না হয়েও তাঁর সেবা করছে — পাণ্ডিত্য, অহংকার, বা কৃচ্ছ্রতা শান্তি দিতে অক্ষম ; শাস্ত্র-জ্ঞানের অহংকার নিতান্তই মিথ্যা। হে পণ্ডিত ব্রহ্মের পুত্ররা (ব্রাহ্মণেরা), তোমার পাত্র শূন্য, — বলছ শুধু আগম ও নিগমের কথা, কিন্তু তোমার গৃহে চলছে ভূতের (পঞ্চভূত) নৃত্য। শুধু শাস্ত্রপাঠে পরপারে পৌঁছান যায় না ; হে দাদূ, তাঁকে ডাক দাও হৃদয়ের বেদনায় ; তাঁর নাম ছাড়া আর কোন স্থান নেই ; বেদে-কুরানে তিনি নেই — নিরঞ্জন যেখানে বাস করেন তা আমার থেকে দূরে নয় ; বুঝি না, কেন যে সমস্ত জগৎ শুধু মসী ও পত্রের প্রতি ধাবিত। যখন অদৃশ্য প্রভু ভিতরে আছেন, তখন বৃথা ভ্রমণে কাজ কি? কেন পাথর পূজা করে — তাতে হৃদয় শুধু পাথর হয়। লোকে হীরক খণ্ড ভেবে অঞ্চলে শুধু উপল সংগ্রহ করে — যখন অন্তে সেই হরি বা জহুরি তাদের পরীক্ষা করবেন, তখন সমস্ত জীবন ব্যর্থ প্রতিপন্ন হবে। সকলেই বাহ্যাড়ম্বর ও আত্মপ্রচার করে — কিন্তু হরি কেবল আত্মোৎসর্গে ধরা দেন। জগতে বহু ভক্তের বাস — তবু প্রকৃত সাধক দুর্লভ। হীরক বহুদূর দেশে থাকে, কিন্তু উপল সর্বত্র বিকীর্ণ। শুধু ভ্রমবশে মস্তক মুণ্ডন কর — কিন্তু তা আদৌ যোগ (ঈশ্বর সাযুজ্য) নয়। প্রেম বিনা সদিচ্ছা ও স্নেহ ছাড়া প্রসাধন মিথ্যা ; আত্মা প্রভুতে সম্পৃক্ত না হলে তিনি তোমাকে চিনবেন কেন? হে দাদূ, যোগী জঙ্গম (শৈব সাধক) সেবড়া (জৈন সাধক), বৌদ্ধশ্রমণ, আর মুসলমান সাধক বা ষড়দর্শন — সমস্তই রাম-ব্যতীত বহির্মুখ ভণ্ডামির নিদর্শন। অন্তরে তাদের ভ্রম — বাইরে বৈরাগ্যের ভাণ ; তারা রঞ্জিত বস্ত্র পরে আনন্দে ভ্রমণ করে ; তাদের দেহ সংযত, কিন্তু মন চতুর্দিকে ভ্রমণরত ; তারা প্রিয়ের কথা বলে শুধু আত্মপ্রচারের জন্য।

সুন্দরদাস দাদূর প্রধান শিষ্য, — তিনি তাঁর অনেক কবিতায় গুরুর মতেরই প্রতিধ্বনি করেছেন। কবীর, দাদূ এবং আরো অনেক কবির মতো সুন্দর আরো তীব্রভাবে হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই অন্ধ শাস্ত্রবিধি ও আচারের সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন : হিন্দুর ষড়দর্শন তিনি দেখেছেন ; দেখেছেন সূফী ও শেখদের — কিন্তু কোনো মতই তাঁর আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারে নি ; তিনি তাই সহজ পথের পথিক। তিনি তাঁর 'সর্বাঙ্গ-যোগ-প্রদীপিকা'তে ভারতের বিভিন্ন ধর্মমতের সমালোচনা করেছেন। এমন কি সমসাময়িক সন্ত-যোগী ও সূফীমতের গোঁড়ামি ও প্রাণহীন আচার-সর্বস্বতারও সমালোচনা করেন।

শিখধর্মের প্রবর্তক নানকের মধ্যেও এই কবীর-দাদূ-প্রমুখের বিদ্রোহ লক্ষ্য করা যায়। তিনিও হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই গোঁড়া মতের নিন্দা করেছেন। তিনি বলেন : কুরানের অনুসরণে করুণা হোক মসজিদ, অকপটতা হোক প্রার্থনার জাজিম, সমদর্শিতা হোক তোমার ভোগ্য। শিষ্টতা হোক তোমার সুন্নত, ভদ্রতা হোক উপবাস — তাতেই তুমি হবে প্রকৃত মুসলমান। তিনি বলেন : তাঁর তুষ্টিতে আমার তীর্থস্নান — তাঁর তুষ্টি-বিনা স্নানে কি ফল। পাণ্ডিত্য, ব্রাহ্মণত্ব ও দার্শনিক তত্ত্ব-বিষয়ে নানকের মত তাঁর পূর্বসূরিদের অনুরূপ।

একটি অনুপম কবিতায় তিনি বলেছেন : দেবালয়ে প্রভুর সম্মুখে আরতি করা হাস্যকর— কারণ, সমস্ত মহাবিশ্ব তাঁর সম্মুখে আরতি করছে ; সূর্য এবং চন্দ্র আকাশপটে দীপবর্তিকা — নক্ষত্রমালা রত্নহার ; বায়ু গন্ধ বহন করছে, অরণ্য বিকীর্ণ করছে পুষ্প-বিভা, অনাহত শব্দ ঢক্কানিনাদ করছে—এইভাবে প্রভুর আরতি চলছে অবিরত।

একই বিদ্রোহ ভারতের মধ্যযুগীয় সমস্ত ভাষাসাহিত্যের কবিগণের ভক্তিগীতির মধ্যে লক্ষ্য করা যায় — যেমন, তুলসীদাস, মীরাবাঈ, রজ্জবজি, চরণদাস, সহজ-বাঈ, দয়া-বাঈ এবং আরো অনেকে। এরা সকলেই ধর্মের অধোগতি রোধ করতে চেয়েছেন বিভিন্ন শাস্ত্রবিধি ও তৎকালীন আচার ও প্রচারের বিরুদ্ধে — অকপট প্রেমই তার মূল সুর। সমসাময়িক সূফী মরমী কবিগণ (হিন্দির একটি উপভাষায় যাঁদের রচনা) অন্যান্য ভক্তিগীতির সুরেই কথা বলেন। রজ্জব বলেন : সর্বব্যাপী অন্ধকারের মধ্যে উজ্জ্বল আলো আমাদের হৃদয়ে ; জগতের প্রতি বিরাগ এবং দেহপীড়নমূলক আচারের দ্বারা নিজের মধ্যে প্রচ্ছন্ন শত্রুকে কি নাশ করা যায়? নমাজ ও অভিবাদনে জীবন-মন্দির পূর্ণ করো ; মনই সর্বদা ত্যক্ত করে — শান্ত জীবন-মসজিদ থেকে কাফের মনকে দূর করো। যেমন অনেক মানুষ ও সম্প্রদায় বিধাতার বিচিত্র সৃষ্টি — কিন্তু সবার হৃদয়ের প্রণাম একটি মহাতরঙ্গে মিলিত হয়ে এক পরিত্রাতা প্রভুর সাগরে মিলিত হচ্ছে। প্রভুর চরণ থেকে গঙ্গার সৃষ্টি — হৃদয়ে তাঁর চরণ স্থাপিত হলে সকল ভক্তের হৃদয়েই প্রবাহিত হবে সেই প্রেমনদী। এই ব্রহ্মাণ্ডই বেদ — তারই পূর্ণতা-সাধনই কুরান। পণ্ডিত ও কাজিরা শুষ্ক কাগজের স্তূপকেই সর্বস্ববোধ করে — তারা সকলেই ব্যর্থ। সমস্ত কৃত্রিমতার প্রাচীর ভগ্ন করে অন্তরের মিলন-সাধনই ব্রহ্মাণ্ডের প্রকৃত সত্যপাঠ। মানুষের জীবনের মধ্যেই রয়েছে জীবন্ত বেদ — যদি কিছু পাঠ করতে হয় তবে সেই জীবন্ত বেদই পাঠ করা উচিত। বুলেশা, অন্য-এক মরমী সূফী। তিনি বলেন : লোকে বলে, তুই মসজিদে অবস্থান কর — কিন্তু হৃদয়ের মধ্যে আন্তরিক নমাজ না হলে মসজিদে বসে কি ফল? হে বুল, সমস্ত তীর্থস্থান তস্করপূর্ণ ; মন্দিরে প্রবঞ্চক বাস করে এবং মসজিদে বাস করে ধূর্তেরা — কিন্তু প্রেমিক-প্রভু থাকেন বাইরে। খুদাকে মসজিদে পাওয়া যায় না, কাবাতে পাওয়া যায় না, শাস্ত্রে পাওয়া যায় না, নমাজের বাঁধা-ছকেও নয় — স্বাভাবিক পথে যদিও কিছু বোঝা যেত, পণ্ডিতেরা গোল বাধায়। হে বুল, মক্কা-গমনে মুক্তিলাভ ঘটে না — হৃদয় থেকে অহং দূর না হলে শতবার গঙ্গাস্নানেও মুক্তিলাভ ঘটে না ; মুক্তি তখনই পাওয়া সম্ভব যখন সম্পূর্ণ অহং ত্যাগ করা যায়।

২. গুরু-বাদ

মধ্যযুগীয় বৌদ্ধ সহজিয়া মতবাদের, সূফী ও অন্যান্য সহজিয়া মতবাদের অন্য-একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য, গুরুবাদের উপরে বিশেষ জোর। আমরা দেখেছি, তান্ত্রিক সাধনার অন্যতম সন্ততি বৌদ্ধ সহজিয়া সম্প্রদায়ে জ্ঞানী ধর্মপ্রচারককে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মধ্যযুগের প্রায় সমস্ত অপ্রধান সম্প্রদায়ে এই আদর্শের পরিচয় পাই। অসংখ্য সন্ত কবির মতে গুরুর বিশেষ মর্যাদা দেখা যায় : সূফীগণের মুর্শীদ, শিখগণের গুরু, নাথযোগিগণের তেমনই গুরু এবং বৈষ্ণব সহজিয়া আউল, বাউল, কর্তা-ভজা, দরবেশ তথা বাংলার অন্যান্য সম্প্রদায়ে সেই একই গুরুর প্রাধান্য। এই বিষয়টি এমনই সুবিদিত ও সর্ববাদীসম্মত যে, এ-বিষয়ে উদ্ধৃতি অনাবশ্যক। কবীর, দাদু, নানক, সুন্দর-দাস এবং অন্যান্য সকলেরই রচনার অনেকাংশ গুরুর মহিমা প্রকাশেই নিবেদিত। বলা হয়েছে : সত্যের আলো এক দীপ থেকে অন্য দীপে আলোকসঞ্চারের মতো গুরু থেকে শিষ্যে সঞ্চারিত হয়। প্রকৃতপক্ষে এই গুরুবাদ ভারতের সকল সম্প্রদায়েরই সাধারণ লক্ষণ।

৩. গুহাহিত সত্য

আমরা দেখেছি, বৌদ্ধ সহজিয়া মতে কি ভাবে দেহভাণ্ডকে ব্রহ্মাণ্ডের সার বলে গ্রহণ করা হয়েছে এবং সে কারণে দেহই সকল সত্যের আধার। এই বিষয়টি সূফী-মতেরও প্রধান বিশেষত্ব। আবার এও দেখেছি যে, বৌদ্ধতন্ত্রে দার্শনিক তত্ত্বগুলি দেহের মধ্যেই নিহিত এবং সমস্ত পবিত্র নদী-পর্বত তীর্থগুলি দেহকাণ্ডে অবস্থিত। বৌদ্ধ সহজিয়া-মতে, এই দেহের মধ্যেই সকল সত্যের অবস্থিতির এই তত্ত্বটি শুধুমাত্র তন্ত্র থেকেই আগত নয় — উপনিষদেরও প্রভাব রয়েছে। এক্ষেত্রে মধ্যযুগীয় হিন্দি ও বাংলাসাহিত্যের মত বৌদ্ধ সহজিয়া মতের অনুরূপ। মধ্যযুগীয় সম্প্রদায়গুলির এই ভাবের মধ্যে সূফীমতেরও প্রভাব দেখা যায়।

কবীরের মধ্যে, বৈষ্ণবের দ্বৈতাদ্বৈতভাবের সঙ্গে সূফীমতের প্রভাব দেখা গেলেও তান্ত্রিক প্রভাবও কম নয়। তান্ত্রিক ভাবের অর্থ : এই ভৌত ও জৈবিক ক্রিয়া-সমন্বিত দেহতন্ত্র সত্য উপলব্ধির প্রকৃত যন্ত্র। কবীরের কবিতা পাঠে বোঝা যায় : তাঁর যোগ-পদ্ধতির মধ্যে দেহের দক্ষিণ ও বামে দুটি প্রধান নাড়ী ইড়া ও পিঙ্গলা, চন্দ্র-সূর্য অথবা গঙ্গা ও যমুনা নামে পরিচিত ; ইড়া-পিঙ্গলা ও সুষুম্না এই তিন নাড়ীর মিলন-স্থানকে বলা হয় ত্রিবেণী। বৌদ্ধ সহজিয়াগণের মতো এই মধ্য- নাড়ী সহজের পথ (সহজ শূন্য) এবং যোগকে বলা হয় সহজযোগ — যা সর্বশেষ অবস্থা সহজ-সমাধি বা সহজ-শূন্য। মেরুর (মেরুদণ্ড) উচ্চতম প্রান্তে অবস্থিত চন্দ্র থেকে ক্ষরিত অমৃতপানকেই কবীর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। মধ্যযুগীয় সমস্ত হিন্দি কবিরাও কবীরের মতোই এই বিশেষ যোগের কথা বলেন।

কাজেই দেখা যায়, কবীরের উপরে যোগ ও তন্ত্রের প্রভাব বৈষ্ণব ও সূফীর প্রভাবের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। বৌদ্ধ কবি সরহপাদের মতোই তিনি বলেন : আকারের মধ্যেই নিরাকারের বাস — তাঁর সন্ধান কেউ জানে না ; নিজ নাভিতে রয়েছে কস্তুরী — তবু মৃগ তারই সন্ধানে ফেরে অরণ্যে ; তেমনই রাম আছেন প্রত্যেকের দেহে, কিন্তু বিশ্ব তাঁকে দেখে না। প্রভু আছেন দেহে, মায়াবশে কেউ জানে না ; দেহ-তড়াগে যেন তিনি মৃণালহীন পদ্ম— তার উপরে পরমপুরুষের বাস। বৌদ্ধ সহজিয়া মতে : সমস্ত পবিত্র নদী-পর্বত - তীর্থ আছে দেহের মধ্যে। কবীর বলেন : হৃদয়ে রয়েছে গঙ্গা ও যমুনা এবং তাতে আছে সহজ-শূন্য ঘাট — তিনি সেখানে নির্মাণ করেছেন মন্দির। আরো বলেন : মন হল মথুরা, হৃদয় দ্বারকা — দেহ দশ-দ্বার-মন্দির এবং সেখানে রয়েছেন জ্যোতি।

দাদুর মধ্যে এই সূফী-ভাব আরো সুস্পষ্ট। তিনি বলেন : হে দাদু, প্রতিটি দেহে রাম-রত্নের বাস, কিন্তু কেউ সেই প্রভুকে দেখে না ; গুরুর হাতে দীপবর্তিকা দিলে তাঁকে দেখা যায় ; শ্রেষ্ঠগুরু দেখান : অন্তরে আছে মসজিদ ; কোথায় মন্দির, কোথায় প্রণতি ও সেবা ; কেন তবে বৃথা ভ্রমণ। আরো বলেন : এই দেহ-মন্দিরে আমি প্রার্থনা করব — অন্য কারো সেখানে প্রবেশ নেই ; সেখানে আমি মানসরত্নের মালা জপ করব — তাতে তুষ্ট হবেন আমার প্রভু ; হৃদয়-তরঙ্গে আমি স্নান করব, মনকে প্রক্ষালন করব ; প্রভুর সম্মুখে নতমস্তকে নিবেদন করব নিজেকে। আরো বলেন : কেউ যায় দ্বারকায়, কেউ কাশীতে, কেউ বা মথুরায় — কিন্তু প্রভু আছেন দেহে। হে দাদু, সকলে তাঁকে ছেড়ে উপাসনা করছে বাইরে ; দেহের মধ্যেই আকাশ — সেখানেই পৃথিবী ; দেহের মধ্যেই চর্তুবেদ — সেখানেই তাদের রহস্য ; দেহের মধ্যেই রয়েছে পুনঃপুন জন্ম ; দেহের মধ্যেই আদি ও অন্ত —

সেখানেই ঈশ্বর : দেহের মধ্যেই সপ্তসাগর, সেখানেই আছেন অজ্ঞাত প্রভু ; দেহের মধ্যেই সমস্ত তটিনীর জল—সেখানেই আছেন পরমসত্য ; দেহের মধ্যেই আছে প্রাণশক্তি — তার মধ্যেই নির্বাণ ; ভিতরে রয়েছে সেবা — সেখানে নিবস্তর প্রবাহিত অমৃতধারা ; সেখানে আছেন একেশ্বর প্রভু — তাতে প্রেমের আলো এবং তাতেই প্রভুর সঙ্গ ; সেখানে বিকশিত হয় পদ্ম, সেখানে ভ্রমরের গুঞ্জন ; সেখানেই বিকাশ। এমনিভাবে নানকও বলেন : কেন তুমি তীর্থে যাও — হৃদয়ে রয়েছেন উজ্জ্বল রত্ন ; পণ্ডিতেরা শাস্ত্র পাঠ করে তর্ক করে — কিন্তু সেই অন্তরের ধনকে জানে না।

৪. 'সহজ'-কল্পনা

মধ্যযুগীয় কবিগণের সহজের কল্পনার সঙ্গে তাঁদের পূর্ববর্তী সহজিয়াদের সাদৃশ্য দেখা যায়। বাংলার বাউল গানের মতো মধ্যযুগের হিন্দি কবিগণের পরম সত্যের কল্পনা পূর্ববর্তী সহজিয়াগণের সত্যের উপলব্ধি, সুফীবাদের পরম প্রেমিক এবং তৎকালীন অন্যান্য ভক্তিবাদের মিশ্রণ। এই সত্য এইভাবে পরম প্রেমিকে রূপান্তরিত হওয়াতে, সহজ হয়েছেন রাম — যেখানে তিনি অন্তরের ঐশীপুরুষ, যার সঙ্গে ভালবাসার সহজ সম্বন্ধ। সন্তকবিগণ মুখ্যত বাংলার বাউল গানের পূর্বসূরী — তাই স্বাভাবিক ভাবেই সম্ভবত সহজিয়া ও সূফী আন্দোলন উত্তর ভারতের কবিগণের সৃষ্টি। যে কারণে উত্তর ভারতে বিভিন্ন অঞ্চলের এই ভাব-মিশ্রণ ঘটেছে, বাংলাদেশেও তেমনইভাবে কল্পনার ঐক্য ঘটেছে। সহজ সম্বন্ধে কবীর বলেন · সকলেই সহজের কথা বলে— কিন্তু আসল সহজকে কেউ জানে না ; প্রকৃত সহজ সেই, যার মধ্যে দিয়ে মানুষ আকাঙক্ষা ত্যাগ করে ; সহজ সেই যে পঞ্চ-ইন্দ্রিয় সংযত করে ; প্রকৃত সহজ সেই যাতে স্ত্রী-পুত্র, ধন-সম্পদ ও আকাঙক্ষা সমাহিত এবং কবীর হয় রামের রমণী ; সহজ সেই, যার মধ্য দিয়ে প্রভুকে সহজভাবে বোঝা যায়। পূর্বসুরিদের মতো মধ্যযুগীয় কবিগণ সহজ অব্যক্ততায় গুরুত্ব দিয়েছেন — যিনি তাঁদের স্বামী ও রাম। যদিও কবীর-দাদূ-নানক এবং নির্গুণ-সম্প্রদায়ের হিন্দিকবিগণ প্রায়শই প্রভু, রাম অথবা কৃষ্ণের কথা বলেন এবং প্রায়শই নিজেদের সেই প্রভুর রমণীরূপে কল্পনা করেন। কবীর, দাদূ, শিখকবি নানক-প্রভৃতির এরূপ অনেক কবিতা রয়েছে। এই কবিগণ ঈশ্বরের অবতারত্বে বিশ্বাস করতেন বললে ভুল হবে ; বারংবার কথিত হয়েছে : এই প্রভু, রাম বা কৃষ্ণ কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তি নন — কিংবা ঈশ্বরের কোন অবতার নন ; তিনি ঐশিপুরুষ, তিনি পরমনিরাকার সত্য — বিশ্বব্যাপী অদ্বয় সত্য, লোকাতীতের চেয়ে সর্বাতিশয়ী। কবীর-কথিত স্বর্গীয় আনন্দ হল সহজ-সমাধি — বৌদ্ধ সহজিয়াগণের অনুরূপ। এই সহজ- লাভে মনের ক্রিয়া সম্পূর্ণভাবে নিরুদ্ধ করতে হবে। এই সহজ একটি শূন্য অবস্থা — প্রায়শ যাকে বলা হয় শূনী-সহজ। এই সহজ পরম আনন্দময় অবস্থার (সুখ বা মহাসুখ) অদ্বয়রূপ।

সহজের এই বর্ণনা দাদূর কবিতাতেও দেখা যায়। দাদূর মধ্যে কবীরের চেয়ে যোগ-প্রক্রিয়ার উপাদান অনেক কম — তিনি ভক্তির ও প্রেমের অনেক গুরুত্ব দিয়েছেন। যে অবস্থায় মন প্রকৃত ঐক্য ও অদ্বয় অবস্থা প্রাপ্ত হয়, যে অবস্থাকে বলা হয় সহজ-অবস্থা। দাদূ কবীরের চেয়ে তাঁর প্রভু (স্বামী বা রাম)-এর কথা বলেন বেশি ; কিন্তু সেই প্রভু নিরাকার অদ্বৈত পরম প্রিয়তম এবং সেই পরমপ্রিয়ই সহজ। আত্মনিবেদন বা সেই আত্মোৎসর্গ, সূফীগণের ভাষায়, ঐশি পুরুষের সহজ উপলব্ধি ঘটায়। দাদূ তাঁর কবিতায় বলেন : মন

সহজ অবস্থায় পৌঁছলে সমস্ত দ্বৈতের বিলোপ ঘটে — উষ্ণতা ও শীতলতা-প্রভৃতি সমস্ত কিছু অভিন্ন ; সেখানে সুখ- দুঃখ এক ; সহজের নেই জন্ম অথবা মৃত্যু — তা সম্পূর্ণ নির্বাণ। মনকে সহজে সহজ-শূন্যতায় নিবিষ্ট-নিরুদ্ধ করে অমৃত পান কর — তখন কালের ভয় (মৃত্যু বা সময়) লুপ্ত হবে। সেই সহজের ভূমিতে কারো জন্ম-মৃত্যু নেই, কালচক্রের নিয়মে আসা-যাওয়া নেই ; সেখানে সূর্য-চন্দ্র, দিন-রাত্রির প্রবেশ নেই — সমস্তই সহজে সমাহিত। মন সহজে মগ্ন হলে চক্ষু-ব্যতীত দৃষ্টি, দেহ-ব্যতীত অনুভব, জিহ্বা-ব্যতীত জপ, কর্ণ-ব্যতীত শ্রবণ, পদ-ব্যতীত ভ্রমণ এবং মন-ব্যতীত অনুভব ঘটে — এই অবস্থাই সহজ অবস্থা। দাদুর মতে : এই সহজই শূন্য এবং ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত ভৌত বস্তুর মধ্যে বিরাজিত — সমস্ত স্থানে, সমস্ত দেহে (ঘাট) এবং অন্যত্র সহজ শূন্য বিরাজিত ; এখানে নির্গুণ নিষ্কলঙ্ক একের লীলা ; সেই এক অখণ্ড জলাশয়, অনন্ত সলিল — অবগাহন করে হংসেরা (সন্ত ও যোগীগণের মন) ; সমস্ত বৈচিত্র্য এক সহজেরই লীলা।

সুন্দর-দাস 'সহজানন্দ' সম্পর্কে বলেন : গুরু তাঁর কাছে সহজের কথা বলার পরে তিনি সমস্ত ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও যৌগিক প্রক্রিয়া ত্যাগ করে সহজের কাছে সহজ-পথে চলতে চান। এই সহজই ব্রহ্ম, সৃষ্টির একৈক সত্তা। প্রকৃত পক্ষে মধ্যযুগের প্রায় সমস্ত মরমী কবিগণ এই সহজেরই প্রবক্তা। এমন-কি , শিখ কবি নানকও প্রায় কবীরের মতোই এই সহজের কথা বলেন — বলেন, দাদূ এবং আরো অনেকে। তাঁর কাছে আবার সহজ শুধু পরম সত্যই নন, সেই সঙ্গে তিনি প্রভু — পরম প্রিয়তম।

৫. ভাষা ও সাহিত্যরূপের সাদৃশ্য

আমরা দেখেছি : শুধু তত্ত্বগত বিষয়েই নয়, কাব্য-ভাষাতেও সন্ত ও সুফী কবি এবং বৌদ্ধ সহজিয়াগণের কবিতায় একটি সাধারণ সাদৃশ্য রয়েছে। প্রায়শ একই রূপকল্প, একই বাগধারা— এমন কি প্রায় একই পঙ্‌ক্তি সর্বত্র দেখা যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ : শান্তি-পাদ তাঁর একটি চর্যাগানে বলছেন : অলক্ষ্য লক্ষ না যাই (অদৃশ্যকে দেখা যায় না)। কবীরের মধ্যে একথাই বারংবার দেখা যায়। আমরা দেখেছি, সর্বশেষ উপলব্ধির অবস্থাকে কবীর বলেছেন, শূন্যতা বা আকাশ (শূন্য বা গগন) — অন্যদিকে সহজকেও বলা হয়েছে শূন্য। কবীর একটি কবিতায় বলেন : আদিতে আছেন আকাশ বা শূন্য, অন্তে শূন্য, মধ্যেও শূন্য — এই অবিনাশী শূন্যে আগমন-নির্গমন নেই, কোনো কিছু আসে-যায় না ; মন এই শূন্যতায় ন্যস্ত হলে মৃত্যু নতমস্তক হয়— এই পঙ্‌ক্তিগুলি রয়েছে চর্যাগানে। ভুসুকাপাদ চর্তুদিকে ব্যাধ-পরিবৃত এক ভ্রান্ত হরিণের কথা বলেছেন ; কবীরও এই মনকে ব্যাধ-বেষ্টিত হরিণের সঙ্গে তুলনা করেছেন — কাল (সময়, জরা বা মৃত্যু) সাধারণভাবে এই শিকারীর সঙ্গে উপমিত। সরহপাদ একটি দোঁহায় বলেন : পণ্ডিতেরা শাস্ত্র-ব্যাখ্যায় অভ্যস্ত ; কিন্তু দেহের মধ্যে বাস করেন বুদ্ধ — তাকে কেউ জানে না। এই একই দোঁহা সামান্য পরিবর্তিত রূপ পায় কবীরের রচনায়। ভুসুকপাদের একটি কবিতায় সহজের উপমা একটি মহাতরু। কবীরও একটি কবিতায় তাই বলেন। কানু-পাদ একটি চর্যায় তাঁর ঐশি আনন্দে উদ্দীপ্ত মনকে মদমত্ত হস্তীর সঙ্গে তুলনা করেছেন — যে সহজের পদ্ম-সরোবরে ভোগ-সুখে রত। কবীরের কবিতাগুলি অধিকাংশই সিদ্ধাচার্যগণের চর্যাগানের অনুরূপ। কবীরের গানে ভৌত জগতের মায়া এবং দ্বৈধের অসত্যতার বিষয়টিও

প্রায় চর্যাপদের অনুরূপ। তদ্ব্যতীত সহজের বোধ সম্বন্ধে অজ্ঞেয়তা ও সহজের মধ্যে মনের নিমজ্জন সাগরে লবণের নিষিক্ত অবস্থার সদৃশ্য — সমস্তই পূর্ববর্তী উৎস থেকে প্রাপ্ত। সরহপাদ অন্য-একটি দোঁহায় বলেন : যারা শুদ্ধমনে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ আনন্দময়কে উপভোগ করে এবং শূন্যতার পূজক, তারা সমুদ্রের উপরিভাগে বারংবার মাস্তুলে প্রত্যাবর্তনকারী বায়সের মতো। এই রূপকল্প দাদূর মধ্যেও দেখা যায়, যেখানে তিনি বলেন : মনকে দৃঢ়ভাবে লগ্ন করতে হবে সহজে, অস্তিত্ব-সাগরে যিনি মাস্তুলের মতো। অন্য-একটি দোঁহায় সরহ বলেন : কোনো আকাঙ্ক্ষা দমন কোরো না — দেখ : মৎস্য, পতঙ্গ, হস্তী, ভ্রমর এবং হরিণকে (তারা যথাক্রমে স্বাদ, দৃষ্টি, স্পর্শ, ঘ্রাণ এবং শব্দের প্রতি আসক্তি-বশত মৃত্যুকে ডেকে আনে)। প্রায় এমনই দোঁহা পাওয়া যায় তুলসীদাস, রবিদাস, দাদূ এবং অন্যান্য অনেকের রচনায়।

অন্য-একটি প্রধান সাদৃশ্য দেখা যায় বৌদ্ধ সহজিয়া সাহিত্য এবং মধ্যযুগীয় ভাষাসাহিত্যগুলির মধ্যে—তা হল গুহ্য সূত্রগুলির রহস্যজনক বাগভঙ্গি।

সন্ধ্যাভাষা বা সন্ধাভাষা

আমরা দেখেছি, প্রাচীন ও মধ্যযুগের অনেক সাধক-সম্প্রদায়ই ছিলেন কোনও বিশেষ গুহ্য-সাধনার সাধক ; এই গুহ্য-সাধনার পদ্ধতি ও অনুভূতিকে প্রকাশ করবার জন্য তাঁরা যে ভাষা ব্যবহার করতেন তারও একটা প্রহেলিকাময় বৈশিষ্ট্য ছিল। অশ্রদ্ধাশীল সাধারণ লোকগণ যাতে সাধকগণের সাধনার গূঢ়তত্ত্ব অবগত না হতে পারে এই জন্যই এই জাতীয় প্রহেলিকাময় ভাষার ব্যবহার ; পরে অবশ্য তা মধ্যযুগে একটা সাহিত্যিক রীতিরূপেই দেখা দিয়েছিল। প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যের এই প্রহেলিকা-ভাষা সাধারণত সন্ধাভাষা বলে খ্যাত। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এই সন্ধ্যাভাষাকে বলেছেন আলো-আঁধারি ভাষা, — কিছু বোঝা যায়, কিছুটা বোঝা যায় না। কিন্তু মহামহোপাধ্যায় বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় একটি প্রবন্ধে যথেষ্ট তথ্য ও যুক্তিদ্বারা প্রমাণ করেছেন, ভাষাটি মূলে সন্ধ্যাভাষা নয়, তা হল 'সন্ধাভাষা' (সম্ + ধা) — অর্থাৎ একটি বিশেষ অভিসন্ধি বা অভিপ্রায় নিয়ে প্রয়োগ করা হয়েছে যে ভাষা। বৌদ্ধশাস্ত্রে একে অনেক সময় 'আভিপ্রায়িক' ভাষাও বলা হয়েছে। এখানে যে কথাটি বলা হয় তার বাইরের একটা সাধারণ অর্থ আছে — আবার ভিতরে একটি গূঢ় অর্থের ব্যঞ্জনা রয়েছে। পালি বৌদ্ধশাস্ত্রে এবং সংস্কৃত বৌদ্ধশাস্ত্রে এই সন্ধাভাষা শব্দটির এই অর্থে বহু প্রাচীন প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়।

মহামহোপাধ্যায় বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় মনে করেন, অশিক্ষিত লিপিকরগণের প্রমাদবশতই সন্ধাভাষা পরবর্তী কালে সন্ধ্যাভাষায় রূপান্তরিত হয়েছে। কিন্তু এ-বিষয়ে একটি তথ্য লক্ষ্য করতে হবে, বৌদ্ধতন্ত্রের এবং তাদের উপরে টীকা-টিপ্পনীর যে সব প্রাচীন পুঁথি দেখেছি, তার সর্বত্রই সন্ধাভাষা শব্দটিকে সন্ধ্যাভাষা রূপেই পেয়েছি। আমার মনে হয়, সন্ধাভাষা কথাটিই পরবর্তী কালে আভিপ্রায়িক অর্থ হতে অস্পষ্ট আলো-আঁধারি ভাষার একটা অর্থই গ্রহণ করেছিল এবং এইভাবেই সন্ধাভাষা সন্ধাভাষাতে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল।

আসল অর্থকে আরও মহিমান্বিত এবং যত্নগ্রাহ্য করে তুলতে এই যে প্রহেলিকা ভাষার ব্যবহার, ঋক্-বেদ এবং অথর্ব-বেদের বহুস্থানে এব নমুনা পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলির মধ্যে আমরা কতগুলি উক্তি বা সংক্ষিপ্ত বর্ণনা পাই, যার অভিধানের পিছনে পূর্বমীমাংসকেরা একটি তাৎপর্যার্থ আবিষ্কার করেন। কিন্তু ঠিক সন্ধ্যাভাষার ব্যবহার আমরা বহুলভাবে দেখতে পাই তান্ত্রিক শাস্ত্রের ক্রম-বিকাশের সঙ্গে-সঙ্গে। তন্ত্রের সাধনা অনেকাংশে গূঢ় এবং গুহ্য ; এই সাধনা সাধারণ লোকের হাতে পড়ে কোনও বিকৃতি লাভ না করে, এই জন্যই এই পারিভাষিক সন্ধ্যাভাষার ব্যবহার। তন্ত্রের সন্ধ্যাভাষার প্রকৃতি হল, সেখানে কতগুলি বিশেষ-বিশেষ শব্দের উপরে বিশেষ-বিশেষ অর্থ আরোপিত রয়েছে — এই আরোপিত অর্থের সংকেত দীক্ষিত সাধকগণ ব্যতীত অন্যের জানা থাকে না, তাই বাইরের লোক সহসা এর অর্থ গ্রহণ করতে পারে না। হঠযোগেব গ্রন্থগুলির মধ্যেও এই জাতীয় পরিভাষা ব্যবহারের রীতি রয়েছে। বৌ তন্ত্রগ্রন্থ হেবজ্র-তন্ত্রে এবং শ্রীগুহ্যসমাজ-তন্ত্রে একটি একটি অধ্যায়ে এই বিশেষার্থে ব্যবহৃত ‍গুলির অর্থ বলে দেওয়া হয়েছে। চর্যাগীতিগুলির মধ্যেও এই জাতীয় পারিভাষিক শব্দের

ব্যবহার ছাড়াও চর্যার সন্ধ্যাভাষার বৈশিষ্ট্য হল, এখানে মাঝে-মাঝে এমন বর্ণনা দেখতে পাই যার আক্ষরিক ভাবে এক অর্থ, যোগ সাধনার দিক থেকে সম্পূর্ণ আর এক অর্থ। যেমন—

মারিঅ শাসু ননন্দ ঘরে শালী ।
মাঅ মারিঅ কাহ্ন ভইঅ কবালী ॥

এর আক্ষরিক অর্থ হল,—'ঘরে শাশুড়ী ননদ শালীকে মারিয়া ও মাকে মারিয়া কাহ্ন কাপালী হইল।' কিন্তু যোগের দিক থেকে এখানে 'শাসু' অর্থ হল 'শ্বাস', 'ননন্দ' অর্থ বিষয়ানন্দদানকারী ইন্দ্রিয়াদি, 'শালী' অর্থ নিঃশেষ, 'মাঅ' অর্থ মায়া, আর 'মারিঅ' শব্দের অর্থ নিঃস্বভাবীকৃত করে।/একটি চর্যাপদে আছে—

দুলি দুহি পিটা ধরণ ন জাই।
রুখের তেন্তলি কুম্ভীরে খাই ॥
আঙ্গণ ঘরপণ সুন ভো বিআতী ।
কানেট চোরে নিল অধরাতী ॥
সুসুরা নিদ গেল বহুড়ী জাগঅ।
কানেট চোরে নিল কা গই মাগঅ ॥
দিবসই বহুড়ী কাগডরে ভাঅ ।
রাতি ভইলে কামরু জাঅ ॥
অইসন চর্যা কুকুরীপাএঁ গাইড় ।
কোড়ি মাঝে একু হিঅহিঁ সমাইড় ॥ (চর্যা ২)

পদটির আক্ষরিক অনুবাদ এই, — 'দুলিকে (কচ্ছপকে) দুহিয়া পীঠ ধরণ যায় না ; গাছের তেঁতুল কুম্ভীরে খায়। অঙ্গন ঘরের সমীপে, শোন হে বিজ্ঞপ্তি (পরিশুদ্ধাবধূতিকা) কর্ণভূষণ চোরে নিল অর্ধরাত্রে। শ্বশুর নিদ্রা গেল, বধূটি জাগে ; কর্ণভূষণ চোরে নিল, কোথায় গিয়া মাগিবে? দিবসেই বধূ কাকডরে ভয় পায়, রাত্রি হইলে কোথায় যায়? কুকুরীপা এইরূপ চর্যা গাহিল ; কোটির মধ্যে একজনের হৃদয়ে ইহা প্রবেশ করিল।'

এখানে 'দুলি' অর্থ দুই — সর্বপ্রকার দ্বৈতত্ত্ব বা তার প্রতীক দেহের দুই পাশের প্রসিদ্ধ দুইটি নাড়ী। যা দোহা হচ্ছে তা 'সংবৃত্তি বোধিচিত্ত' ; 'পীঠ' হল নাভিদেশে অবস্থিত মণিপুর চক্র। বৃক্ষ (রুখ) হল দেহবৃক্ষ, 'তেন্তলি' হল বক্রগামী 'বোধিচিত্ত', আর কুম্ভীর হল যৌগিক 'কুম্ভক'। 'বহুড়ী' হল অবধূতিকা ; ঘর হল সহজানন্দের স্থান মহাসুখচক্র — আর অঙ্গন হল বিরমানন্দ-স্থান। 'কানেট' হল 'প্রকৃতি-দোষ', সহজানন্দই চোর — এবং অর্ধরাত্রি হল সহজানন্দে সম্পূর্ণ বিলীন হবার পূর্বক্ষণ। 'শ্বশুর' হল 'শ্বাস' ; 'দিবস' হল চিত্তের ব্যুত্থানাবস্থা — 'রাত্রি' হল নিলয়ের অবস্থা ; 'কামরু' সম্ভবত কামরূপ — সহজিয়াগণের শ্রেষ্ঠ তীর্থ উষ্ণীষকমল।

চর্যাপদে এই যে ধাঁধার ভিতর দিয়ে কথা বলবার ভঙ্গি পরবর্তী কালে এই ধারাটি অবাধিতভাবেই প্রবাহিত হয়েছে। চর্যায় আমরা একটি পদ পাই, —

টালত মোর ঘর নাহি পড়িবেশী।
হাড়িত ভাত নাহি নিতি আবেশী ॥
বেঙ্গ সংসার বড়হিল জাঅ।
(বেঙ্গস সাপ বড়হিল জাঅ)
দুহিল দুধু কি বেন্টে সামায় ॥

বলদ বিআঅল গবিআ বাঁঝে।
পিটা দুহিএ এ তিনা সাঁঝে ॥
জো সো বুধী শোধ নিবুধী।
জো সো চোর সোই সাধী ॥
নিতি নিতি বিআলা ষিহে ষম জুঝঅ।
ঢেণ্ঢণপাএর গীত বিরলে বুঝঅ ॥

পদটির বাচ্যার্থ হল, — 'টিলাতে আমার ঘর, প্রতিবেশী নাই ; হাঁড়িতে ভাত নাই, (কিন্তু) নিত্য আসে। বেঙ্গের সংসার বাড়িয়া যায় (অথবা বেঙ্গ দ্বারা সাপ তাড়িত হয়), দোহা দুধ কি বাঁটে ঢোকে? বলদ বিয়াইল, গাভী বাঁঝা, এ তিন সন্ধ্যা পীঠ দোহন করা হয়। যে বুদ্ধিমান্ সে শুদ্ধ নির্বোধ, যে চোর সেই সাধু। নিত্য নিত্য শিয়াল সিংহের সঙ্গে যুদ্ধ করে, — ঢেণ্ঢণ পাদের এই গান বিরলে বোঝ।'

যোগসাধনার দিক হতে এখানে 'টিলা' হল মহাসুখ-চক্র, প্রতিবেশী হল চন্দ্রসূর্য-রূপ দ্বৈতাভাস (বা পার্শ্বস্থ দুই নাড়ী) ; 'হাঁড়ি' হল দেহভাণ্ড, 'ভাত' হল 'সংবৃত্তি-বোধিচিত্ত'— 'ব্যঙ্গ' হল অঙ্গশূন্য (বিগতাঙ্গ) প্রভাস্বর বিজ্ঞান। 'দুহিল দুধ' হল বোধিচিত্ত—'বাঁট' হল মহাসুখচক্র-পথ। 'বলদ' হল প্রকৃতি-দোষাশ্রিত অবিদ্যাচিত্ত, 'গাভী' হল নৈরাত্মা ; 'পীঠ' হল আভাসদোষ বা প্রকৃতিদোষ, দোহন শব্দের তাৎপর্য নিঃস্বভাবীকরণ। 'বুধী' অর্থ মনেন্দ্রিয়-প্রধান বালযোগী, চোর অর্থ হল প্রকৃতিদোষ হরণকারী। 'শৃগাল' হল অপরিশুদ্ধ চিত্ত — আর সিংহ হল প্রভাস্বরবিশুদ্ধ চিত্ত। ঢেণ্ঢণপাদের এই পদটির সঙ্গে আমরা কবীরের নিম্নলিখিত পদের আশ্চর্য মিল লক্ষ্য করতে পারি। —

কৈসেঁ নগরি করৌ কুটবারী।
চঞ্চল পুরিষ বিচষণ নারী ॥
বৈল বিয়াই গাই ভঈ বাঁঝ।
বছরা দুহৈ তীন্যূঁ সাঁঝ ॥
মকড়ী ধরি মাষী ছছি হারী।
মাস পসারী চীহ্ন রখবারী ॥
মূসা খেবট নাব বিলইয়া।
মীড়ক সোবৈ পহরইয়া ॥
নিত উঠি স্যাল স্যংঘসূ ঝূঝৈ।
কহৈ কবীর কোঈ বিরলা বূঝৈ ॥

'কি করিয়া সেই নগর রক্ষা করি যেখানে চঞ্চল হইল পুরুষ — আর বিচক্ষণ হইল নারী। বলদ বিয়াইয়াছে, গাভী হইল বন্ধ্যা, বাছুরকে দোহান হয় তিন সন্ধ্যা। মাকড়সা মাছিকে ধরিল—সে (ছাড়াইতে) চেষ্টা করিল এবং হারিল। মাংসের প্রহরী চিল রাখা হইয়াছে। মুষিক হইল নাবিক, বিড়াল নৌকা, সাপের পাহারায় ব্যাঙ শোয়। নিত্য উঠিয়া শিয়াল সিংহের সঙ্গে করে যুদ্ধ, — কবীর কহে, কেহ কেহ বিরলে বোঝে ॥'

কবীরের এই জাতীয় কবিতাকে সাধারণত 'উল্টাওয়াঁসী' (উল্টাবাঁসী) বলা হয়। যেখানে মায়া জীবকে বা পুরুষকে পরাভূত করেছে, সেখানকার অসঙ্গতি প্রকাশ করবার জন্যই কবীর সাধারণত এই-জাতীয় উল্টাওয়াঁসীর প্রচুর ব্যবহার করেছেন। নীচে

কবীরের এই জাতীয় আর একটি উল্টাওয়াঁসী উদ্ধৃত করছি।—

এক অচংভৌ সুনহু তুম ভাঈ।
দেখত সিংহ চরাবত গাঈ ॥
জলকী মছুলী তরবর ব্যাঈ।
দেখত কুতরা লৈ গই বিলাঈ ॥
তলেরে বৈসা উপর সূলা।
তিসকৈ পেড় লগে ফলফূলা ॥
ঘোঁরৈ চঢ়ি ভৈস চরাবন জাঈ।
বাহর গৈল গোনি ঘর আঈ ॥
কহত কবীর জো ইস পদ্ বূঝৈ।
রাম রমত তিসু সব কিছু সূঝৈ ॥

'এক আশ্চর্য শোন তুমি ভাই, একটা গাইকে দেখিলাম সিংহকে চরাইতে। জলের মাছ গাছে উঠিল, একটা কুত্তা তাকাইয়া আছে সেই ভাবেই একটা বিড়াল সেগুলিকে (মাছগুলিকে) লইয়া গেল। গাছের নীচেও আপদ — উপরে শূল, — সেই গাছেই দেখা দিতেছে কত ফুলফুল ; ঘোড়ায় চড়িয়া মহিষ চরাইতে চায়, — বাহিরে রহিল বলদ — বোরাগুলি ঘরে ফিরিল। কবীর কহে, যে এই পদ বুঝে তাহার ভিতরে রমণ করেন রাম — সব কিছুই বুঝিতে পারে সে।'

কবীরের রচনার মধ্যে এ জাতীয় রচনা বহু ; সুতরাং আর উদ্ধৃত করে লাভ নাই। সুন্দর-দাসের রচনার মধ্যেও ঠিক এই জাতীয় রচনা বহু মেলে। সুন্দর-গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'অথ পূরবী ভাষা বরবৈ,' 'অথ বিপর্যয় শব্দ কৌ অঙ্গ,' 'অথ বিপর্যয় কৌ অঙ্গ' — এই জাতীয় রচনায় ভরা।

বাঙলা এবং হিন্দি নাথসাহিত্যের মধ্যে এই উল্টাধারার গানের খুব প্রাচুর্য। গুরু মীননাথকে সচেতন করবার জন্য গোরখনাথ যে সকল গান করেছেন তা সবই ধাঁধাঁয় ; তা থেকেই 'গোরখধাঁধা' কথাটির অদ্যাবধি এত প্রসিদ্ধি। বাঙলা 'গোরক্ষবিজয়'-এ দেখি, মীননাথকে লক্ষ্য করে গোরখনাথ বলছেন,—

পখরীতে পানী নাই পাড় কেন ডুবে।
বাসা ঘরে ডিম্ব নাই ছাও কেন উড়ে ॥
নগরে মনুষ্য নাহি ঘরে ঘরে চাল।
আন্ধলে দোকান দিয়া খরিদ করে কাল ॥

'গোপীচন্দ্রের গান'-এ দেখতে পাই, বুড়া শিব 'উল্টামন্ত্রে' নৌকাপূজা করছেন। 'গোরক্ষবিজয়'-এর ভূমিকাতেও সম্পাদক একটি কৌতূহলোদ্দীপক গান সংগ্রহ করে দিয়েছেন।

গুরু মীননাথরে উল্টা উল্টা ধারা
পুকুর মুরে ধান শুকাইয়া উগারতলে বাড়া ॥
... .
গুরু হে একটি কথা শুনিয়া আইলাম ত্রিপিনীর ঘাটে।
মরা মানুষে ভাত রান্ধে জীতা মানুষের পেটে ॥

ইত্যাদি।

সহদেব চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গলেও গোরখনাথের গুরু মীননাথের উদ্দেশে এইরূপ একটি উল্টাধারার গান দেখতে পাই।—

গুরুদেব, নিবেদি তোমার রাঙ্গা পায়।
পুতকীর দুগ্ধে সিন্ধু উথলিল, পর্বত ভাসিয়া যায় ॥
গুরু হে বুঝহ আপন গুণে।
শুষ্ক কাষ্ঠ ছিল পল্লব মুঞ্জরিল,
পাষাণ বিঁধিল ঘুণে ॥
ইত্যাদি।

এই-জাতীয় গান পূর্ববঙ্গের পল্লী-অঞ্চলে এখনও খুব শুনতে পাওয়া যায়। কোনও-কোনও অঞ্চলে এই জাতীয় যোগাশ্রিত উল্টাধারার গান 'উল্টা-বাউলের গান' বলে প্রসিদ্ধ। এই-জাতীয় গান আজকাল যে রূপ পরিগ্রহ করেছে তাতে সব পদেই যে খুব কোনও-একটা যোগসাধনার গূঢ়ার্থ নিহিত আছে, এ-কথা বলা যায় না। তবে লক্ষ্য করলে মাঝে-মাঝে সাধনার ইঙ্গিত লাভ করা যায়।

বৈষ্ণব সহজিয়াগণ এবং বাউলগণও এই উল্টাধারার গান রচনা করতেন। চণ্ডীদাসের নামে যে সকল সহজ-সাধনার পদ আছে তা অনেকই গূঢ়ার্থ-ব্যঞ্জক। 'সহজ'-এর অতীন্দ্রিয় স্বরূপকে যেমন ধাঁধার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে, তেমনই 'সহজ-সাধনা'র কাঠিন্যকেও নানা উল্টা দৃষ্টান্তের দ্বারা বোঝান হয়েছে। যেমন,—

মৃত্তিকা উপরে জলের বসতি
তাহার উপরে ঢেউ।
তাহার উপরে পীরিতি বসতি
তাহা কি জানয়ে কেউ ॥

আবার,—

প্রেমের মাঝারে পুলকের স্থান
পুলক উপরে ধারা।
ধারার উপরে ধারার বসতি
এ সুখ বুঝয়ে কারা ॥
ফুলের উপরে ফুলের বসতি
তাহার উপরে গন্ধ।
গন্ধ উপরে এ তিন আখর
এ বড় বুঝিতে ধন্ধ ॥

প্রেম-সাধনা সম্বন্ধে বলা হয়েছে —

গোপন পিরীতি গোপনে রাখিবি
সাধিবি মনের কাজ।
সাপের মুখেতে ভেকেরে নাচাবি
তবে ত রসিকরাজ ॥

যে জন চতুর　　　　　সুমেরু-শিখর
সূতায় গাঁথিতে পারে।
মাকসার জালে　　　　　মাতঙ্গ বাঁধিলে
এ রস মিলয়ে তারে ॥

এই প্রসঙ্গে আমরা স্মরণ রাখতে পারি, মৈথিলী কবি বিদ্যাপতির নামেও বহুসংখ্যক প্রহেলিকা পদ রয়েছে — তা অবশ্য কোনও গুহ্য-সাধন সম্বন্ধীয় নয়।

চর্যাপদের প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ

সাহিত্য সর্বদাই সমাজ-জীবনের প্রতিচ্ছবি — তা শুধু আজকের দিনে নয়, হাজার বৎসর পূর্বের দিনেও। হাজার বৎসর পূর্বে আমাদের বাঙলায় যে সকল সাহিত্য রচিত হয়েছে সেই সকল দোঁহা ও চর্যাপদগুলির ভিতরেও সেই হাজার বৎসরের প্রাচীন বাঙলাদেশ ও বাঙালি জাতির পরিচয় নানাভাবে ছড়িয়ে রয়েছে। এই সকল দোঁহাকার এবং গীতিকারগণ ধর্ম-অবলম্বনে সাহিত্য রচন' করলেও তাঁদের ভিতরে যে সত্যকার সাহিত্য-প্রতিভা ছিল বহু স্থানে তার প্রমাণ রয়েছে। ধর্মমতের ভিতরে আছে চিন্তা ও অনুভূতি—দুই-ই অমূর্ত ; এই অমূর্তকে মূর্ত করে তুলতে না পারলে সাহিত্য হয় না। তা করতেই চাই রূপক, চাই অন্যান্য অলংকার। জীবন ও তার পারিপার্শ্বিকের রূপ ব্যতীত রূপক তার রূপ পাবে কোথায়? অতএব তৎকালীন বাঙালি-জীবন এবং তার পারিপার্শ্বিক বাঙলা দেশকে পদে-পদে এই দোঁহা-গানগুলির ভিতরে আসতে হয়েছে। দর্শনের জটিলতম তত্ত্ব, সাধনার সূক্ষ্মতম অনুভূতিগুলিকেও প্রকাশ করতে হয়েছে স্থূলজীবনের চিত্রে ও ভাষায়।

চর্যাপদকে আমরা যখন বাঙলা সাহিত্য বলে আলোচনা করব তখন সর্বপ্রথমে ব্রিটিশ সরকার তাঁর শাসনকার্যের পরিচালনার জন্য ইচ্ছামত শিকল টেনে পূর্বে-পশ্চিম এবং উত্তরে দক্ষিণে বাংলাদেশের যে সীমারেখা স্থির করে দিয়েছেন, তাকে সম্পূর্ণ ভুলে যেতে হবে। আমি এখানে প্রাচীন বাঙলার ভৌগোলিক সীমানা-নির্ধারণ-রূপ গবেষণার অবতারণা করতে চাই না, তবে যে সকল তথ্য পাওয়া যায় তা থেকে মোটের উপরে বলা যায়, চর্যাপদের ভিতরে প্রতিফলিত হয়েছে যে বাঙলাদেশ তা নিম্ন ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিম পার থেকে আরম্ভ করে উড়িষ্যার কিয়দংশ, বর্তমান বিহারের কিয়দংশ এবং কামরূপ বা বর্তমান আসামের কিয়দংশ নিয়ে একটি বৃহৎ ভূভাগ। এই সত্যটি বিস্মৃত হয়ে চর্যাপদের আলোচনায় আমরা অনেক বিতর্কের সৃষ্টি করেছি। চর্যার ভাষাতত্ত্বের আলোচনা করে কেউ-কেউ বলেছেন এগুলি প্রাচীন ওড়িয়া, কেউ বলেছেন প্রাচীন বিহারী, কেউ বলেছেন প্রাচীন মৈথিলী, কেউ বলেছেন এগুলি খাঁটি প্রাচীন বাঙলা। কিন্তু এই সকল বিতর্কের অবসান হয় চর্যার ভাষার একটি পরিচয় দিলে—সে পরিচয় এই, এটি দশম থেকে দ্বাদশ শতকের 'বৃহত্তর গৌড়'-এর ভাষা।

চর্যাপদগুলির আলোচনা করতে হলে বৌদ্ধ সহজিয়া দোঁহাগুলিরও একই সঙ্গে আলোচনা করা উচিত, কারণ এই দোঁহাগুলিও 'বাঙলা-সাহিত্য'। এখানে বাঙলা সাহিত্য কথাটি আমি 'বাঙলা ভাষায় লিখিত সাহিত্য'—এই সংকীর্ণ অর্থে গ্রহণ না করে 'বাঙলার সাহিত্য', অর্থাৎ বাঙলা দেশে বাঙালি কবিগণ-কর্তৃক একই কবিমানস নিয়ে লেখা সাহিত্য— এই অর্থে গ্রহণ করেছি। আমরা দেখি, যাঁরা চর্যাকার ছিলেন খুব সম্ভব তাঁরা অনেকেই পশ্চিমী অপভ্রংশে এই দোঁহাগুলি রচনা করেছেন । বিষয়বস্তু এবং প্রকাশভঙ্গী একই । এইরূপ দুই ভাষা প্রয়োগের কারণ কি? ভাষাতাত্ত্বিক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এ-সম্বন্ধে বলেছেন, তৎকালীন রাজপুত রাজপরিবারগুলির আভিজাত্যের ফলে এই পশ্চিমী অপভ্রংশ একটা সর্বভারতীয় আভিজাত্য লাভ করেছিল, এই কারণেই বাঙালি কবিগণও পশ্চিমী অপভ্রংশে

দোঁহা রচনায় প্রলুব্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে এই পশ্চিমী রাজবংশীয় আভিজাত্যই প্রধান কথা বলে মনে হয় না। আমার মনে হয়, এই দোঁহা রচনার সাহিত্যিক ঢঙটি একটি পশ্চিমী ঢঙ, এবং এই সাহিত্যিক ঢঙটি এবং তৎসঙ্গে তার ভাষাটি জনসমাজে প্রসিদ্ধি এবং প্রিয়তা লাভ করেছিল ; সেই জন্যই বাঙালি কবিগণও দোঁহা রচনায় আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং দোঁহা রচনা করতে গিয়ে তার ভাষাকেও গ্রহণ করেছেন। এইরূপ এক-একটি সাহিত্যিক ঢঙ ও ভাষা এক-এক সময়ে যে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে, ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে তার বহু নিদর্শন আছে। পালি-সাহিত্যের ভিতরে আমরা যে 'গাথা' পাই তার ভাষা সংস্কৃতও নয় কোনও বিশেষ প্রাকৃতও নয়। আসলে মনে হয়, ওটা কোনো স্থানীয় ভাষা নয় — একটা জনপ্রিয় সাহিত্যিক ভাষা, পরবর্তী কালের আমাদের 'ব্রজবুলী' ভাষার কথাও এই প্রসঙ্গে স্মরণ করতে পারি : এটি মিথিলার ভাষাও নয়, মধ্যবর্তী কোনো জনপদের ভাষাও নয়, আসলে ওটি একটা জনপ্রিয় সাহিত্যিক ভাষা — একটা বিশেষ জাতীয় সাহিত্যের বাহনরূপেই তার উদ্ভব ; এই জন্যই উড়িষ্যায়, মিথিলায়, বাঙলায়, যেখানেই যিনি এই বিশেষ জাতীয় সাহিত্য-রচনায় প্রণোদিত হয়েছেন তিনিই এই বিশেষ ভাষাটিকেও কমবেশি গ্রহণ করতে প্রলুব্ধ হয়েছেন।

চর্যাকারগণ বৌদ্ধ সহজিয়া ছিলেন। সত্য-উপলব্ধির জন্য এই বৌদ্ধ সহজিয়াগণের একটি বিশেষ সাধনা ছিল — সেই বিশেষ সাধনার পথকেই তাঁরা সহজ পথ বলতেন ; অন্য সকল পথই তাঁদের মতে বক্র বা কুটিল। বাঁকা পথ শুধু ভুলায়, সত্যকে লাভ করতে দেয় না। এইজন্য সহজিয়াগণ তাঁদের নিজস্ব দৃষ্টিতে তৎকালীন প্রচলিত এদেশের অন্য সকল ধর্মকেই নানাভাবে সমালোচনা করেছেন। এই সমালোচনার প্রসঙ্গেই আমবা এদেশে প্রচলিত ধর্মমত- সকলের একটা আভাস পাই।

চর্যাপদে ও দোঁহাবলীতে বেদধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা যায় । অবশ্য দু এক স্থানে যে 'বেদাগম'-এর উল্লেখ পাওয়া যায় সেখানে বেদ ঠিক বেদ নয়—সেখানে তা ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রামাণ্য শাস্ত্ররাশিব প্রতিনিধি । যেমন —

জাহের বাণচিহ্ন রুব ণ জাণী ।
সো কইসে আগম বেএঁ বখাণী ॥ (চর্যা ২৯)

"যাহার (যে সহজ স্বরূপের) বর্ণ চিহ্ন রূপ জানা যায় না, তাহা কিরূপে আগম-বেদে ব্যাখ্যাত হইবে ?'

বাঙলাদেশ কোন দিনই বৈদিকধর্মের দেশ নয়, বেদাচার-শাসিত ব্রাহ্মণ্যধর্মের বাঙলাদেশে আগমন অনেক পরবর্তী কালে। গুপ্তসাম্রাজ্যের সময় থেকে বাঙলাদেশের আর্যীকরণ আরম্ভ হলেও ঠিক বেদবিধি বাঙলাদেশে কোন দিনই খুব প্রসার এবং প্রতিষ্ঠা লাভ করে নি। তবে দশম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে উচ্চশ্রেণীর অভিজাত বর্ণহিন্দুগণ পশ্চিমদেশ থেকে ক্রিয়ান্বিত ব্রাহ্মণ আনিয়ে যাগ-যজ্ঞাদি নিষ্পন্ন করাতেন এবং বেদপাঠ করাতেন—এরূপ প্রমাণ তৎকালীন ঐতিহাসিক তথ্য এবং কিংবদন্তী উভয়ের ভিতরেই পাওয়া যায়। এইরূপ বৈদিক যজ্ঞের প্রচলন কিছু-কিছু যে এদেশে তখন ছিল, তার আভাস সরহপাদের নিম্নোক্ত দোঁহাগুলির ভিতরেই পাওয়া যাবে।—

বম্হাণো হি ম জানন্ত হি ভেউ।
এবই পঢ়িঅউ এ চ্চউবেউ ॥

মন্ত্রী [পাণী কুস লই পড়ন্তঁ।
ঘরহিঁ বইসী] অগ্‌গি হুণন্তঁ ॥
কজ্জে বিরহিঅ হুঅবহ হোমেঁ।
অক্‌খি উহাবিঅ কড়ুএঁ ধুমেঁ ॥

'ব্রাহ্মণেরা সত্যকার ভেদ জানে না, এই ভাবেই চতুর্বেদ পঠিত হয়। তাহারা মাটি-জল-কুশ লইয়া (মন্ত্র) পড়ে, ঘরে বসিয়া অগ্নিতে আহুতি দেয়; কার্যবিরহিত (ফলহীন) অগ্নি-হোমের ফলে শুধু কটুধুমের দ্বারা চোখ পীড়িত হয়।'

এই প্রসঙ্গে সরহপাদ দণ্ডী সন্ন্যাসিগণেরও উল্লেখ করেছেন। —

একদণ্ডী ত্রিদণ্ডী ভঅবঁবেসেঁ।
বিণুআ হোইঅই হংসউএসেঁ ॥
মিচ্ছেহিঁ জগ বাহিঅ ভুল্লে।
ধম্মাধম্ম ণ জাণিঅ তুল্লে ॥

'একদণ্ডী ত্রিদণ্ডী প্রভৃতি ভগবদ্‌বেশে (সবাই) ঘুরিয়া বেড়ায় -- হংসের (পরমহংসের) উপদেশে জ্ঞানী হয় ; মিথ্যাই জগৎ ভ্রমের বশে বাহিত হয়, তাহারা ধর্মাধর্ম তুল্যরূপেই জানে না।'

শাস্ত্রাভিমানী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের উল্লেখ বহু স্থানে পাওয়া যায় ; ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর প্রভৃতি দেবগণের পূজায় বিশ্বাসী হিন্দুগণের উল্লেখও পাওয়া যায় ; কিন্তু সাধারণ হিন্দুধর্মের যে উল্লেখ পাওয়া যায় তা ব্যতীতও কতগুলি বিশেষ-বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ের যে উল্লেখ পাওয়া যায় তাই এখানে লক্ষণীয়।

এই সময়ে বাঙলা দেশে বৌদ্ধধর্মের যথেষ্ট প্রসার এবং প্রতিষ্ঠা। বস্তুতই এটি বাঙলা দেশের হিন্দুবৌদ্ধ যুগ — কোন ধর্ম যে প্রবলতর ছিল তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। কিন্তু এই যুগে জৈনধর্মেরও বাঙলাদেশে যে প্রসার ছিল, সে কথা উপেক্ষণীয় নয়। খ্রীষ্টীয় দশম শতকের বহু পূর্বেই যে পশ্চিমবঙ্গে এবং উত্তরবঙ্গে জৈনদের কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল তার প্রমাণ রয়েছে। কথিত আছে, স্বয়ং মহাবীর রাঢ়দেশে ভ্রমণে এসেছিলেন — রাঢ়ে অসভ্য লোকেরা তাঁর দিকে কুক্কুর লেলিয়ে দিয়েছিল। হিউয়েন্ সাঙ উত্তর, দক্ষিণ এবং পূর্ব-বঙ্গে অনেক নির্গন্থ (জৈন) দেখেছিলেন ; পুণ্ড্রবর্ধন এবং সমতটে দিগম্বর জৈন সন্ন্যাসীদের প্রাচুর্য ছিল। সরহপাদের দোঁহাগুলি পড়লে মনে হয়, এই যুগেও বাঙলা দেশের ঘাটে-পথে অনেক জৈন ক্ষপণক যোগীর দেখা মিলত। এঁদের বর্ণনা করতে সরহপাদ বলেছেন —

দীহ্‌ণক্‌খ জই মলিণেঁ বেসেঁ।
ণগ্‌গল হোই উপাড়িঅ কেসেঁ ॥
খবণেহি জাণ বিড়ংবিঅ বেসেঁ।
অপ্পণ বাহিঅ মোক্‌খ উবেসেঁ ॥

'দীর্ঘনখ যোগী মলিন বেশে নগ্ন হইয়া কেশ উৎপাটিত করে। ক্ষপণকেরা পথভ্রান্ত বেশে মোক্ষের উদ্দেশে নিজেদের বহিয়া লইয়া চলে।'

দিগম্বর জৈন সন্ন্যাসীদের কতগুলি বিশেষ বিশ্বাস এবং আচার-অনুষ্ঠান ছিল। তাঁরা নগ্ন থাকতেন বলে তাঁদের নাম দিগম্বর। তাঁদের বিশ্বাস, তীর্থংকরগণ আহার ব্যতীতই বেঁচে

থাকেন ; তাঁরা হাতে ময়ূরপুচ্ছের ঝাড়ন বা পশুপুচ্ছের চামর বহন করেন, দুই হাতে মাথার কেশ উৎপাটন করেন। এঁদের লক্ষ্য করেই সরহপাদ বলেছেন —

জই ণগ্‌গা বিঅ হোই মুত্তি তা সুণহ সিআলহ।
লোমুপাড়ণেঁ অখি সিদ্ধি তা জুবই নিতম্বহ ॥
পিচ্ছীগহণে দিঠ্‌ঠ মোক্‌খ [তা মোরহ চমরহ]।
উঞ্ছেঁ ভোঅণেঁ হোই জাণ তা করিহ তুরঙ্গহ ॥

'যদি নগ্ন হইলেই মুক্তি হইত তাহা হইলে কুকুর-শিয়ালেরও মুক্তি হইত ; লোমোৎপাটনে যদি সিদ্ধি থাকে ত যুবতীর নিতম্বের সিদ্ধি ; পুচ্ছ গ্রহণেই যদি মোক্ষ দেখা যাইত তবে ময়ূর-চামরেরও মোক্ষ হইত ; উচ্ছিষ্টভোজনে জ্ঞান হইলে জ্ঞান হইত হাতি-ঘোড়ার।'

বাঙলাদেশে মহাযান বৌদ্ধধর্মেরই প্রাধান্য — হীনযানের যে কোনই প্রভাব ছিল না তা নয়। আমরা দোঁহাগুলির ভিতরে থেরবাদী বৌদ্ধগণের উল্লেখ পাই। থেরবাদিগণ সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

চেল্লু ভিক্‌খু জে স্থবির-উএসেঁ ।
বন্দেহিঅ পব্বজ্জিউ বেসেঁ ॥
কোই সুতন্তবক্‌খাণ বইট্‌ঠো।
কোবি চিন্তে কর সোসই দিট্‌ঠো ॥

'চেল্ল (দশশিক্ষাপদী) এবং ভিক্ষু (কোটিশিক্ষাপদী) যাহারা — স্থবিরের উপদেশে প্রব্রজ্যার বেশ বন্দনা করে ; কেহ সূত্রান্তব্যাখ্যান করিয়া বসিয়া থাকে (দ্রব্যাদি লোভে), কেউ-বা দেখিয়া দেখিয়া সর্বধর্ম (গ্রহণ) করে চিত্তে।'

অন্যদিকে একদল ধাবিত হচ্ছে মহাযানের দিকে — সেখানে আছে আগম আর তর্কশাস্ত্র। কেউ ভাবে মণ্ডলচক্র — অন্যে কবে চতুর্থতত্ত্বের উপদেশ। —

অণ্ণ তহি মহাজাণহিঁ ধাবই ।
তহিঁ সুতন্ত তক্কসথ হুই ॥
কোই মণ্ডলচক্ক ভাবই ।
অণ্ণ চউত্থতত্ত দীসই ॥

এই সকল প্রচলিত বৌদ্ধধর্মেরও বিরুদ্ধে ছিলেন সহজিয়ারা, তাই ধ্যান-ধারণা এবং সমাধির সাধনার পথে অগ্রসর হন নি তাঁরা। ধ্যান-সমাধিতে সুখদুঃখের পরানিবৃত্তি নেই, তাই পূর্ববর্তীদের লক্ষ্য করে তাঁরা বলেছেন —

সঅল সমাহিঅ কাহি করিঅই ।
সুখ দুখেতেঁ নিচিত মরিঅই ॥ (চর্যা, ১)

মহাযান বৌদ্ধধর্ম এই সময়ে মন্ত্রযানের ভিতর দিয়ে বজ্রযানে রূপান্তরিত হয়েছিল। কিন্তু এই মন্ত্রতন্ত্র, ধারণী-জপেও তাঁদের মন ছিল না, এই সমস্ত-কিছুর বিরুদ্ধেও বহু স্থানে তাঁরা বহু ভাবে বিদ্রোহ জানিয়েছেন।

বহু প্রকারের যোগি-সম্প্রদায়ের উল্লেখ পাই এই গান ও দোঁহাগুলিতে। সরহপাদ বলেছেন তাঁর দোঁহায় —

অইরিএহিঁ উদ্দূলিঅ চ্ছারেঁ।
সীসসু বাহিঅ এ জড়ভারেঁ ॥

ঘরহীঁ বইসী দীবা জালী।
কোণহিঁ বইসী ঘণ্টা চালী ॥
অক্‌খি নিবেসী আসণ বন্ধী।
কণ্ণেহি খুসুখুসাই জণ ধন্ধী ॥

'আর্য যোগিগণ ছাই মাখে দেহে, মাথায় বহে জটাভার, ঘরে বসিয়া দীপ জ্বালে, কোণে বসিয়া ঘণ্টা চালে ; চোখ বুজিয়া আসন বান্ধে এবং কান খুসখুস করিয়া জনসাধারণকে ধাঁধে।'

এই যুগে তান্ত্রিক কাপালিক-ধর্মের বিশেষ প্রসার ছিল মনে হয়। সহজিয়াগণও অনেক সময় কাপালিক যোগী হতে চেয়েছেন। অবশ্য এঁদের কাপালিক আদর্শ প্রচলিত কাপালিক আদর্শ থেকে অনেকটা পৃথক্ ছিল ; এঁদের মতে 'কং মহাসুখং পালয়তীতি কাপালিকঃ'—অর্থাৎ মহাসুখকে পালন করে যে সেই কাপালিক। এই আদর্শ নিয়ে কাপালিক হতে গিয়ে তাঁরা বলেছেন,

আলো ডোম্বি তোএ সম করিবে ম সাঙ্গ ।
নিঘিণ কাহ্নু কাপালি জোই লাগ ॥
... ...
তু লো ডোম্বী হাউঁ কপালী।
তোহোর অন্তরে মোএ ঘলিলি হাড়েবি মালী ॥

'আলো ডোম্বি, তোর সহিত আমি করিব সঙ্গ, — এই জন্য নিঘৃণ কাহ্ন হইয়াছে নগ্ন কাপালী যোগী। তুই হইতেছিস ডোম্বী, আমি কপালী, তোর জন্য আমি গ্রহণ করিয়াছি হাড়ের মালা।' সহজিয়া মতে, এই কাপালী যোগী ও ডোম্বীর মিলনের তাৎপর্য যা তা আমি স্থানান্তরে বিশদ ভাবে আলোচনা করেছি ; এখানে শুধু লক্ষণীয়, সহজিয়াদের চারিদিকে যে কাপালিক ধর্ম প্রচলিত তার রূপটি। অন্য-একটি পদেও কাহ্নুপাদ নিজের সহজিয়া যোগের বর্ণনা-প্রসঙ্গে কাপালী যোগীর চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন—

নাড়ি শক্তি দিঢ় ধরিঅ খট্টে ।
অনহা ডমরু বাজই বীরনাদে ॥
কাহ্ন কপালী যোগী পইঠ অচারে ।
দেহ নঅরী বিহরই একাকারেঁ ॥
আলিকালি ঘণ্টা নেউর চরণে ।
রবিশশী কুণ্ডল কিউ আভরণে ॥
রাগদ্বেষ মোহ লাইঅ ছার ।
পরম মোখ লবএ মুক্তাহার ॥
মারিঅ সাসু নণন্দ ঘরে শালী ।
মাঅ মারিআ কাহ্ন ভইল কবালী ॥ (চর্যা, ১১)

'নাড়ীশক্তি রূপ খাট দৃঢ় করিয়া ধরা হইল ; অনাহত ডমরু বীরনাদে বাজে । কাহ্ন কাপালী যোগী আচারে প্রবেশ করিল, এবং দেহনগরী একাকারে বিহারে করে । আলি কালি ঘণ্টা ও নূপুর তাহার চরণে, রবিশশীকে কুণ্ডল আভরণ করিল। রাগদ্বেষ মোহের ছাই লইয়া সে পরম মোক্ষরূপ মুক্তাহার লভে। ঘরে শাশুড়ী ননদ শালীকে মারিয়া, মাকে মারিয়া কাহ্ন কাপালী হইল।'

এখানকার সব সাধন-রহস্য বাদ দিয়ে মোটামুটি জানতে পারি, কাপালী যোগীরা বীরনাদে

ডমরু বাজাতেন, একা-একা বিচরণ করতেন, পায়ে ঘণ্টা- নূপুর এবং কর্ণে কুণ্ডল দিতেন, গায়ে ছাই মাখতেন,ঘরের আত্মীয়-পরিজন সব ত্যাগ করে যোগী হতেন।—পুরুষেরা যেমন এইরূপ সব ত্যাগ করে কাপালী যোগী হতেন, নারীরাও সেইরূপ 'স্বামী খাইয়া' যোগিনী সাজতেন, তারও আভাস আছে। যেমন সরহপাদের একটি দোঁহা—

ঘরবই খজ্জই সহজে রজ্জই কিজ্জই রাঅ বিরাঅ ।
ণিঅপাস বইট্‌ঠী চিত্তে ভট্‌ঠী জোইণি মহু পড়িহাঅ ॥ (চর্যা ৮৫)

'গৃহপতিকে খায়, সহজে বিরাজ করে, রাগ-বিরাগ করে ; নিজপাশে বসিয়া চিত্তে ভ্রষ্টা যোগিনী আমার নিকট প্রতিভাত হয়।'

দোঁহা এবং চর্যাপদগুলির ভিতরে আর-এক শ্রেণীর যোগীর উল্লেখ পাওয়া যায়, এঁরা প্রাচীন রসসিদ্ধ। এই রসসিদ্ধ সম্প্রদায়ই নাথসিদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রাচীন রূপ। .....প্রাচীন ভারতীয় রসায়ন-মত হতেই এই রসসিদ্ধ-মতের উৎপত্তি। এঁরা মৃত্যুর পরে মুক্তিলাভ বিশ্বাস করতেন না, জীবন্মুক্তির সাধক ছিলেন। রসায়নের সাহায্যে এই স্থূল দেহকেই সিদ্ধদেহে এবং সিদ্ধদেহকে দিব্যদেহে পরিণত করে এঁরা অবিনাশী হতে চাইতেন। এই অবিনাশিত্ব লাভই যোগীর মৃত্যুঞ্জয় শিবত্ব লাভ। তাই তাঁদের প্রথম সাধন ছিল রসায়নের সাহায্যে কায়সিদ্ধি লাভ করা। রসসিদ্ধাদের 'রাসায়নিক রস' (পারদ)-এর স্থান গ্রহণ করল নাথসিদ্ধাদের সহস্রারস্থ চন্দ্র হতে ক্ষরিত সোমরস।

রস-রসায়নের সাহায্যে মুক্তিলাভ সম্ভব — এইরূপ বিশ্বাসী প্রাচীন যোগিসম্প্রদায়ের উল্লেখ আমরা পতঞ্জলির যোগসূত্রের ভিতরেও পাই। পতঞ্জলি বলেছেন — 'জন্মৌষধি-মন্ত্র-তপঃ-সমাধিজাঃ সিদ্ধয়ঃ' — অর্থাৎ সিদ্ধিসকল জন্ম-হেতু, ঔষধি হতে, মন্ত্র, তপঃ এবং সমাধি হতে সম্ভব হয়। এই ঔষধি হতে সিদ্ধি সম্বন্ধে ব্যাসভাষ্যে বলা হয়েছে — 'ঔষধিভিঃ অসুরভবনেষু রসায়নেত্যেবমাদি'। এব ব্যাখ্যায় বাচস্পতিও বলেছেন যে, এই ঔষধি দ্বারা সিদ্ধিলাভ-অর্থ রসায়নের সাহায্যে সিদ্ধিলাভ। এই মতটিই নাথসিদ্ধাদের ভিতর দিয়ে দশম থেকে দ্বাদশ শতকের ভিতরে একটি বিশেষ শৈব মতবাদে পরিণত হয়েছিল । বাঙলা দেশেও সেই সিদ্ধসম্প্রদায়েব যথেষ্ট প্রসার এবং প্রসিদ্ধি লাভ হয়েছিল । বাঙলা দেশে প্রচলিত এই রসসিদ্ধদের বিরুদ্ধেও বৌদ্ধ সহজিয়াগণ কঠোর মত প্রকাশ করেছেন । এই রসায়নবাদী রসসিদ্ধাগণ জন্মও স্বীকার করতেন, মৃত্যুও স্বীকার করতেন, রস-রসায়নের সাহায্যে এই জন্মমৃত্যুর ঊর্ধ্বে উঠে শিবত্ব লাভ করতে চাইতেন । কিন্তু বৌদ্ধ সহজিয়াগণ আদৌ জন্ম এবং মৃত্যু স্বীকার করতেন না ; অস্তিত্ব-নাস্তিত্ববুদ্ধি উভয়ই বিকল্পজাত—সুতরাং যেখানে আসলে জন্মও নেই, মৃত্যুও নেই সেখানে রস-রাসায়নের দ্বারা কি হবে ? সরহপাদ একটি গানে বলেছেন—

অহ্মে ণ জাণহু অচিন্ত জোই ।
জাম মরণ ভব কইসণ হোই ॥
জইসো জাম মরণ বি তইসো ।
জীবন্তে মইলেঁ নাহি বিশেসো ॥
জা এথু জাম মরণে বিসঙ্কা ।
সো করউ রস রসানেরে কঙ্খা ॥

'অচিন্ত্যযোগী আমরা জানি না, জন্ম মরণ ভব কিরূপে হয়। যেরূপ জন্ম, মরণও তেমনি,

জীবন্ত ও মৃতের ভিতরে কোন বিশেষ (পার্থক্য) নাই । যাহারা এখানে জন্ম-মরণে বিশঙ্কিত তাহারাই করুক রস-রসায়নের আকাঙ্ক্ষা।'

এবার আমরা চর্যাপদে বর্ণিত তৎকালীন বাঙলার সমাজ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করব । সমাজ-ব্যবস্থার কথা আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই আসে জাতির প্রশ্ন । অবশ্য জাতি কথাটাকে আমরা race এবং caste এই উভয় অর্থেই ব্যবহার করি । বর্তমান প্রসঙ্গে শব্দটিকে আমি এর প্রাচীন racc অর্থেই গ্রহণ করছি ।

বাঙলা দেশ অনার্যপ্রধান দেশ। গুপ্ত সাম্রাজ্যের সময় থেকে, অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতক হতে বাঙলা দেশে ছিটেফোঁটা করে আর্য জাতি এবং তাদের ভাষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির আমদানি হতে থাকে। কিন্তু এই বহিরাগত উপাদান বাঙলা দেশে প্রকারে বা পরিমাণে কখনও এমন প্রধান হয়ে উঠতে পারে নি, যাতে সে স্থানীয় সকল উপাদানকে সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করে একেবারে রূপান্তরিত করে ফেলতে পারে। আজ পর্যন্তও বাঙালি জাতি এবং বাঙালির সভ্যতা-সংস্কৃতি তার একটা স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেছে। আর্য জাতি, সভ্যতা ও সংস্কৃতির অস্পষ্ট বিপুলায়তনের পিছনে বাঙালি জাতি, সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে গাধাবোটের মতন সর্বদা বেঁধে না দিয়ে তাকে তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে যদি একটু স্বতন্ত্র করে দেখতে পারি, তবে তাকে আমরা হয়ত আরও ভাল করে দেখতে পাব।

আর্য জাতির কিছু-কিছু লোকের আগমন ঘটেছিল বাঙলাদেশে। তৎপূর্বে যে-সমস্ত অনার্য জাতির বাস ছিল এই দেশে তাদের ভিতরে কোল জাতিই ঐতিহাসিকের চক্ষে প্রাধান্য লাভ করেছে । আজকের দিনেও আমাদের জাতি, সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে কোল উপাদান একটা প্রধান অংশ গ্রহণ করে আছে। এই আদিম কোলগণের ভিতরে শবর পুলিন্দ ডোম চণ্ডাল প্রভৃতি এই চর্যার যুগে সমাজের একটা বৃহৎ অংশ অধিকার করেছিল বলে মনে হয়। চর্যাগুলির ভিতরে সেইজন্যই তারা এত প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছে। চর্যাকারগণ নিজেরা একেবারে নিরক্ষর অসংস্কৃত সমাজের নিম্নস্তরের লোক ছিলেন বলে মনে হয় না — চর্যাগুলির ভিতরে তাদের উচ্চ শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রমাণ রয়েছে। তাঁদের চোখেও বারবার সাধনার সূক্ষ্মতত্ত্ব প্রকাশে এই শবর-পুলিন্দ-ডোম-চণ্ডালের কথা, তাদের বাসস্থান, চরিত্র এবং জীবন-যাত্রার কথা যখন এত প্রধান হয়ে উঠেছে, তখন বুঝতে হবে, এই সমস্ত লোকও তৎকালীন বাঙালি জাতির একটা বড় অংশ অধিকার করেছিল। কিন্তু তৎকালীন সমাজ-ব্যবস্থায় এই সমস্ত আদিম জাতিগুলি সভ্য নাগরিক জীবন থেকে অনেক দূরে সরে ছিল, এবং পরে এরাই যে সমাজের নিম্নস্তরে ভিড় করেছিল তার যথেষ্ট প্রমাণও এর ভিতরে পাওয়া যায়।

শবরদের কথা ও তাদের বিচিত্র জীবনযাত্রার কথা এই চর্যাপদগুলিতে নানাভাবে দেখতে পাই। এই শবর বাস করত বড়ো-বড়ো পাহাড়ের উত্তুঙ্গ শিখরে।

বরগিরিসিহর উত্তুঙ্গ মুণি সবরেঁ জহি কিঅ বাস। — কাহ্নপাদের দোঁহা, ২৫

শবরপাদের একটি গানে এই শবর-শবরীদের পার্বত্য জীবনের অতি চমৎকার একটি বর্ণনা পাই।

উঁচা উঁচা পাবত তহি বসই সবরী বালী ।
মোরঙ্গি পীচ্ছ পরহিণ সবরী গিবত গুঞ্জরী মালী ॥
উমত সবরো পাগল সবরো,মা কর গুলী গুহাড়া তোহোরি ।
ণিঅ ঘরিণী নামে সহজ সুন্দরী ॥

নানা তরুবর মৌউলিল রে গঅণত লাগেলী ডালী ।
একেলী সবরী এ.বণ হিণ্ডই কর্ণকুণ্ডলবজ্রধারী ॥
তিঅ ধাউ খাট পড়িলা সবরো মহাসুখে সেজি ছাইলী ।
সবর ভুজঙ্গ নৈরামণি দারী পেহ্ম রাতি পোহাইলী ॥
হিঅ তাঁবোলা মহাসুহে কাপুর খাই ।
সুন নৈরামণি কণ্ঠে লইআ মহাসুহে রাতি পোহাই ॥
গুরুবাক্ পুঞ্ছিআ বিন্ধ ণিঅমণ বাণে ।
একে শর সন্ধানেঁ বিন্ধহ পরম ণিবাণে ॥
উমত সবরো গরুআ রোষে ।
গিরিবর সিহর সন্ধি পইসন্তে সবরো লোড়িব কইসে ॥

'উঁচা উঁচা পর্বত, সেখানে বাস করে শবরী বালিকা ; ময়ূরের পাখা পরিধানে শবরী, গলায় গুঞ্জার মালা । ওগো উন্মত্ত শবর, ওগো পাগল শবর, গোলে ভুল করিও না, দোহাই তোমার — আমি তোমারই গৃহিণী, নামে সহজসুন্দরী। নানা তরু মুকুলিত হইল, গগনে লাগিল ডাল ; একেলা শবরী এ-বনে ঘুরিয়া বেড়ায় — কর্ণকুণ্ডলবজ্র ধারণ করিয়া। তিন ধাতুর খাট পাড়িল শবর, মহাসুখে বিছাইল শয্যা ; শবর ভুজঙ্গ এবং নৈরাত্মা স্ত্রী— উভয়ে প্রেমের রাত্রি পোহায়। হৃদয় তাম্বুল, মহাসুখে কর্পূর খায়, শূন্য নৈরামণি (নৈরাত্মা) কণ্ঠে লইয়া মহাসুখে রাত্রি পোহায়। গুরুবাক্য ধনু, নিজ মনরূপ বাণের দ্বারা বিদ্ধ, এক শরসন্ধানে পরম নির্বাণ বেঁধ। উন্মত্ত শবর গুরু রোষে, গিরিবরের শিখরসন্ধিতে করিতেছে প্রবেশ, শবর আবার ফিরিবে কি করিয়া?'

এখানে দেখছি, জনবসতি থেকে দূরে উঁচু পাহাড়ে শবর-শবরীর বাস — ময়ূরপুচ্ছ এবং গুঞ্জামালায় ছিল শবরীর প্রসাধন, কানে ছিল তার কুণ্ডল। ভোলানাথ শবর শবরীকে যেত ভুলে (নেশার ঝোঁকে), শবরীকে আবার তাকে ডেকে ঘর সামলাতে হত। ঘরের খাটিয়ায় পড়ত তাদের বিছানা, নিবিড় ছিল মিলন। তাম্বুল-কর্পূর মিলনের রসপরিপোষণ করত । শরধনু দিয়ে শিকারেই হত জীবিকা নির্বাহ। ক্রোধপরায়ণ শবর পর্বতকন্দরে চলে যেত অনেক দূরে, একা খুঁজত তাকে শবরী।

শবরপাদের অপর একটি গানে দেখতে পাই —

গঅণত গঅণত তইলা বাড়ী হিয়েঁ কুরাড়ী ।
কণ্ঠে নৈরামণি বালি জাগন্তে উপাড়ী ॥
... ...
হেরি সে মোর তইলা বাড়ী খসমে সমতুলা।
সুকড়এ সেরে কপাসু ফুটিলা ॥
... ...
কঙ্গুচিনা পাকেলা রে শবর-শবরী মাতেলা।
অনুদিন শবরো কিম্পি ন চেবই মহাসুহেঁ ভোলা ॥
চারিবাসে গড়িলারে দিআ চঞ্চালী।
তহিঁ তোলি শবরো ডাহ কএলা কান্দই সগুণ শিআলী ॥ (চর্যা ৫০)

'গগনে-গগনে লগ্ন বাড়ি, হৃদয়-কুঠারে তাহাকে উপাড়িয়া (ফেলিলে) কণ্ঠে নৈরামণি শবরী বালিকা জাগে। আমার সে গগন-সংলগ্ন বাড়ি আকাশের সমতুল

দেখিতেছি, কি সুন্দর তাহাতে কাপাস-ফুল ফুটিয়াছে। কাগনী পাকিয়া উঠিয়াছে — তাহাতে মাতিয়া উঠিয়াছে শবর-শবরী। অনুদিন শবর একটুও জাগে না, মহাসুখে ভোলা হইয়া আছে। চারিপাশে বাঁশের কঞ্চি দিয়া (বেড়া) গড়িল, তারপরে তুলিয়া শবর সব পুরিয়া লইল, শকুন-শিয়াল সব কাঁদে।'

এখানকার সকল তত্ত্বব্যাখ্যা ছেড়ে দেখি, পাহাড়ের উপরে প্রায় আকাশের কাছে ছিল শবর-শবরীর বাড়ি — চারিদিকে তার কাপাসের ফুল। কাগনী (ধান্যবিশেষ) ছিল তাদের প্রিয়তম খাদ্য, কাগনী পাকলে তাদের উৎসব — এই কাগনী তারা রক্ষা করত বাঁশের কঞ্চির বেড়া দিয়ে। পার্বত্য মাঠে শকুন-শিয়ালের ছিল উৎপাত, তারা শস্য নষ্ট করত — ঘরে এনে শস্য পুরে নিলেই নিশ্চিন্ত।

এই প্রসঙ্গে আর-একটি জিনিস লক্ষণীয়। চর্যাপদগুলির ভিতরে শুধু দুটি গান শবরপাদ কর্তৃক রচিত — সেই দুটি গানই শবর-শবরীর জীবন-যাত্রা নিয়ে। শবরপাদ নিজেও কি শবর জাতির লোক ছিলেন?

এই জনবসতি থেকে দূরে উচ্চভূমিতে বাসের কথা আরও দু-একটি পদে দেখতে পাই— যেমন, 'টালত মোর ঘর নাহি পড়িবেশী' -ইত্যাদি।

কোলজাতীয় লোকদেব প্রাচীন উল্লেখ পাওয়া যায় নিষাদরূপে। এই নিষাদগণের বৃত্তি ছিল ব্যাধবৃত্তি। ব্যাধের হরিণশিকারের সুন্দর বর্ণনা পাই কয়েকটি চর্যায়। ভুসুকুপাদের একটি কবিতায় পাই —

কাহেরে ঘেণি মেলি অচ্ছহু কীস।
বেঢ়িল হাক পড়অ চৌদীস ॥
অপণা মাংসে হরিণা বৈরী ।
খনহ ন ছাড়অ ভুসুকু অহেরি ॥ (চর্যা ৬)

'কাহারে লইয়া এবং কাহাকে ছাড়িয়া আছি কি ভাবে? চৌদিক বেড়িয়া যে হাঁক পড়িতেছে। আপন মাংসে হরিণ সকলের বৈরী — ব্যাধেরা যে ক্ষণকালের জন্যও ভুসুকুকে (ভুসুকুরূপ হরিণকে) ছাড়ে না।' এই প্রসঙ্গে চতুর্দিক থেকে আক্রান্ত ভীত-সন্ত্রস্ত হরিণের যে বর্ণনা পাই তাও চমৎকার। —

তিন ন চ্ছুপই হরিণা পিবই ন পাণী।
হরিণা হরিণীর নিলয় ণ জাণী ॥
হরিণী বোলঅ সুণ হরিণা তো।
এ বন চ্ছাড়ী হোহু ভান্তো ॥
তরংগতে হরিণার খুর ন দীসই।
ভুসুকু ভণই মূঢ় হিঅহি ন পইসই ॥ (চর্যা ৬)

'(ভয়ে) তৃণ ছোঁয়া না হরিণ, না খায় জল ; হরিণ জানে না হরিণীর নিলয়। হরিণী (আসিয়া) বলে, শোন তুমি হরিণ, এ বন ছাড়িয়া ভ্রান্ত হইয়া (চলিয়া) যাও। তূর্ণগতিতে ধাবমান হরিণের খুর দেখা যায় না ; ভুসুকু বলে, মূঢ়ের হৃদয়ে এ-কথা পশে না।'

অন্য একটি পদেও ভুসুকুপাদ বলেছেন —

জই তুম্হে ভুসুকু অহেরি জাইবে মারিহসি পঞ্চজণা।
নলিনীবন পইসন্তে হোহিসি একুমণা ॥

জীবন্তে ভেলা বিহণি মএল রঅণি।
হণবিণু মাঁসে ভুসুকু পদ্মবণ পইসহিলি ॥
মাআজাল পসরি রে বাঁধেলি মাআহরিণী।
সদ্‌গুরুবোহেঁ বুঝিরে কাসু কদিনি ॥ (চর্যা ২৩)

'যদি তুমি ভুসুকু ব্যাধ হইবে, তাহা হইলে পাঁচজনকে মার ; নলিনীবনে প্রবেশ করিতে একমন হও। জীবন্তে হইল প্রভাত, মরণে হইল রজনী ; মাংস বিনে ভুসুকু পদ্মবনে প্রবেশ করিল। মায়াজাল প্রসারিত করিয়া বধ করিলি মায়া-হরিণী , সদ্‌গুরুবোধে বুঝি কাহার কি তত্ত্ব।'

নিম্নজাতীয়া ডোম্বীর উল্লেখ পাই কয়েকটি গানে। আজকের দিনের মতন হাজার বৎসর পূর্বেও এই ডোম্বীর বাড়ি ছিল নগরের বাহির প্রান্তে — তখনও সে ছিল নেড়া বামুনদের নিকটে অস্পৃশ্যা।

নগর বাহিরিরে ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ।
ছোই ছোই জাই সো বাহ্ম নাড়িআ ॥

এই ডোম্বী নৌকায় আসা যাওয়া করত এবং দেশে-দেশে বাঁশের তাঁত, চুপড়ি ও চাঙাড়ি বিক্রয় করত। নলনির্মিত পেটিকা (নড়পেড়া) ছেড়ে লোকে বাঁশেব এই সব জিনিস গ্রহণ করত।

হালো ডোম্বী তো পুছমি সদভাবে।
আইসসি জাসি ডোম্বি কাহবি নাবেঁ ॥
তান্তি বিকণঅ ডোম্বী অবর না চাংগেড়া।
তোহোর অন্তরে ছাড়ি নড়পেডা ॥

আজ পর্যন্ত বাঙলাদেশের নানাস্থানে এই জাতীয় যাযাবর নিম্নজাতীয় স্ত্রীপুরুষ দেখতে পাই—তারা নৌকাতেই সর্বত্র গমন করে, নৌকাই তাদেব ঘরবাড়ি ; কয়েকদিনের জন্য কোনও স্থানে ওঠে, রাস্তাঘাটে বসে অতি সুন্দব নানাপ্রকার বাঁশের জিনিস তৈয়ার করে এবং লোকালয়ে তা বিক্রি করে। লোকেরা অনেক সময়ে ঘরের বাক্সপেটিকা রেখে এই সমস্ত শৌখিন জিনিস ব্যবহার করে। এই সমস্ত নিম্নজাতীয়া নারীরা অনেক সময় নৃত্যগীতপরায়ণা হয় এবং তা দিয়েই লোকের মন ভুলায়। এখানে ডোম্বীর বর্ণনায দেখছি, একটি পদ্ম, তার চৌষট্টি পাপড়ি, তাতে চড়ে নাচে ডোম্বী। —

এক সো পদুমা চৌষঠী পাখুড়ী।
তহিঁ চড়ি নাচঅ ডোম্বী বাপুড়ী ॥

এখানে একটি পদ্মের চৌষট্টি পাপড়ির উপরে নৃত্যের বর্ণনার ভিতর দিয়ে ডোম্বীর অসাধারণ নৃত্যকুশলতার কথাই প্রকাশিত হয়েছে। এই সকল নিম্নজাতীয়া যাযাবর নাবীগণের এই জাতীয় নৃত্যকুশলতার কথা পরবর্তী কালেও অনেক শোনা গেছে। এই নৃত্যগীতকুশলতার সঙ্গে এই ডোম্বী-নারীগণের চরিত্রেও হয়ত চঞ্চলতা আসত এবং সমাজের উচ্চশ্রেণীর জনগণেরও তারা মনোহারিণী হয়ে উঠত। অপর দিকে উচ্চনীচ-জাতি-সংস্কারবর্জিত কাপালিকগণেরও বোধহয় এরা যোগসঙ্গিনী হত। এই সত্যেরই আভাস পাওয়া যায় কাহ্নপাদের আর-একটি পদে—

কইসণি হালো ডোম্বী তোহোরি ভাভরী-আলী।
অন্তে কুলিণজণ মাঝে কাবালী ॥

কেহো কেহো তোহোরে বিরুআ বোলই।
বিদুজন লোঅ তোরেঁ কণ্ঠ ন মেলই ॥
কাহ্নে গাই তু কামচণ্ডালী ।
ডোম্বীত আগলি নাহি চ্ছিণালী ॥

'কিরূপ হাঁলো ডোম্বি, তোর চাতুরী ? — তোর অন্তে কুলীন জন, মাঝে কাপালী ! কেহ কেহ তোকে বিরূপ বলে, কিন্তু বিদ্বজ্জন তোকে কণ্ঠ হইতে ছাড়ে না। কাহ্নু গায়, তুই কামচণ্ডালী, ডোম্বীর অধিক ছিনালী নাই।'

আমরা বাঙলার নগরে এবং পল্লী-অঞ্চলে এখনও আর-একজাতীয় নিম্নশ্রেণীর গায়ক-গায়িকা দেখতে পাই যারা লাউ-বাকলের সঙ্গে বাঁশের ডাঁটি লাগিয়ে তার সঙ্গে তন্ত্রীযোগে একরূপ বীণাজাতীয় যন্ত্র প্রস্তুত করে এবং তারই সাহায্যে নাচগান করে দেশবিদেশে ঘোরে। এই জাতীয় গায়ক-গায়িকার উল্লেখ আমরা চর্যাপদেও পাই।

সুজলাউ সসি লাগেলি তান্তী।
অণহা দাণ্ডী একি কিঅত অবধূতী ॥
বাজই অলো সহি হেরুঅ-বীণা ।
সুন তান্তিধনি বিলসই রুণা ॥
... ...
নাচন্তি বাজিল গাঅন্তি দেবী।
বুদ্ধনাটক বিসমা হোই ॥ (চর্যা ১৭)

'সূর্য লাউ, শশী লাগিল তন্ত্রী, অনাহত দণ্ড — সব এক করিল অবধূতী। আলো সখি, বাজে হেরুক-বীণা ; শোন তন্ত্রীধ্বনি — কি সকরুণ বাজে। বজ্রাচার্য নাচে, গায় দেবী — এই ভাবে বুদ্ধ-নাটক হয় সুসম্পন্ন।'

এখানে 'বুদ্ধ-নাটক' কথাটি লক্ষণীয়। এইরূপ নৃত্যগীতের ভিতর দিয়ে এই সব গায়ক-গায়িকা কোনও বিশেষ ঘটনাকে নাট্যরূপ দান করতেন। এই নাচগানের সাহায্যে নাটক-করার ভিতর দিয়েই কি বাঙলা নাটকের উৎপত্তি? সংস্কৃতেও ত 'নৃত্ত' থেকেই 'নাট' এবং 'নাটক' হয়েছে অনুমান করা হয়।

অপর একটি কবিতায় দেখতে পাই, ডোম্বীর পার্বত্যগৃহে আগুন লেগেছে — তাতে জল সিঞ্চন করা হচ্ছে। সে আগুনের খরজ্বালা বা ধূম দেখা যায় না, মেরুশিখরের ভিতর দিয়ে সে গগনে প্রবেশ করছে। —

ডাহ ডোম্বী ঘরে লাগেলি আগি।
সসহর লই সিঞ্চহুঁ পানী ॥
নউ খরজালা ধূম ন দীসই ।
মেরু শিখর লই গঅণ পইসই ॥

এই প্রসঙ্গেই আর-একটি কথা বলা হয়েছে—

দাঢ়ই হরিহর ব্রহ্মাণ নাড়া ।
ফীটই ণবগুণ শাসন পাড়া ॥

তত্ত্বাব্যাখ্যা ছেড়ে দিয়ে বাহ্যিক অর্থ কি ইঙ্গিত করছে ? নেড়া ব্রাহ্মণ হরিহরও কি ডোম্বীরই প্রতিবেশী ছিল? তাই ডোম্বীর ঘরের আগুন গিয়ে ব্রাহ্মণের ঘর-সহ তাকেও

পুড়িয়ে দিল? না নেড়া ব্রাহ্মণ হরিহর জল সিঞ্চন করতে এসে পুড়ে মরল ? নেড়া ব্রাহ্মণ হরিহরও যেমন পুড়ে মরল, তেমনি আবার ডোম্বীর ঘরবাড়ি সব পুড়ে যাওয়াতে আর 'নবগুণে'র বা পৈতার, অর্থাৎ ব্রাহ্মণের কড়া শাসন ডোম্বীর উপরে রইল না। সাধনতত্ত্বের দিক দিয়ে অবশ্য 'হরিহর ব্রাহ্মণ' বা 'হরিহর ব্রাহ্ম', অর্থাৎ ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবের সন্ধাভাষিক অর্থ রয়েছে।

অন্যত্র এই ডোম্বীকে দেখতে পাচ্ছি পাটনীরূপে : ভাঙা নৌকায় নদী-পারাপার করে—

গঙ্গা জউনা মাঝেঁরেঁ বহই নাই।
তহিঁ বুড়িলী মাতঙ্গীপোইআ লীলে পার করেই ॥
বাহতু ডোম্বী বাহলো ডোম্বী বাটত ভইল উছারা।
সদগুরু পাঅপএ জাইব পুণু জিণউরা ॥
পাঞ্চ কেডুআল পড়ন্তেঁ মাঙ্গে পিঠত কচ্ছী বান্ধী।
গঅণদুখোলেঁ সিঞ্চহু পানী ন পইসই সান্ধি ॥
... ...
কবড়ী ন লেই বোড়ী ন লেই সুচ্ছড়ে পার করই ।
জো রথে চড়িলা বাহবা ন জাই কুলে কুলে বুলই ॥

'গঙ্গা-যমুনা মাঝে বহে নাও — তাহাতে মাতঙ্গকন্যা ডোম্বী জলে ডুবিয়া-ডুবিয়া লীলায় করে পার। বাহ গো ডোম্বী, বাহিয়া চল, পথেই দেরি, সদ্‌গুরুপাদপদ্মে যাইব জিনপুর। পাঁচটি দাঁড় পড়িতেছে পথে, পিঠে কাছি বাঁধিয়া গগনরূপ সেঁউতিতে জল সেঁচ, জল যেন নৌকার সন্ধিতে ঢোকে না। কড়িও লয় না, বুড়িও (এক পয়সা) লয় না, স্বেচ্ছায় করে পার ; যাহারা রথে চড়িল, নৌকা বাওয়া জানে না, তাহারা কূলে কূলেই ঘুরিয়া বেড়ায়।' বেশ বোঝা যাচ্ছে, এই নিম্নশ্রেণীর ডোম্বীরা পাটনীর কাজ করে সাধারণত বেশ কড়ি-বুড়ি কামাই করত।

আজকের দিনের 'ঘটি-বাঙাল' প্রভেদ এবং বিরোধ তখন থেকেই ছিল মনে হয়। সরহপাদ একটি গানে বলেছেন —

বঙ্গে জায়া নিলেসি পরে ভাগেল তোহর বিণাণা ॥

'বঙ্গে জায়া নিয়াছ, পরে ভাগিল তোমার বুদ্ধি (বিজ্ঞান)।' অন্যস্থানেও দেখতে পাই : বঙ্গে তখন পর্যন্ত আর্যেতর জাতিরই প্রাধান্য ছিল — ফলে বঙ্গের সঙ্গে রাঢ়-বরেন্দ্রের (পশ্চিম-বঙ্গ ও উত্তর-বঙ্গের) বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল, এবং এ-জাতীয় বিবাহের দ্বারা পতিত হতে হত। ভুকুকুপাদ একটি গানে বলেছেন—

বাজ্‌ণাব পাড়ী পঁউআ খালেঁ বাহিউ।
অদয় বঙ্গালে ক্লেশ লুড়িউ ॥
আজি ভুসু বঙ্গালী ভইলী।
ণিজ ঘরিণী চণ্ডালী লেলী ॥

'বজ্রনৌকা পদ্মাখালে বাহিলাম, দয়াহীন বঙ্গালে ক্লেশ লুটিয়া লইল। আজ ভুসুকু বঙ্গালী হইল, নিজ গৃহিণী চণ্ডালী লইল।'

এখানে দেখছি, পদ্মার খালে নৌকা বেয়ে পদ্মার ওপারে বঙ্গে এসে উপস্থিত হল। বঙ্গ বড় দয়াহীন—তাই নৌকায় যাহা কিছু ছিল ডাকাতে লুটপাট করে নিল। আরও দেখছি ভুসুকু বঙ্গে এসে চাঁড়ালী বিবাহ করে একেবারে খাঁটি বাঙাল বনে গেছে।

চর্যাপদগুলির মধ্যে তৎকালীন বাঙলাদেশের বহুশ্রেণীর কর্মজীবীর বর্ণনা পাই। এদের ভিতরে কৈবর্ত(মৎস্যজীবী), তাঁতী, ধুনুরী, ছুতোর প্রভৃতির উল্লেখ করা যেতে পারে। নদীমাতৃক বাঙলাদেশে মৎস্যজীবী কৈবর্তজাতি অতি প্রাচীন কাল থেকেই প্রসিদ্ধ। কাহ্নপাদের একটি পদে এই কৈবর্তধর্মের উল্লেখ পাই। সেখানে বলা হয়েছে—

তরিত্তা ভবজলধি জিম করি মাঅ সুইনা ।
মাঝ বেণী তরঙ্গম মুনিআ ॥
পঞ্চতথাগত কিঅ কেড়ুয়াল ।
বাহঅ কাঅ কাহ্নিল মাআজাল ॥

নৌকায় বসে মাঝনদীতে একরকমের জাল ফেলে ছোট বৈঠা বা দাঁড় বেয়ে জেলেরা ভেসে চলে। কখন কোথায় মাছ পড়বে ঠিক নেই, ভেসে চলতে-চলতে জালে হঠাৎ মাছ পড়ে, জাল তুলে মাছ ধরতে হয়—এটিই মাছ ধরবার 'মায়াজাল'। তরঙ্গসংকুল মাঝনদীতে তখনও এরূপ মায়াজাল পেতে মাছ ধরা হত বোঝা যাচ্ছে।

শান্তিপাদের একটি পদে ধুনুরীর উল্লেখ পাচ্ছি। চর্যাকার বলছেন—

তুলা ধুণি ধুণি আঁসুরে আঁসু ।
আঁসু ধুণি ধুণি নিরবর সেসু ॥
... ...
তুলা ধুণি ধুণি সুণে অহারিউ ।
পুণ লইআ অপণা চটারিউ ॥ (চর্যা ২৬)

'তুলা ধুনিয়া ধুনিয়া আঁশ আঁশ করিলাম, আঁশ ধুনিয়া একেবারে নিঃশেষ করিলাম। তুলা ধুনিয়া ধুনিয়া শূন্য করিয়া লইলাম, পুনরায় তাহা লইয়া নিজেকে বিলীন করিলাম ।'

তন্ত্রিপাদ (তান্তিপা) রচিত ২৫ সংখ্যক পদটি পাওয়া যায় নি। ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয় তার তিব্বতী অনুবাদ আবিষ্কার করেছেন—তার একটি সংস্কৃত ছায়াও রচনা করেছেন। এর ভিতরে দেখতে পাই, এই পদটিতে বস্ত্র-বয়নের রূপকেই সকল তত্ত্বব্যাখ্যা করা হয়েছে। সেখানে দেখি, কালপঞ্চকের তাঁত বস্ত্র বয়ন করছে । এর 'আমি'ই হল তাঁত, আপনার ভিতর থেকেই আসে সব সূতা—সেই সূতায় কাপড় বুনে বুনে গগন ভরে ফেলা হয়।

দু-একটি পদে ছুতারদের অস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। যেখানে বলা হয়েছে, 'জা তরু ছেব ভেবউ ন জানই' — সেখানেই বোঝা যাচ্ছে যে, তরুর ছেদন এবং ভেদনের ভেতরে একটা কৌশল ছিল — সে কৌশল এ-বিষয়ে কৌশলীদেরই জানা ছিল, সাধারণের ছিল তা অজানা। অন্যত্র নৌকাগঠনের প্রসঙ্গেও আমরা এই ছুতারবৃত্তির আভাস পাই।

নদীমাতৃক বাঙলাদেশ, নদীমাতৃকতার প্রভাব গভীরভাবে মুদ্রিত বাঙলার সভ্যতা-সংস্কৃতিতে! এই নদীমাতৃকতার প্রভাব পাই এই চর্যাপদগুলির ভিতরেও। পদগুলি সাগর-নদী-খাল-বিখালের বর্ণনায় ভরা। প্রধান প্রধান দার্শনিক তত্ত্বগুলি এবং গুহ্য-সাধনতত্ত্বগুলি বর্ণিত হয়েছে এই সাগর-নদী-খাল-বিখালের রূপকেই।

ভবনই গহণ গম্ভীরবেগেঁ বাহী ।
দুআন্তে চিখিল মাঝ ন থাহী ॥

নদীর এই অতিরিক্ত কাদাভরা দুই কূল বাঙলাদেশের নদীর বৈশিষ্ট্যসূচক বটে। মহাসুখলাভরূপ পরমনির্বাণের পথে অগ্রসর হবার সাধনাকে প্রায়ই নদীর পথে নৌকায় গমনের রূপকে বর্ণনা

করা হয়েছে। পরমার্থসাধনার সঙ্গে নদীস্রোতে উজানের রূপক অবশ্য ভারতীয় শাস্ত্রে আরও অনেক পাওয়া যায় এবং দেহস্থ প্রধান তিনটি নাড়ীর সঙ্গে ভারতবর্ষের প্রধান তিনটি নদী — গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর উপমা অতি প্রসিদ্ধ। তথাপি মনে হয়, এই নদী খাল এবং তাতে নানাভাবে নৌকা বাইবার রূপক চর্যাকারগণ অনেক বেশি ব্যবহার করেছেন এবং এর ভিতরে বাঙলার নদীমাতৃকতার প্রভাব অনস্বীকার্য। আমরা পূর্বে দেখেছি, গঙ্গা-যমুনার মাঝে ডোম্বী কিরূপে পাটনী হয়ে লোকজন বিনা-কড়িতেই পারাপার করছে (চর্যা ১৪) ; মাঝনদীতে নৌকা নিয়ে মায়াজাল বাইবার কথাও পূর্বে দেখেছি (চর্যা ১৩)। শান্তিপাদ একটি গানে বলছেন—

কুলেঁ কুল মা হোইরে মূঢ়া উজুবাট সংসারা ।
বাল ভিণ একুবাকু ণ ভুলহ রাজপথ কন্ধারা ॥
মাআ মোহ সমুদারে অন্ত ন বুঝসি থাহা ।
আগে নাব ন ভেলা দীসই ভন্তি ন পুচ্ছসি নাহা ॥
সুনাপান্তর উহ ন দীসই ভান্তি ন বাসসি জান্তে ।
এষা অটমহাসিদ্ধি সিঝই উজুবাট জাঅন্তে ॥
বামদাহিণ দো বাটা চ্ছাড়ী শান্তি বুলথেউ সংকেলিউ ।
ঘাট ণ গুমা খড়তড়ি ণ হোই আখি বুজিঅ বাট জাইউ ॥ (চর্যা ১৫)

এখানে যাত্রীকে কূলে কূলে ঘুরতে বারণ করা হচ্ছে — মাঝখানে রয়েছে সোজা পথ (সহজ পথ)। সম্মুখে রয়েছে যে সমুদ্র, তার যদি না বোঝা যায় অন্ত, না বোঝা যায় থই— সম্মুখে না যদি দেখা যায় আর কোন নাও বা ভেলা, তবে এ পথের অভিজ্ঞ পথিকগণের কাছে পথের সন্ধান জিজ্ঞাসা করতে হবে। শূন্য প্রান্তরে না যদি মেলে কোন পথের দিশা, তবু ভ্রান্তি বাসা উচিত নয় এগিয়ে যেতে — সোজা পথে গেলেই মিলবে সকল সিদ্ধি। ডাইনে-বাঁয়ের দুই পথ ছেড়ে চলতে হবে কেলি করতে করতে ; এই সহজ পথে ঘাট-ঝোপ-ঝাড়, বাধা-বিঘ্ন কিছুই নেই, চোখ বুজে নৌকায় চলা যায় এই পথে।

বাঙলাদেশের খাল-বিখালের উল্লেখ দেখি অনেক প্রসঙ্গে—

বাম দাহিণ জো খাল-বিখলা।
সরহ ভণই বাপা উজুবাট ভইলা ॥

পথে যেতে বাঁকে-বাঁকে ডাইনে-বাঁয়ে অনেক রয়েছে খাল-বিখাল। সরহ বলছে, এইসব বাঁকা খাল-বিখালের ভিতরে প্রবেশ কবো না, এগিয়ে যাও একদম সোজা পথে।

নদীমাতৃক বাঙলা দেশের প্রাধান যান-বাহন ছিল নৌকা। এই কারণেই বোধহয় যোগতন্ত্রের রহস্য বলতে গিয়ে চর্যাকারগণ নানাভাবে এই নৌকা বাইবার রূপক গ্রহণ করেছেন। দু-একটি কবিতায় নৌকা বাইবার বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে, এবং তার ভিতর দিয়ে বাঙলা দেশের মাঝিমাল্লাদের একটি চমৎকার চিত্র ফুটে উঠেছে। সরহপাদের একটি কবিতায় দেখি—

কাঅ ণাবড়ি খাণ্টি মণ কেডুআল।
সদ্‌গুরু-বঅণে ধর পতবাল ॥
চীঅ থির করি ধরহুরে নাই ।
আন উপায়ে পার ণ জাই ॥
নৌবাহী নৌকা টাণঅ গুণে ।
মেলি মেল সহজে জাউ ণ আণেঁ ॥

বাটত ভঅ খাণ্ট বি বলআ ।
ভব উলোলেঁ সব বি বোলিআ ॥
কূল লই খর সোন্তেঁ উজাঅ ।
সরহ ভণই গঅণেঁ সমাঅ ॥ (চর্যা ৩৮)

'কায় নৌকা, খাঁটি মন হইল তাহার দাঁড়, — সদ্‌গুরুবচনে ধর হাল। চিত্ত স্থির করিয়া ধর নাও, অন্য উপায়ে পারে যাওয়া যায় না। নৌবাহী (নেয়ে) নৌকা গুণে টানে ; ঠিক সহজেই গিয়া মিলিত হও, অন্য দিকে যাইও না। পথে আছে ভয়, বলবান্ দস্যু ; ভবতরঙ্গে সবই টলমল। কূল ধরিয়া খরস্রোতে উজাইয়া যায়, — সরহ বলে, গগনে গিয়া প্রবেশ করে (অর্থাৎ গুণের নৌকা খরস্রোত উজাইয়া বহুদূরে — দিকচক্রবালে যেখানে আকাশ ও সমুদ্র এক হইয়া গিয়াছে সেইখানে অদৃশ্য হইয়া যায়)।'

কম্বলাম্বরপাদের একটি পদেও এই নৌকাযাত্রার বর্ণনা পাই। মাঝিরা সাধারণত একটা ছুঁচালো খুঁটি বা গোঁজ নদী বা খালের কূলে কাদা-মাটিতে পুঁতে তার সঙ্গে কাছি বা দড়ি দিয়ে নৌকা বেঁধে রাখে। নৌকায় কোথায়ও রওনা হতে হলে প্রথমে এই খুঁটি বা গোঁজটি তুলে কাছি ছেড়ে দিতে হয়। তারপরে মাঝগাঙে এসে চারিদিক চেয়ে শুনে নৌকার দাঁড় বেঁধে বেয়ে যেতে হয়। এখানেও বলা হয়েছে —

খুণ্টি উপাড়ী মেলিলি কাচ্ছি ।
বাহতু কামলি সদ্‌গুরু পুচ্ছি ॥
মাঙ্গত চড়্হিলে চউদিস চাহঅ ।
কেডুআল নাহি কেঁকি বাহবকে পারঅ ॥ (চর্যা ৮)

'খুঁটি উপাড়িয়া কাছি মেলিল ; হে কামলি, সদ্‌গুরুকে জিজ্ঞাসা করিয়া বাহিয়া চল । পথে চড়িয়া চারিদিকে চায় ; দাঁড় না থাকিলে কে বাহিতে পারে ?'

এই নৌকা বাইবার প্রসঙ্গে আমরা তৎকালীন বাঙলার ব্যবসা-বাণিজ্যেরও একটা ক্ষীণ আভাস পাই। নৌকাতেই দেশের সর্বত্র ব্যবসা-বাণিজ্য হত । সোনারূপার বাণিজ্যও বাঙলা দেশে ছিল এবং নৌকায় করেই সোনারূপার ব্যবসা-বাণিজ্য হত। কম্বলাম্বরের উপরিউক্ত কবিতাটির প্রথমেই দেখতে পাই, —

সোনে ভরিতী করুণা নাবী।
রূপা থোই নাহিক ঠাবী ॥ (চর্যা ৮)

'সোনায় ভরতি আমার করুণার নৌকা, রূপা থুইবার আর ঠাঁই নাই।'

চারিদিকে নদীনালা-খালবিল থাকবার জন্য নানাবিধ সাঁকোর সঙ্গেও বাঙালি বহুদিন থেকেই পরিচিত। চাটিলপাদ একটি কবিতায় বলেছেন, পারগামী লোক যাতে নির্ভয়ে নদীর পারাপার করতে পারে সেই জন্য তিনি বেশ মজবুত একটি কাঠের সাঁকো প্রস্তুত করে দিয়েছেন। বড় গাছ ফেড়ে সাঁকোর পাট জোড়া দেওয়া হয়েছে, টাঙ্গি দ্বারা একে শক্তপোক্ত করা হয়েছে।

ধামার্থে চাটিল সাঙ্কম গঢ়ই।
পারগামি লোঅ নিভর তরই ॥
ফাড়িঅ মোহতরু পাটী জোড়িঅ।
অদঅ দিঢ় টাঙ্গী নিবাণে কোরিঅ ॥ (চর্যা ৫)

চর্যাপদগুলির ভিতরে তৎকালীন বাঙলার গার্হস্থ্য জীবনের দু-একটি চিত্র পাওয়া যায় । কুক্কুরীপাদের একটি গানে আছে —

আঙ্গণ ঘরপণ সুন ভো বিআতী ।
কনেট চোরে নিল অধরাতী ॥
সুসুরা নিদ গেল বহুড়ী জাগঅ।
কানেট চোরে নিল কা গই মাগঅ ॥ (চর্যা ২)

'অঙ্গন ঘরের কাছেই, শোন হে অবধূতি, কানেট (কর্ণভূষণ) চোরে নিল অর্ধরাত্রে । শ্বশুর ঘুমাইয়া পড়িল, বহুড়ী আছে জাগিয়া, কানেট চোরে নিল, কোথায় গিয়া তাহা মাগিবে।'

পদগুলি পড়লে মনে একটি ছবি ভেসে ওঠে। ঘরের বহুড়ী রাত্রেও কর্ণভূষণ পরে শুয়েছিল, মাঝরাত্রে ঘুমের ভিতরে চোর এসে তা চুরি করে নিয়ে গেছে। বুড়া শ্বশুর এখনও ঘুমে — কিন্তু ভয়ে ভয়ে জেগে আছে বহুড়ী ; অসাবধানে কানের অলংকার চুরি হয়ে গেল। কোথায় আবার পাওয়া যাবে এই অলংকার ? যেমন চোরেব ভয়, যেমন বিত্তনাশের মনস্তাপ, তেমনই আবার শ্বশুর-শাশুড়ীর ভয় — তাই সারারাত বহুড়ী আছে জেগে।

এর ঠিক পরের পংক্তিগুলি—

দিবসই বহুড়ী কাগ ডরে ভাঅ।
রাতি ভইলে কামরু জাঅ ॥ (চর্যা ২)

অর্থাৎ, 'দিবসে বহুড়ী কাকের ডবে চিৎকার করিয়া ওঠে, রাত্রি হইলে কোথায় চলিয়া যায় ?'— প্রভৃতি বহুড়ীব চঞ্চল চবিত্রের প্রতি ইঙ্গিত করছে । পদটি আমাদের অসংযতস্বভাবা কুলনারী সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ শ্লোকটি স্মরণ করিয়ে দেবে। —

দিবা কাকরুতাদ্‌ভীতা রাত্রৌ তরতি নর্মদাম্।
তত্র সন্তি জলে গ্রাহা মর্মজ্ঞা সৈব সুন্দরী ॥

দেখা যাচ্ছে, অসতী কুলবধূ সম্বন্ধে এই উক্তিটি সে কালে বাঙলার জনসাধারণের ভিতরে বেশ' প্রচলিত ছিল।

এই পদে এবং পূর্বের আর দু-একটি পদে যে চোরডাকাতের উল্লেখ পেয়েছি তা আরও দু'একটি পদে পাওয়া যায়। বাসগৃহে প্রহরীব প্রয়োজন ছিল। তাই কাহ্নুপাদের একটি পদে দেখি—

সুণ বাহ তথতা পহারী ।
মোহ ভণ্ডার লই সঅলা অহারী ॥ (চর্যা ৩৬)

'শূন্যবাসে (শূন্যতার বাহুতে?) তথতা প্রহরী ; মোহভাণ্ডার সকলই লওয়া হইয়াছে ছিনাইয়া।'

ঘরের দুয়ারে দৃঢ়ভাবে তালা লাগাবারও ব্যবস্থা ছিল। সরহপাদের দোঁহা 'জই পবণ-গমণ-দুআরে দিঢ় তালা বি দিজ্জই'-প্রভৃতির ভিতরে এর আভাস পাই।

গৃহিণী নারীর প্রতি পুরুষের অভিভাবকত্ব এবং শাসন তখনও কিঞ্চিৎ কঠোর ছিল বলেই মনে হয়। নিম্নলিখিত দোঁহাগুলিতে এরূপ অনুমানের যথেষ্ট উপাদান মিলবে। —

অইস উএসে জই ফুড় সিজ্ঝই।
পবণ ঘরিণি তহি নিচ্চল বজ্ঝই ॥

'এইরূপ উপদেশে যদি ঠিক সিদ্ধি হয়,তবে পবন-গৃহিণী তথায় নিশ্চল হইয়া হত হয়।'

ণিঅ ঘরে ঘরিণী জাব ণ মজ্জই।
তাব কি পঞ্চবণ্ণ বিহরিজ্জই ॥

'নিজ ঘরে ঘরণী যে পর্যন্ত না মজে তাবৎ কি পঞ্চবর্ণে বিহার করা যায়?'

ঘরের কর্তা এবং গিন্নী একসঙ্গে বসে খাওয়া তখনকার দেশাচারের পক্ষে ছিল একেবারে অবিচার। —

ঘরবই খজ্জই ঘরিণিএহি জহি দেসহি অবিআর।

কাহ্নুপাদের একটি কবিতায় তৎকালীন বিবাহের একটি সুন্দর বর্ণনা পাই। —

ভবনির্বাণে পড়হ মাদলা।
মন পবণ বেণি করণ্ডকশালা ॥
জঅ জঅ দুন্দুহি সাদ উছলিআঁ।
কাহ্ন ডোম্বী বিবাহে চলিআ ॥
ডোম্বী বিবাহিআ অহারিউ জাম।
জউতুকে কিঅ আণুতু ধাম ॥

'ভব ও নির্বাণ হইল পটহ-মাদল, মন-পবন দুই করণ্ডকশালা ; জয় জয় দুন্দুভি শব্দ উচ্ছলিত করিয়া কাহ্ন ডোম্বীকে বিবাহ করিতে চলিল। ডোম্বীকে বিবাহ করিয়া জন্ম খাইলাম, কিন্তু যৌতুকে করিলাম অনুত্তরধাম।'

এখানে বর নিয়ে শোভাযাত্রার একটি সুন্দর দৃশ্য পাই। পটহ-মাদল, করণ্ডকশালা, দুন্দুভি-প্রভৃতি বাদ্য-সহ প্রচুর আনন্দকোলাহলের মধ্য দিয়ে এই শোভাযাত্রা চলত। কৃত্তিবাসের রামায়ণের উত্তরাকাণ্ডেও এইরূপ একটি বিবাহের বর্ণনা পাওয়া যায়—

যতেক মহাপাত্র চারিভিতে সাজে।
শঙ্খ দুন্দুভি সিঙ্গা চারিপাশে বাজে ॥
সিঙ্গা ডম্বুর বাজে, কাংস্য করতাল।
পাড়া মাদল ভেরু দোসর কাহাল।
... ...
করড়া করড়ী বাজে কুণ্ডলা কুণ্ডলী।
বেণু বাঁশী সরমণ্ডল বাজে চন্দ্রাবলী ॥ (ব. সা. প. সংস্করণ)

উপরের চর্যাটি পড়ে আরও মনে হয়, সেদিনেও বাঙলা দেশে বিবাহে বরপক্ষ বেশ যৌতুক পেত এবং ভাল যৌতুকের লোভে বোধহয় নীচকুল থেকে কন্যা-গ্রহণেও আপত্তি ছিল না। এখানে দেখি ডোম্বীকে বিবাহ করে জন্ম গেল, অর্থাৎ কুল গেল বটে—কিন্তু ভালো যৌতুক যে পাওয়া গেছে তাতেই বর খুশী।

দাবা খেলা তখন বোধহয় বেশ প্রিয় ছিল। কাহ্নুপাদের একটি চর্যাগানে এই দাবা খেলার বিস্তারিত বর্ণনা পাচ্ছি —

করুণা পিহাড়ি খেলহুঁ নঅবল।
সদ্গুরু-বোহেঁ জিতেল ভববল ॥
ফীটউ দুআ মাদেসি রে ঠাকুর।
উআরি উএসেঁ কাহ্ন ণিঅড় জিনউর ॥

পহিলেঁ তোড়িআ বড়িআ মারিউ।
গঅবরেঁ তোড়িআ পাঞ্চজনা ঘালিউ ॥
মতিএঁ ঠাকুরক পরিনিবিতা।
অবশ করিআ ভববল জিতা ॥
ভণই কাহ্নু অম্হে ভাল দান দেহুঁ।
চউষট্‌ঠি কোঠা গুণিআ লেহুঁ ॥

'করুণার পিড়িতে নয়বল (দাবা) খেলি, সদ্‌গুরুবোধে ভববল জিতিলাম। দুই নষ্ট হইল, ঠাকুরকে দিও না ; উপকারি-উপদেশে কাহ্নর নিকটে জিনপুর। প্রথমে ব'ড়ে তুড়িয়া মারিলাম, তারপরে গজবর তুলিয়া পাঁচজনকে ঘায়েল করিলাম। মন্ত্রীকে দিয়া ঠাকুরকে পরিনিবৃত্ত করিলাম, অবশ করিয়া ভববল জিতিলাম। কাহ্নু বলে, আমি ভাল দান দেই, চৌষট্টি কোঠা গুনিয়া লই।'

দাবার 'কোঠ'-এর চৌষট্টি ঘর বা কোঠা— একটা কিছুর উপরে 'কোঠ' পেতে খেলতে হয়। এখানে 'ঠাকুর' হলেন রাজা। প্রথমে হল 'ব'ড়ে'র চাল — সুযোগ বুঝে গজ দিয়ে অনেকগুলি ঘায়েল করতে হয়। 'মন্ত্রী' দিয়ে 'রাজা'র গতিবিধি বন্ধ করতে পারলেই কিস্তিমাৎ।

বিরুআপাদের একটি গানে শুঁড়ীবাড়ি এবং মদের ব্যবসায়ের একটি বাস্তব বর্ণনা পাই—

এক সে শুণ্ডিনি দুই ঘরে সান্ধঅ।
চীঅণ বাকলঅ বারুণী বান্ধঅ ॥

. .. .

দশমী দুআবত চিহ্ন দেখিয়া।
আইল গরাহক অপণে বহিআ ॥
চউশটি ঘড়িয়ে দেল পসারা।
পইঠেল গরাহক নাহি নিসারা ॥
এক সে ঘড়লী সরুই নাল।
ভণন্তি বিরুআ থির করি চাল ॥ (চর্যা ৩)

এখানে দেখছি, এক শুঁড়িনী দুই ঘরে সান্ধে, সে চিকন বাকলের দ্বারা বারুণী (মদ) বাঁধে। শুঁড়ীর ঘরের চিহ্ন দেখা গেছে দুয়ারেই — দুয়ারে সেই চিহ্ন দেখে মদের গ্রাহক নিজেই চলে এসেছে। চৌষট্টি ঘড়ায় মদ ঢালা হয়েছে, গ্রাহক যে ঘরেব ভিতরে একবার ঢুকল আর তার কোন সাড়াশব্দ নেই। সরু নালে একটা ঘড়ায় মদ ঢালা হচ্ছে — বিরুপা সাবধান করছে, বারুণী সরুনল দিয়ে ঘড়ায় স্থির করে ঢালতে।

থোকাথোকা বাঁকা তেঁতুল ফুল এখন সাহিত্য হতে সম্পূর্ণ স্থানচ্যুত হয়েছে। কিন্তু এই বাঁকা তেঁতুলের পূর্বে বাঙলা সাহিত্যে স্থান ছিল। চর্যার দেখি, 'রুখের তেন্তলি কুম্ভীরে খাই'— 'গাছের তেঁতুল কুমীরে খায়।' আমরা ছেলেবেলায় মাঘ-মণ্ডলের ব্রতে গান শুনেছি—

আম ফলে থোকা থোকা তিতৈল ফলে বাঁকা।
ছাওয়াল সূর্যাই বিয়া করে মায়ের ঝোলায় টাকা ॥

সাঁওতালীদের গানে উল্লেখ আছে এই তেঁতুল গাছের। একটি গানে আছে,— 'আমার ভাবের লোকের সাজ ছিল সোনার, তার আভরণ ছিল রূপার, সে-সব সাজগোজ কী করে ভুলব। আমাদের উঠানে ঐ প্রকাণ্ড বড় তেঁতুল গাছ, তেঁতুল গাছের উপর তোলা রইল সে সব — উঠান ঝাঁট দিতে ভুল হয়ে যাচ্ছে সব।

পূর্বে বাঙলার পার্বত্য নদীর নিকটবর্তী বনভূমিতে অনেক হাতী বিচরণ করত। সরহপদের একটি দোহায় আছে,—

মুক্কউ চিত্তগএন্দ, করু এথ বিঅপ্প ণু পুচ্ছ।
গঅণগিরী ণইজল পিএউ তহিঁ তড় বসউ সইচ্ছ ॥

'চিত্ত গজেন্দ্রকে মুক্ত কর, এ বিষয়ে আর কোন বিকল্প জিজ্ঞাসা করিও না। গগন গিরির নদীজল সে পান করুক, তাহার তটে সে বাস করুক স্ব-ইচ্ছায়।'

কাহ্নপাদের একটি কবিতায় দেখতে পাই, বন্যহাতী বদ্ধ করে সুদৃঢ় করে বেঁধে রাখা হত। কিন্তু মদমত্ত হাতী সব খাম্ভা ভেঙে, দড়ি-দড়া ছিঁড়ে গিয়ে নিকটবর্তী নলিনীবনে প্রবেশ করত।

এবংকার দৃঢ় বাখোড় মোড়িউ।
বিবিহ বিআপক বান্ধণ তোড়িউ ॥
কাহ্ন বিলসঅ আসবমাতা।
সহজ নলিনী বন পইসি নিবিতা ॥ (চর্যা ৯)

মহীধরপাদের গানেও এই মত্ত গজেন্দ্রের বর্ণনা পাচ্ছি—

মাতেল চীঅ-গএন্দা ধারই।
নিরন্তর অগণন্ত তুসেঁ ঘোলই ॥
পাপ পুণ্ন বেণি তোড়িঅ সিকল মোড়িঅ খম্ভাঠাণা।
গঅণ টাকলি লাগিরে চিত্ত পইত ণিবাণা ॥

'ধাইতেছে আমার মত্ত চিত্ত-গজেন্দ্র — নিরন্তর গগনে সকল কিছু ঘোলাইয়া লইতেছে। পাপ-পুণ্য দুই শিকল ছিঁড়িয়া এবং সব খাম্ভা মোড়াইয়া দিয়া গগনশিখরে গিয়া পৌঁছিয়া সে একেবারে শান্ত হইতেছে (নির্বাণে প্রবিষ্ট হইতেছে)।'

বীণাপাদের একটি গানে হাতী ধরবার সন্ধি বলা হয়েছে — সারিগানের সুরে হাতীর মনকে আগে বশ করতে হয়।—

আলিকালি বেণি সারি মুণিআ।
গঅবর সমরস সান্ধি গুণিআ ॥ ইত্যাদি। (চর্যা ১৭)

আগেকার দিনে মুষিকের অত্যাচারও কম ছিল না। অন্ধকার রাত্রে তার আনাগোনা আরম্ভ হত। সে সব জিনিস তছনছ করত — গর্ত খুঁড়ত এবং উপরে (মাচায় বা গোলায়?) উঠে আমন ধান খেত।

ভব বিন্দারঅ মুসা খণঅ গতি।
চঞ্চল মুসা কলিআঁ নাশক থাতী ॥
কাল মুসা উহ ণ বাণ।
গঅণে উঠি চরঅ (হরঅ?) অমণ ধাণ ॥ (চর্যা ২১)

বাঙলার হিন্দু-মুসলিম ধর্ম ও সংস্কৃতির সমন্বয়

বাঙলা দেশ পয়ার ছন্দের দেশ। বাঙলা সাহিত্যের প্রথম থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত যত কাব্য-কবিতা রচিত হয়েছে, তার বারো আনারও বেশি পয়ার ছন্দে ; ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথেরও প্রধান ছন্দ পয়ারই বটে। শুধু সাহিত্যের ক্ষেত্রে নয়, ধর্ম এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও দেখতে পাই সেই পয়ারেরই প্রভাব।

পয়ার ছন্দের প্রধান পরিচয় তার ভিতরকার সর্বাঙ্গীন তানধর্মে। সেখানে কোনো মাত্রার কোনো ধ্বনিই একক বা স্বতন্ত্রভাবে সার্থক নয় — সব জুড়ে জাগে একটি তান, আর সেই একতানের ভিতরেই ছোট-বড়ো সকল ধ্বনি তাদের নিজ-নিজ অস্তিত্বকে ডুবিয়ে দেয়। এই একতানতার পশ্চাতে রয়েছে একটি প্রকাণ্ড শোষণ শক্তি — সেই শোষণ শক্তিই ছোট-বড় ব্যক্তিকে একেবারে স্বতন্ত্র বা উৎকেন্দ্রিক হয়ে পড়তে দেয় না — ছোট-বড় সকলকে জড়িয়ে একতানের সৃষ্টি করে। কিন্তু এ-কথা মনে করলে ভুল করা হবে যে, এই একতানতা শব্দের অর্থ, গুরুর গুরুত্ব অস্বীকার করা ; চরণের ভিতরে গুরু মাত্রা থাকলে সে মাত্রাটি নিজেই ভয়ানক ভাবে গুরু হয়ে উঠবার সুযোগ পায় না বটে, কিন্তু সে সমগ্র চরণের গুরুত্ব নানাভাবে বৃদ্ধি করে।

ঠিক তেমনি ভাবে বাঙলা দেশের ধর্ম এবং সংস্কৃতিকে ভাল করে বুঝে দেখলে দেখতে পাব, প্রাচীন যুগ থেকেই বাঙলা সমাজের একটা অসীম শোষণ-শক্তি আছে। এই জন্যই এখানে যত মত এবং পথ প্রচারিত হোক না কেন, তারা কেউই তাদের উদগ্র স্বাতন্ত্র্য নিয়ে বেশি দিন টিকতে পারে নি, — জন-সমাজের শোষণ-শক্তি তাদের টেনে ধরেছে ; ছোট বড় মাত্রাগুলির ভিতরে একটা স্বাভাবিক যোগ স্থাপন করে দিয়েছে। তাই যে যুগে যত মত এবং পথই জাঁকিয়ে ওঠুক না কেন, কিছুদিন পরেই দেখি, সমাজ তাকে আপনার মত করে রূপান্তরিত করে নিয়েছে এবং সেই রূপান্তরের ভিতর দিয়েই এসে পড়েছে চমৎকার একতান। তাতে করে ধর্ম বা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কোনো মনীষারই অস্বীকার বা অমর্যাদা হয় নি — তাদের মূল্য এবং মর্যাদা সকলের সঙ্গে মিশে জাতীয় জীবনের মূল্য এবং মর্যাদাকেই বাড়িয়ে দিয়েছে।

এই জন্য বাঙলার কোনো ধর্মেরই রঙ তেমন চটকদার নয়। পালরাজাদের সময়ে বাঙলার একটা বৃহত্তর অংশ জুড়ে যে বৌদ্ধধর্ম প্রচলিত ছিল, তাকে বৌদ্ধধর্ম নাম দেবার সার্থকতা খুঁজে পাওয়া সহজ নয়। আসলে সেটা বৌদ্ধধর্মও নয়, প্রচ্ছন্ন হিন্দুধর্মও নয় — সেটি বাঙলা সমাজের শোষণশক্তির ফলে রূপান্তরিত একটি মিশ্র-রঙ এবং মিশ্র-প্রকৃতির নূতন ধর্ম। জনগণের টানা-হেঁচড়ায় পড়ে বুদ্ধদেব কখনও শিবঠাকুরের পিছনে গিয়ে লুকিয়েছেন— কখনও পশ্চিমবঙ্গের লৌকিক দেবতা ধর্মঠাকুরের সঙ্গে গলাগলি করে একেবারে একদেহ-একাত্মা হয়ে উঠতে চেয়েছেন ; আবার কখনও সেই ধর্মঠাকুরের সঙ্গে শিবঠাকুর একসঙ্গে মিশে গেছেন। বৈষ্ণবধর্মকে বৃন্দাবনের গোসাঁইগণ বিবিধ স্মৃতি ও তত্ত্ব গ্রন্থের ভিতর দিয়ে যতই 'বিশেষ' করে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করুন, গোসাঁইগণের গ্রন্থডোরকে

ফাঁকি দিয়ে সেই ভক্তিধর্ম বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রূপান্তর গ্রহণ করেছে। বাঙলার শক্তিদেবীকে দিয়ে বাঙালী বাঁশী বাজিয়েছে, বাঙলার কৃষ্ণের জিভ বের করে তাঁর হাতে অসি দান করেছে। বাঙলার মুসলমান ধর্ম আজকের দিনে একটা কৃত্রিম উপায়ে বাঙলার সাধারণ ধর্ম (হিন্দুধর্ম ?/ বাঙালী ধর্ম ?) হতে যতই স্বতন্ত্র বলে পরিচয় লাভের চেষ্টা করুক না কেন, বৃহত্তর বাঙালী সমাজ সেরূপ স্বাতন্ত্র্যের সুযোগ রাখে নি। ফলে পণ্ডিত-মুন্সীগণ যত উগ্রভাবে হিন্দু এবং মুসলমান হন না, জনসাধারণ কেন এক 'বাঙালী'।

কথাটির যথার্থ্য বোঝা যায় বাঙলার বাউলের দিকে তাকালে। এই বাউলধর্ম বাঙলার নিজস্ব ধর্ম। সে কথার অর্থ এ নয় যে, বাউলধর্মের ভিতরে যে সকল ভাব এবং কথা রয়েছে তা ভারতবর্ষের আর কোথাও কোন ধর্মে নেই ; বাউলদের যা কথা তা হিন্দুধর্মের বহুস্থানে আছে, মুসলমান ধর্মেও আছে। কিন্তু বাউল ধর্মের বৈশিষ্ট্য এই, এখানে হিন্দুধর্মের অনেক মর্মকথা এবং মুসলমানধর্মের অনেক মর্মকথা অতি সহজভাবে থিতিয়ে পড়েছে। এই থিতানোর ভিতর দিয়ে তারা যে রূপান্তর লাভ করেছে, সেখানে ধর্মের ক্ষেত্রে বাঙালী-জীবনের একতান নিখুঁত হয়ে উঠেছে। এখানে অদ্বয়ের ভিতরে একটা দ্বৈত-বোধ এবং তাকে অবলম্বন করে যে সংস্কারবিহীন সহজ প্রেম-ধর্মের সুর ভেসে উঠেছে, সেখনে শাস্ত্রবাণী তাদের গুরুত্ব কিছুই হারায় নি — কিন্তু পৃথক মাত্রার উগ্রতা হারিয়ে ফেলেছে।

এই সহজ মিলনের একটি সুন্দর পরিচয় রয়েছে একখানি অখ্যাত কাব্যগ্রন্থে। গ্রন্থখানি আলিরাজা ওরফে কানু ফকিবের রচিত 'জ্ঞান-সাগর'। কানু ফকিব চট্টগ্রামের একজন গ্রাম্য কবি এবং প্রসিদ্ধ সাধক। শাহ কেয়ামদ্দিন-নামক একজন তত্ত্বজ্ঞানী সাধক কানু ফকিরের দীক্ষাগুরু ছিলেন। কানু ফকির প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্বে এই গ্রন্থখানি রচনা করেছিলেন। তিনি যে শুধু কবি নন,. যথার্থ সাধকও ছিলেন, তার প্রমাণ গ্রন্থ-মধ্যেই যথেষ্ট পাওয়া যায়। কারণ নিজে সাধক না হলে শুধু কবিত্ব-শক্তির দ্বারা এ-জাতীয় গ্রন্থ রচনা সম্ভব নয়। 'জ্ঞান-সাগর' ব্যতীত কানু ফকির এই জাতীয় আরও দু'একখানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন—'সিবাজকুলুপ', 'ধ্যানমালা' এবং কারও-কারও মতে 'যোগ-কলন্দর' গ্রন্থখানিও কানু ফকির-কর্তৃকই রচিত।

এই 'জ্ঞান-সাগর' গ্রন্থের ভিতরে আমরা কি দেখতে পাই? এখানে দেখি, বাঙলার জনমন কি করে হিন্দুধর্ম এবং মুসলমান ধর্ম উভয় ধর্মের সাধন-প্রণালীকে শোষণ করে আত্মসাৎ করেছে। নবী বা রসুল (পয়গম্বর) আলির নিকট ধর্মের সকল সারতত্ত্ব উপদেশ করছেন— এই ভাবে গ্রন্থখানি লেখা হয়েছে।

নবী বলে সুন আলি অপরূপ বাণী।
প্রভুর আগমতত্ত্ব সুরম কাহিনী ॥

এখানে প্রথমেই 'প্রভু' কথাটি লক্ষণীয়। জগদীশ্বর আল্লা অর্থেই গ্রন্থ-মধ্যে সর্বত্র প্রভু শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। শব্দটি গ্রহণ করতে মুসলমান ফকিরের যেমন কোনো আপত্তি নেই, তেমনই এর সঙ্গে হিন্দুদেরও বেশ একটা মনের যোগ রয়েছে। এই প্রভুর বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে,

এক কৰ্ত্তা এক হৰ্ত্তা এক জীব সার।
নানারূপ জলবিন্দু জগতে প্রচার ॥
এক কায়া এক ছায়া নাহিক দোসর ।
এক তন এক মন আনে একেশ্বর ॥

ত্রিজগৎ এক কায়া এক করতার।
একপ্রভু সেবে জনে সব জীবধর ॥

এটি হিন্দুধর্মের কথা না মুসলমান ধর্মের কথা? বাঙালি সমাজ-মনের ভিতরে এসে এখানে হিন্দুধর্ম ও মুসলমানধর্ম অতি সহজে এক হয়ে মিলে গেছে। পরে আবার বলা হয়েছে—

সর্ব্ব জগ এক সিন্ধু নানা রূপে জলবিন্দু
সর্ব্ব স্থানে আছে ব্যক্তময় ।
জথাতথা রহে বারি চলে সর্ব্ব স্থান ছাড়ি
সর্ব্ব গিয়া সাগরে মজ্জএ ॥
তিন লোকে এক মাটী বর্ণ ধরে কোটী কোটী
পুর্ণি মাটী আখেরে সকল ।
জথা তথা বারি রহে দৃষ্টিগতে ব্যক্ত হএ
মাটী হন্তে সকল নির্ম্মিল ॥

এর ভিতরেও হিন্দুধর্ম বা মুসলমান ধর্মের কোন মুদ্রাঙ্কণ নেই — অথচ কোনো ধর্মেরই এ কথাকে নিজের কথা বলে গ্রহণ করতে কোথায়ও আটকায় না। হিন্দুধর্মের তরফ থেকে যদি একে সাংখ্য বা বেদান্ত, অথবা সৎকার্যবাদ বা অসৎকার্যবাদ-প্রভৃতি কোনও একটি বিশেষ দার্শনিক মতবাদের সঙ্গে স্পষ্ট মিলিয়ে নিতে চাই — তাও পারব না। কিন্তু পণ্ডিত-মুন্সী ছেড়ে বাঙলার যে কোনও সাধারণ হিন্দু বা মুসলমানের নিকট এ সকল কথার অর্থ জিজ্ঞাসা করলে তারা সহজে এবং নিঃসংশয়ে এর অর্থ বলে দেবে। এই ধর্ম-সমন্বয় কোনো প্রচার-প্রচেষ্টা-জাত সমন্বয় নয়, এটি সমাজ-জীবনের সমন্বয়ের উপরে প্রতিষ্ঠিত ধর্ম-সমন্বয় — এটি একই সমাজ জীবনের মর্মবাণী। তাই একেই আমরা বলব বাঙালির ধর্মবাণী।

তারপরে —

তিনলোক একসর এক প্রভু গৃহেশ্বর
আর জন সকল সেবক।
সেবকের এক কাম হইবারে অবিশ্রাম
প্রভু ভাবে সেবার ভাবক ॥

এ যেমন একদিকে প্রত্যেক ভক্ত মুসলমান সাধকের মনের কথা, তেমনই প্রত্যেক হিন্দু সাধকেরও মনের কথা। কানু ফকির প্রশ্ন তুলেছেন, সত্যকারের ফকির বা দরবেশ কে? জবাবে তিনি বলেছেন —

রত্ন মাট্টী সমান পারিলে করিবার।
কইছেন্ত প্রভু সে ফকির হয় সার ॥
সুগন্ধ দুর্গন্ধ যদি জানে এক সম।
সমান জানিলে লোক উত্তম অধম ॥
নরনারী পশুপক্ষী পতঙ্গ কীটসি ।
সকল সমাজ জানে তবে সে দর্ব্বেশী ॥

এই সত্য যেমন প্রচার করেছে মুসলমানের শাস্ত্র — এই সত্যই প্রচার করেছেন উপনিষদের ঋষিগণ — একস্থানে নয় — বহুস্থানে, একবার নয় — একাধিক বার। হিন্দুর প্রিয়তম ধর্মশাস্ত্র গীতা-গ্রন্থের ভিতরেও ত সর্বত্রই রয়েছে — এই সত্য।

আবার দু-একস্থানে পাই, সকলই শূন্য থেকে — 'শূন্য'ই সারতত্ত্ব।

সংসারে ফকির শূন্য জপে শূন্য নাম।
শূন্য হন্তে ফকিরের সিদ্ধি সর্ব্ব কাম ॥
ধাম শূন্য কাম শূন্য শূন্যে যার স্থিতি।
সে শূন্যের সঙ্গে করে ফকির পিরীতি ॥
শূন্যেতে পরমহংস শূন্যে ব্রহ্মজ্ঞান ।
যথাতে পরমহংস তথা যোগ-ধ্যান ॥

অথবা,—

শূন্য সূক্ষ্ম তণু হএ রূপ শূন্যকার।
রূপের সাগরে সিদ্ধি জন্ম বণিজার ॥
শূন্য সিন্ধু হন্তে ব্যক্ত রূপের সাগর ।
সিদ্ধিরূপ সাগরে সমস্ত সদাগর ॥

এই 'শূন্য' কি? স্বভাবতই বৌদ্ধ 'শূন্যে'র কথা মনে পড়ে যাবে। কিন্তু ভারতবর্ষে এই শূন্যবাদের প্রচারের পর থেকেই ভারতীয় জনগণ চারিদিক হতে এই শূন্যকে শোষণ করতে চেষ্টা করেছে। দেশজ সাহিত্যের সমৃদ্ধির ভিতর দিয়ে যখন জনগণের কণ্ঠ খানিকটা মুক্ত হল তখন দেখতে পাই, জন-সমাজে গৃহীত হয়ে 'শূন্য' তার শূন্যত্ব হারিয়ে ফেলেছে, — কবীর-দাদূ প্রভৃতি সন্ত কবি, এমন কি মীরাবাঈ-এর মতো ভক্ত কবিও শূন্য-সমাধির কথা বলেছেন ; উড়িষ্যার পঞ্চশাখার বৈষ্ণব কবিরা বরাবর শ্রীকৃষ্ণকে 'শূন্য-পুরুষ' আখ্যা দিয়েছেন ; আমাদের পশ্চিমবঙ্গের বিষ্ণু বা রামরূপী ধর্মঠাকুরের সর্বদাই 'শূন্যমূর্তি'। তাই এদেশের মুসলমান ফকিরের কাছে পরমসত্যও 'শূন্য'ই বটে। বহু যুগের শোষণের ফলে এ 'শূন্য' যে তার 'বৌদ্ধ-মাত্রা' পনেরো আনাই হারিয়ে ফেলেছে তা বোধহয় আর প্রমাণ করতে হবে না।

গ্রন্থখানির ভিতরে স্থানে-স্থানে দেখতে পাই, পাণ্ডিত্য-শাস্ত্রজ্ঞান-প্রভৃতির অকিঞ্চিৎকরতা প্রদর্শন করে প্রেম-যোগের পথকেই বড় করে দেখানো হয়েছে। ভারতের ধর্মসাধনার ইতিহাসে এই সুরটিও জনগণের বহুদিনের একটি বিদ্রোহী সুর। যোগ-সাধনার দিক হতে এবং প্রেমসাধনার দিক হতে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন সহজিয়া বা মরমিয়া সম্প্রদায় জনসাধারণের পক্ষ হতে শাস্ত্রবাদী পণ্ডিত সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে এই কথা বলে এসেছেন। এখানেও পাই সেই সুরের সঙ্গেই সঙ্গতি।

শাস্ত্র সব ত্যাগ করি ভাবে ডুম্ব দিয়া।
প্রভু প্রেমে প্রেম করি রহিবে জুড়িয়া ॥

আবার,—

ত্রিলোক প্রভুর তনু লীলা কোন মতে।
পণ্ডিতের শক্তি নাহি সে তত্ত্ব বুঝিতে ॥

এ-সম্বন্ধে সব চেয়ে সুন্দর আলোচনা রয়েছে যেখানে কবি 'অক্ষরের পাঠ' এবং 'প্রেমের পাঠ'-এর তুলনামূলক বিচার করেছেন।

অক্ষরে জগতের শাস্ত্র করিছে লিখন।
প্রেমপাঠ সম এক নহে কদাচন ॥

সার নহে অক্ষর জথেক শাস্ত্রকুল।
পড়িয়া পণ্ডিত সিদ্ধা প্রেম পাঠমূল ॥
শাস্ত্রপাঠ অক্ষরে না পুরে সিদ্ধি সাধ।
হৃদিমূলে পাঠ পড়ি পণ্ডিত বিখ্যাত ॥
অক্ষরে পাঠ পড়ে চর্ম্ম চক্ষে দেখি।
প্রেমপাঠ্ প্রকাশিত হৃদান্তরে আঁখি ॥

... ...

সংসার অক্ষর শাস্ত্র অসার সকল।
পরম আগম প্রেমপাট সিদ্ধিফল ॥
শুকা কাষ্ঠ তুল্য জথ অক্ষর লেখএ।
পরম পিরীতি পাঠ রস-সিন্ধুময় ॥
চারি বেদ চৌদ্দ শাস্ত্র জথ পাট অক্ষর।
ব্যক্ত সব পাঠ শুকা কাষ্ঠ সমস্বর ॥
পরম প্রেমের পাঠ আগম গোপত।
গুপ্ত প্রেম পাঠ পড়ি সিদ্ধি মুক্তিপদ ॥

এই যে প্রেমের পাঠ এটিই সূফীধর্মের মূলকথা। কিন্তু এই সূফীধর্মের সঙ্গে এখানে মিশে গেছে ভারতের সকল সহজিয়া বা মরমিয়া সাধকগণের মর্মবাণী।

বৌদ্ধ সহজিয়া সরহপাদ বলেছেন,—

অক্‌খর বাঢ়া সঅল জগু নাহি নিরক্‌খর কোই।
তার সে অক্‌খর ঘোলিআ জাব নিরক্‌খর হোই ॥

'অক্ষরে বদ্ধ এই সকল জগৎ, কেহই নাই নিরক্ষর ; সেদিনই ঘুলিবে সকল অক্ষর যেদিন হইবে নিরক্ষর।'

কবীর বলেছেন,—

পোথি পঢ়ি পঢ়ি জগ মুবা পংডিত ভয়ান কোই।
একৈ অশ্মির পীব কাপঢ়ে সুপংডিত হোই ॥

'পুঁথি পড়িয়া পড়িয়া জগৎ মরিয়াছে, পণ্ডিত হইল না কেহ ; যে পড়ে প্রিয়ের একটি অক্ষর সেই হয় সুপণ্ডিত।'

দাদূ বলেছেন, —

পঢ়েন্ পাবৈ পরমগতি পঢ়ে ন লংঘৈ পার।
পঢ়ে ন পহুঁচে প্রানিয়া দাদূ পীড় পুকার ॥

... ...

পঢ়ি পঢ়ি থাকে পংডিতা কিন্হূঁ ন পায়া পার।
মসি কাগদ কে আসিরে ক্যোঁ ছুটৈ সংসার ॥
কাগজ কালে করি মুয়ে কেতে বেদ কুরাণ ।
একৈ অষ্মির প্রেমকা দাদূ পঢ়ৈ সুজান ॥

'পড়িয়া পাওয়া যায় না পরম গতি, পড়িয়া লঙ্ঘন করা যায় না পার ; পড়িয়া পৌঁছায় না প্রাণীরা ; হে দাদূ, অন্তরের বেদনায় ডাক তাঁকে।... পড়িয়া পড়িয়া হয়রান হইল পণ্ডিত,

কেহই তো পাইল না পার, কালী কাগজের ভরসায় কেন ছুটিয়া চলিছে সংসার ? কাগজ কালা করিয়া করিয়া মরিল কত বেদ-কোরাণ ; একটি অক্ষর প্রেমের যে পড়িল, হে দাদু, সেইত পণ্ডিত সুজন।'

একটু লক্ষ্য করলেই দেখতে পাব, ভারতীয় বিভিন্ন যুগের জনগণের কবিদের সহিত আমাদের সুদুর চট্টগ্রামে একজন বাঙালি কবিও কেমন সুন্দর করে তাঁর সুর মিলিয়ে দিয়েছেন।

সমস্ত বাঙালি মুসলমান ভক্ত কবি — শুধু বাঙালি নয়, ভারতীয় সমস্ত মুসলমান ভক্ত কবিই সূফী মতাবলম্বী। তার কারণ, মতের দিক থেকে এবং পথের দিক থেকে সূফী ধর্মের সঙ্গে ভারতীয় মনের একটি নিগূঢ় যোগ রয়েছে। এই ভারতীয় মনের প্রভাব অনেকখানি পড়েছিল ভারতীয় সূফী ধর্মের ক্রমবিকাশে। আমাদের কবি কানু ফকিরও মূলত সূফী। প্রেমই সৃষ্টির আদিম এবং আসল সত্য। প্রেমে যেমন বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হয়েছে, সেইরূপ প্রেমেই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড বিধৃত হয়ে রয়েছে। যে পরস্পর আকর্ষণ-বিকর্ষণের ফলে বিশ্ব-নিখিল একটা দুর্লঙ্ঘ্য নিয়মে আবর্তিত হচ্ছে, সেই আকর্ষণ-বিকর্ষণ বা সেই বন্ধনই তো আদি প্রেম।

প্রথমে বহ্নির সঙ্গে বাবির (বায়ুর) পিরীতি।
হইল মাটির প্রেম জলের সঙ্গতি ॥
এ সব প্রেমে যদি মন না ডুবিত ।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল আদি কিছু না জন্মিত ॥
গগনের সঙ্গে হইল স্বর্গের পিরীতি ।
স্বর্গ সঙ্গে মর্ত্ত্যের পিরীতি আছে অতি ॥
ত্রিভুবনে প্রভু প্রেম আছএ জড়িত ।
নরক পাতাল সঙ্গে আছএ পিরীত ॥
মার্ত্তণ্ড চন্দ্রিমা গুরু বৃক্ষ জথ ধরি ।
প্রেম হেতু গগন সঙ্গে রহিলেক জড়ি ॥
সাগরের সঙ্গে বারি জল সঙ্গে মীন।
ইন্দু সঙ্গে যামিনী রবি সঙ্গে দিন ॥
প্রেমেতে জগত বন্দী মীন বন্দী মূলে ।
কমলে ভ্রমর বন্দী মীন বন্দী জলে ॥
পুরুষের মন বন্দী নারী প্রেমরসে ।
নারী বিন্দু পুরুষের অসিদ্ধি মানসে ॥

এই প্রেম থেকেই যুগল ভাবনা এবং সেই যুগল ভাবনা থেকেই তো সকল সৃষ্টি। আপনাতে যেদিন আপনি একা হয়েছিলেন প্রভু সেদিনও নিজেকেই নিজে দেখতে পান নি ; নিজের প্রেমরস আস্বাদনের জন্য তিনি করলেন যুগলের সৃষ্টি।

যুগলভাবনা যদি প্রথমে না হৈত ।
করতা এ ত্রিজগতে কিছু না সৃজিত ॥
যুগ ভাবে ভক্তাপ্রভু আপে হইলেন্ত ।
প্রেম হেতু করতা এ জগ সৃজিলেন্ত ॥

প্রেম রসে মগ্ন হইল আপনে গোসাই ।
যুগ ভিনে কোন কর্ম্ম সিদ্ধি পন্থ নাই ॥
... .
প্রথমে আছিল প্রভু এক নিরঞ্জন ।
প্রেম রসে ডুভি কৈল যুগল সৃজন ॥

কিন্তু এই প্রেমধর্ম বেশিক্ষণ সূফী মতেই নিবদ্ধ রইল না। বাঙলার প্রেমধর্মের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে সহজিয়া সাধন। আদির' যুগল প্রেম যে মর্ত্যে ধরা দিয়েছে নরনারীর যুগল প্রেমের ভিতর দিয়ে, সেই যুগল প্রেমের নিঃসীম অনুভূতির ভিতর দিয়েই তো খুঁজতে হবে আদির সর্বব্যাপী এক প্রেমকে। তাই বৈষ্ণব সহজিয়াদের সুরে সুর মিলিয়ে ফকির বলেছেন,—

রূপ বিনু প্রেম নাহি ভাব বিনু ভক্তি ।
ভাব বিনু লক্ষ্য নাই সিদ্ধি বিনা মুক্তি ॥
নবী কুলে প্রথম আদম ভক্ত হইল।
হাবা দেবী সঙ্গে রসকূপে ডুবি ছিল ॥
দেবকুলে অতি ভক্ত হইল মহেশ্বর ।
গৌরী দেবী সম্মুখে থাকিত দিগম্বর ॥
. ...
আছিল আয়েসা বিবি পরম সুন্দর ।
সেইরূপে মোহাম্মদ ভক্ত পয়গাম্বর ॥
নর পরী পশু পক্ষী কীট তরুবর ।
প্রেমরস বিনু কার নাই মুক্তিবর ॥

'জ্ঞান-সাগব' গ্রন্থখানির ভিতরে এই রূপে কবির লক্ষ্যে-অলক্ষ্যে বাঙলা দেশের সকল প্রকারের ধর্মমতই মিশে আছে। এখানে সাংখ্য, তন্ত্র, নাথপন্থ, সূফীমত সব মিশে একাকার হয়ে উঠেছে। নারী-পুরুষের আলোচনার প্রসঙ্গে কবি বলছেন,—

স্থূল্য সাকার কামিনী ত্রিভুবন ।
নৈরাকার পুরুষ সে প্রভু নিরঞ্জন ॥

এখানে মুসলমান সূফী মতে স্থূল সৃষ্টি হল কামিনী, নিরাকার নিরঞ্জন-পুরুষ হলেন পুরুষ। সাংখ্য মতেব প্রকৃতি-পুরুষের কথা এখানে স্বতঃই মনে আসে। এটির পরের পদে দেখি,—.

বিশ্বরূপী আপনি পুরুষ নৈরাকার।
সাকার কামিনী জথ সমস্ত সংসার ॥

এখানে তন্ত্রের শিব-শক্তি এসে পড়েছে। আমার মনে হয় : 'বিম্বরূপী' এখানে 'বিন্দুরূপী'ব রূপান্তরিত অবস্থা। শিবই বৈন্দব তনু, স্থূল সংসার নাদ-রূপিণী শক্তি, — নাদ-বিন্দুর তত্ত্বটিই এখানে আভাসিত হয়েছে। এর পরের পদ,—

চক্র হয় কামিনী পুরুষ দিবাকর ।
রামাকুল মৃত্যুপদ পুরুষ অমর ॥
ভ্রম হয় রামাকুল পুরুষ চেতন ।
নিদ্রাএ পীড়িত রামা পুরুষ জাগন ॥

এখানেও সাধারণ ভাবে সেই তন্ত্র মতেরই অনুবর্তন দেখছি। বাম-দক্ষিণবহা নাড়ীদ্বয়ই তন্ত্রে

চন্দ্র-সূর্য এবং নারী-পুরুষরূপে কীর্তিত। শক্তিই মায়া — পুরুষ বা শিবই চৈতন্য বা জ্ঞান-মাত্র-তনু। কিন্তু অন্যত্র এই চন্দ্র-সূর্য সম্বন্ধে দেখতে পাই,—

অমরা সে মরা হএ মরা সে অমর ।
চন্দ্র হএ ভাবক ভাবিনী প্রভাকর ॥

এখানে চন্দ্র সোমাত্মক ভাবক এবং সূর্য অগ্ন্যাত্মক বা সংহারাত্মক ভাবিনী। চন্দ্র-সূর্যের এই তত্ত্ব আমাদের নাথপন্থের কথাই মনে করিয়ে দেয়।

এই নারী-পুরুষ সম্বন্ধে অন্যত্র দেখি,—

তন হএ কামাকুল জগৎ সংসার ।
মন হএ পুরুষ সেবক করতার ॥
তনের অন্তরে মন মনান্তরে জ্যোতি ।
জ্যোতির অন্তরে ধ্বনি উঠে প্রতিনিতি।
অনাহেতু শব্দ কহে সে ধ্বনির নাম।
সে ধ্বনির তত্ত্ব হন্তে সিদ্ধি মনস্কাম ॥

এখানকার এই অনাহত ধ্বনি থেকে জ্যোতি, জ্যোতি থেকে মন এবং মন থেকে তনুর উৎপত্তির ভিতরে বহু মুসলমান বিশ্বাসের সঙ্গে হিন্দুর শব্দ-ব্রহ্মের তত্ত্বটি এমনভাবে জড়িত হয়ে গেছে যে কাউকেই আর স্পষ্টরূপে চেনা যায় না। অথচ এখানকার তত্ত্বটি একটি নিজস্ব রূপ লাভ করেছে।

এই অনাহতে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য যে উল্টা-যোগের কথা বলা হয়েছে, সেই উল্টা-সাধন ভারতীয় সাধনারই একটি বৈশিষ্ট্য। এ-বিষয়ে আমি স্থানান্তরে বিশদভাবে আলোচনা করেছি। এই যোগসাধনাকে অবলম্বন করেই এসেছে গুরুবাদ — তার সঙ্গে যুক্ত সূফী মুবশেদের তত্ত্ব।

এই ভাবেই বাঙালির সাধনায় ও সংস্কৃতিতে এসেছিল সহজ-সমন্বয়ের একতান। জাতীয় জীবনের সেই সত্যকে অস্বীকার করতে যাওয়ার অর্থ জাতীয় জীবনের স্বাভাবিক পরিণতিতেই বাধা দান। তাতে হয়ত সাময়িক অল্প-কিছু লাভ হতে পারে একটি বিশেষ শ্রেণীর—কিন্তু তাতে অনেকখানি লোকসান হবে সমগ্র জাতির।